MA-09-BENG-1.4

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
Gauhati University
দূর এবং মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
Institute of Distance and Open Learning Learning

বাংলা স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম (০৯)

M. A. in Bengali (09)

প্রথম ষাণ্মাসিক

চতুর্থ পত্র (Paper : 4)

মধ্যযুগের কাব্য কবিতা

বিষয়সূচী (Contents)

পত্র পরিচিতি (Paper Introduction)

প্রথম বিভাগ : বৈষ্ণব পদাবলি নির্বাচিত পদকর্তা— বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস

দ্বিতীয় বিভাগ : গোরক্ষবিজয় কাব্য

তৃতীয় বিভাগ : মৈমনসিংহ গীতিকা (মহুয়া, কাজলরেখা, চন্দ্রাবতী, লীলা ও কঙ্ক, দেয়ানা মদিনা)

চতুর্থ বিভাগ : রামেশ্বরের "শিবায়ন কাব্য" (নির্বাচিত পাঠ— চাষপালা)

Contributor :

Sri Nibedita Bhattacharjee *(Unit-I)*	Senior Lecturer, Department of Bengali Radha Gobinda Baruah Collage, Ghy-25
Sri Ratnadip Purkayastha *(Unit-II & III)*	Department of Bengali Digboi Mahila Mahavidyalaya
Sri Binita Rani Das *(Unit-IV)*	Associate Professor, Department of Bengali Gauhati University, Ghy-14

Content Editing :

Dr. Amalendu Chakrabarty — HOD, Dept. of Bengali, Gauhati University

Proof Reading & Language Editing :

Sanjay Chandra Das — Research Scholar, Dept. of Bengali, Gauhati University

Format Editing :

Dipankar Saikia — Editor, Study Material, GUIDOL

Cover Page Design :

Bhaskar Jyoti Goswami — GUIDOL

ISBN No : 978-81-928318-3-1

Reprint : September, 2018

© Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University. All rights reserved. No part of this work be reproduced in any form, by mimeography or any other means, without permission in writing from the Gauhati University, Institute of Distance and Open Learning. Further information about the Gauhati University, Institute of Distance and Open Learning courses may be obtained from the University's office at Idol Building, Gauhati University, Guwahati-14. Published on behalf of the Gauhati University, Institute of Distance and Open Learning by Prof. Amit Choudhury, Director and printed under the aegis of GU Press as per procedure laid down for the purpose. Copies printed 500.

পত্র পরিচিতি

মধ্যযুগের কাব্য কবিতা নামক পাঠ্যক্রমে আপনাদের স্বাগত জানাই।

আমাদের এই চতুর্থ পত্রে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের চারটি গ্রন্থ পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমাদের আলোচনা শুরু করার আগে পাঠ্যক্রমের তাৎপর্য বা উপযোগিতা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। আসুন, এই সুদীর্ঘ আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে এই পত্রের অধ্যয়ন এবং পাঠন-পাঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গটি বিশ্লেষণ করা যাক।

হাজার বছরের বাংলা সাহিত্য জগতের ইতিহাসে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিশেষ শাখা বৈষ্ণব সাহিত্য। বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্গত বৈষ্ণব পদাবলী রচিত না হলে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য কখনো গৌরব লাভ করতে পারত না।

বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্য ধারায় যে চারজন মহাজন পদকর্তার পদাবলি আপনাদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে, তাঁরা হলেন— বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। এই চারজন পদকর্তা ও তাঁদের পদাবলিকেই বিশেষভাবে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করার কারণ হল— একদিকে এঁদের রচনায় শ্রেষ্ঠত্ব, অপরদিকে-পদাবলির সাহিত্যিক-আধ্যাত্মিক-দার্শনিক— প্রতিটি দিক এঁরা কেউনা-কেউ কোন-না-কোনভাবে ছুঁয়ে গেছেন। এছাড়াও এক-একটি বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে একেকজনের অসামান্য-কৃতিত্ব রয়েছে, যার ফলে বৈষ্ণব পদসাহিত্যে এঁরা আদর্শ স্থানীয় পদকর্তা-রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। এঁদের কাব্য-কলা-কৌশলের মাধ্যমেই আমরা পদাবলির সর্বাঙ্গীন ধারণায় উপনীত হতে পারি। তাই আলোচ্য পত্রে এই চারজন মহাজন পদকর্তার কবি-আত্মা ও কাব্য-শিল্পের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

নাথধর্ম নামে একটি উপধর্ম এবং সেই উপধর্মাশ্রিত সাহিত্য বহুকাল ধরে শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারতে এখনও প্রচলিত। গোরক্ষনাথের নামাঙ্কিত এই ধর্মের জনপ্রিয়তা দেখে মনে হয় যে একদা এই নাথধর্মমতের সাধনা সমাজের সর্বস্তরে, বিশেষভাবে প্রচার লাভ করেছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণিই শুধু নয়, মুসলমানরাও বিপুলসংখ্যায় এই নাথধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের আধ্যাত্মিক যোগাযোগের বড়ো উপাদান এই নাথধর্ম ও নাথ-সাহিত্য। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নাথ-সাহিত্য এক স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই পত্রে নাথ-ধর্মসাধনামূলক 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিষ্য কর্তৃক গুরুকে সাধনার মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার কাহিনিই এই কাব্যের মূল বিষয়বস্তু। এদিক থেকে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থটি অভিনব। এই গ্রন্থকে অবলম্বন করে আমরা নাথধর্ম সম্পর্কিত প্রাথমিক কথা, নাথধর্মের গুরু পরম্পরার প্রসঙ্গ এবং এই ধর্মের দর্শন ও সাধনপন্থা সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণায় উপনীত হতে পারি। তাছাড়া একাব্যের কাহিনি, চরিত্র ও বিষয়-বস্তুর মধ্যে সমকালীন মানব-জীবনরস ও সমাজ-জীবনের বিচিত্র ছবি ফুটে উঠেছে। সুতরাং এই সমস্ত কিছু নিয়ে কাব্যটির একটা সামগ্রিক আলোচনা এই পত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মৈমনসিংহ এবং পূর্ববঙ্গের নানাস্থান (ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রাম) থেকে যে পালাগুলি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। দীনেশচন্দ্র সেনের আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই এই গাথা-গীতিকা সাহিত্যের প্রচার-ব্যাখ্যান সম্ভবপর হয়েছে। তাঁরই ঐকান্তিক আগ্রহে ও প্রয়াসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আনুকুল্যে এই পালাগুলি প্রকাশিত হয়েছে এবং আধুনিক যুগের পাঠকদের মনে সপ্রশংস কৌতূহল সঞ্চার করেছে। মৈমনসিংহের অধিবাসী কবি চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক সংগৃহীত এই পালাগুলি দীনেশচন্দ্র সেনের সুযোগ্য সম্পাদনায় মৈমনসিংহ গীতিকা নামে প্রকাশিত হয়।

মৈমনসিংহ এবং পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সংগৃহীত পালাগুলি Ballad বা গীতিকাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজি Ballad শব্দটি ল্যাটিন Ballare শব্দ থেকে এসেছে— যার অর্থ নৃত্য। প্রাচীন-যুগে পাশ্চাত্য যে সমস্ত কাহিনি নৃত্যগীত সহযোগে পরিবেশন করা হত সেগুলিকেই Ballad বলা হত। এসব কাহিনির উপাদান সংগৃহীত হত চিরপরিচিত জীবন থেকেই। এগুলি লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। কোনো একটি নাটকীয় ধরনের দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রেম-প্রণয় বা দ্বন্দ্ব-কলহ-সংঘর্ষঘটিত স্থানীয় কাহিনি পুরাতন গীতিসাহিত্যের পটভূমি। অবশ্য অধ্যাত্মচেতনা, অলৌকিকতা, অদ্ভুত ব্যাপারও ব্যালাডে কিছু কিছু দেখা যায়। তবে মর্তজীবনের ভালো-মন্দ, আলো-ছায়ার লীলাই গাথা-গীতিকার প্রধান ভিত্তিভূমি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গীতিকা সাহিত্যের সামান্য ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। মঙ্গলকাব্যের অনেকটাই প্রাচীন গাথাসাহিত্যের ঐতিহ্যের অনুসারী। নাথসাহিত্যকেও অনেকে নাথগীতিকা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তবে যথার্থ বিশুদ্ধ গাথা গীতিকা সাহিত্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল এযুগে প্রকাশিত মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গগীতিকায়। এর শ্রেষ্ঠ আখ্যায়িকাগুলি মর্তপ্রেমের অশ্রুবেদনায় ভরপুর। প্রাচীন পাশ্চাত্য ব্যালাডের অনেকগুলিতে ব্যর্থপ্রেমের রক্তাক্ত প্রতিহিংসা এবং জিঘাংসাই প্রধান স্থান লাভ করেছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গ থেকে প্রাপ্ত গীতিকাগুলিতে প্রেমের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও বেদনা অধিকতর বিশিষ্টতা লাভ করেছে। মধ্যযুগের উপান্তভূমিতে রচিত এই গীতিসাহিত্যগুলিতে হিন্দু-মুসলমানের অসাম্প্রদায়িক হৃদয়বৃত্তির অপূর্ব সমন্বয় ফুটে উঠতে দেখা যায়। এই দৃষ্টান্ত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অন্যত্র বিরল। এই পত্রে গীতিকা সাহিত্যের স্বরূপ-লক্ষণ, সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ডে ভারতীয় গীতিকা তথা মৈমনসিংহ গীতিকার একটা সামগ্রিক ধারণা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মৈমনসিংহ গীতিকার নাট্যগুণ, উপন্যাস লক্ষণ, প্রেম-প্রসঙ্গ, রূপকথা প্রসঙ্গ, পালা-গানের লক্ষণ প্রভৃতির আলোচনা স্থান পেয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য কাব্যধারা হচ্ছে শিবায়ন। মধ্যযুগের সাহিত্য রচনার কেন্দ্রে রয়েছে ধর্ম। ধর্মীয় দেব-দেবীকেই এই সময়ের কবিরা তাঁদের রচনায় প্রধান স্থান দিয়েছেন। এই সময়ে মঙ্গলকাব্যের ধারা বাংলা সাহিত্যে একটি বিশাল স্থান অধিকার করে আছে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃতি। বিশেষ ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক কারণে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব। এই মঙ্গলকাব্যধারার কাহিনিতে কোনো নির্দিষ্ট দেবতা বা দেবীর প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। মনসা, চণ্ডী, ধর্ম প্রভৃতি দেবতারা এই কাব্যগুলোর প্রধান জায়গা জুড়ে আছেন। দেবাদিদেব শিবেকও কেন্দ্রে রেখে এক ধরনেরে সাহিত্য রচনার প্রয়াস মধ্যযুগে লক্ষ করা যায়। শিবকেন্দ্রিক এই ধরনের রচনা শিবায়ন কাব্যরূপে পরিচিত।

শিবায়ন কাব্যের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শুধুমাত্র শিবের প্রসঙ্গ থাকলেই সেই কাব্যটি 'শিবায়ন' কাব্য হয়ে উঠতে পারে না। বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে পুরাণের ধারায় প্রবাহিত হয়ে মধ্যযুগে এসে শিবের বিভিন্ন রূপ আমাদের চোখে পড়ে। বেদের রুদ্র, পুরাণের শিব ক্রমবিবর্তনের পথে মধ্যযুগে বাংলাদেশে কৃষক শিবে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। শিবায়ন কাব্যে এই কৃষক শিবের প্রাধান্য আমরা দেখতে পাই।

শিবায়ন কাব্যধারার প্রধান কবিদের কাব্যে শিবের পৌরাণিক ও লৌকিক কৃষক রূপ উভয়ই কমবেশি বিদ্যমান। তবে লৌকিক কৃষক শিবের যথাযথ চিত্রাঙ্কনের মধ্যেই শিবায়ন কাব্যের বিশিষ্টতা নির্ভর করে। শিবায়ন কাব্যের প্রথম কবি শঙ্কর কবিচন্দ্রের কাব্যেই বাংলাসাহিত্যে কৃষক শিবের চরিত্র প্রথম ফুটে উঠেছে। তাঁর পরবর্তী কবি রামকৃষ্ণ রায় পৌরাণিক শিবের ওপরেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। লৌকিক শিবের উপস্থিতি সেখানে স্বল্পমাত্রায়। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যেই কৃষক শিবের যথাযথ চরিত্র আমরা ফুটে উঠতে দেখি। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যই এই শাখার শ্রেষ্ঠ কাব্য।

আমাদের আলোচ্য পত্রে রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের ধারায় এই কাব্যটি বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। কাব্যটির ভাব-বিষয়বস্তু, রচনারীতি, শিল্পনৈপুণ্য— সবদিক থেকেই গুরুত্বসহকারে বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। তাই এ কাব্যের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু, কবিপরিচিতি, বিভিন্ন পালার বিশ্লেষণ, চরিত্র-চিত্রণ, লৌকিকতা, ভাষা-ছন্দ-অলংকার-প্রবচনের প্রয়োগ প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে।

আসুন, এবার আমরা বাছাই করা প্রতিনিধি-স্থানীয় চারটি গ্রন্থের বিভাগগত বিন্যাসটির দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করি—

প্রথম বিভাগ ঃ বৈষ্ণব পদাবলি নির্বাচিত পদকর্তা— বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস

দ্বিতীয় বিভাগ ঃ গোরক্ষবিজয় কাব্য

তৃতীয় বিভাগ ঃ মৈমনসিংহ গীতিকা (মহুয়া, কাজলরেখা, চন্দ্রাবতী, লীলা ও কঙ্ক, দেয়ানা মদিনা)

চতুর্থ বিভাগ ঃ রামেশ্বরের "শিবায়ন কাব্য" (নির্বাচিত পাঠ— চাষপালা)

যেহেতু মুলপাঠ্যগ্রন্থগুলি আমরা বিতরণ করতে পারছি না, তাই আশা করব এগুলি আপনারা নিজে সংগ্রহ করে পড়ে নেবেন। তা ছাড়া মূলগ্রন্থগুলির পাঠ, বিভাগের অন্তর্গত বিষয়বস্তুর আলোচনাসমূহ অনুধাবনে আপনাদের পক্ষে সহায়ক হবে বলেই আমাদের ধারণা।

বার্ষিক পরীক্ষার আগে প্রত্যেক পত্রে আপনাদের ১০ নম্বরের দুটো (১০+১০=২০) প্রশ্নের উত্তর (Home Assignment) বাড়ি থেকে তৈরি করে পাঠাতে হবে। আপনাদের সুবিধার্থে প্রত্যেক উপবিভাগেই প্রশ্নের তালিকা সংযোজিত হয়েছে।

যদিও এই পাঠ্য-উপকরণসমূহ অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে তবু এই উপকরণের অতিরিক্ত পাঠ, আপনাদের নিজস্ব সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা গড়ে তোলার কাজে সহায়ক হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

আশা করি এই পাঠ্য-উপকরণসমূহ আপনাদের কাছে উপযোগী ও উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

প্রথম বিভাগ
বৈষ্ণব পদাবলি

বিষয় বিন্যাস ঃ

১.০ ভূমিকা (Introduction)
১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
১.২ বিদ্যাপতি ঃ কবি পরিচিতি
১.২.১ বাংলার সঙ্গে বিদ্যাপতির পরিচয়
১.২.২ বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে বিদ্যাপতির স্থিতি
১.২.৩ মৈথিল কবি বিদ্যাপতি বাংলা সাহিত্যে প্রাদেশিকতার গণ্ডি ভেঙে দিয়েছেন
১.২.৪ বিদ্যাপতির কাব্য ও কবিমানসের পরিচিতি
১.২.৪.১ রাজসভার কবি বিদ্যাপতি
১.২.৪.২ বৈষ্ণব পদাবলি ও বিদ্যাপতি
১.২.৪.৩ বিদ্যাপতির রচিত বৈষ্ণব পদাবলির বিশ্লেষণ
১.৩ চণ্ডীদাস ঃ কবি পরিচিতি
১.৩.১ চণ্ডীদাসের পদাবলি সমস্যা
১.৩.২ কবি চণ্ডীদাসের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প
১.৩.৩ চণ্ডীদাসের পদাবলি বিশ্লেষণ
১.৩.৪ বিপ্রলম্ভের কবি চণ্ডীদাসের বিশেষত্ব
১.৪ গোবিন্দদাস ঃ কবি পরিচিতি
১.৪.১ গোবিন্দদাসের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প
১.৪.২ গোবিন্দদাসের পদাবলির বিচার ও বিশ্লেষণ
১.৫ জ্ঞানদাস ঃ কবি পরিচিতি
১.৫.১ জ্ঞানদাসের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্পের পরিচয়
১.৫.২ জ্ঞানদাসের পদাবলি বিশ্লেষণ
১.৫.৩ জ্ঞানদাসের পদাবলির ভাষা, অলংকার, ছন্দ
১.৬ সংযোজন
১.৬.১ চণ্ডীদাস সমস্যা
১.৬.২ তুলনামূলক আলোচনা
১.৬.২.১ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস
১.৬.২.২ বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস
১.৬.২.৩ চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস
১.৭ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
১.৮ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)
১.৯ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি
১.৯.১ বড় প্রশ্নাবলি
১.৯.২ ছোট প্রশ্নাবলি
১.১০ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

১.০ ভূমিকা (Introduction)

চৈতন্য-পূর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পদকার হলেন বিদ্যাপতি। সঠিক বিচারে বিদ্যাপতিকে বৈষ্ণব কবি বলা চলে না, এবং তিনি বাঙালি কবিও নন। কিন্তু বাংলা বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে যে চারজন পদকর্তার পদাবলি স্বাতন্ত্র্য এবং শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে বিদ্যাপতি তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। পঞ্চদেবতার উপাসক হয়েও কীভাবে বিদ্যাপতি বৈষ্ণব পদকর্তারূপে শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হলেন, মৈথিল কবি হয়েও কী করে তনি বাঙালি বৈষ্ণব ভক্তের পূজ্যপাদ কবি হয়ে উঠলেন প্রসঙ্গক্রমে তার সুবিস্তৃত আলোচনা করেই আমরা বিদ্যাপতির জীবন ও কাব্যালোচনায় অগ্রসর হবো।

বৈষ্ণব পদাবলির শ্রেষ্ঠত্ব প্রেমমূলক কবিতায়। পদাবলি সাহিত্যে প্রেমিক-প্রেমিকার চরিত্র-চিত্রণ ও ব্যক্তিত্ব অঙ্কনে নয়, তাঁদের হৃদয়ের বিচিত্র ভাবতরঙ্গগুলিকে ভাষায় ধরে রাখতে বৈষ্ণব মহাজনদের তুলনা নেই। বৈষ্ণবেরা প্রেমকে পরমপুরুষার্থ বলে নির্দেশ করেছেন। স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব রায় রামানন্দের আলোচনা শ্রবণে মধুর রসকেই 'সর্বসাধ্যসার' বলে স্বীকার করেছেন। এই প্রেম মর্ত্যলোকের প্রণয় নয়, তথাপি তার বহিরঙ্গে মানব প্রেমলীলার সাদৃশ্য বৈষ্ণব কবি বা মহাজনেরা অস্বীকার করতে পারেননি। বিশেষ করে রাধাকৃষ্ণের প্রেমানুভূতির ছবি আঁকতে গিয়েও কবিরা লৌকিক জগতের নরনারীর প্রেমচিত্রকেই অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, মানবিক হৃদয়োচ্ছ্বাসের মধ্যে প্রেমোপলব্ধির বৈচিত্র্যই সবচেয়ে বেশি। বৈষ্ণব কাব্য তত্ত্ব— সবকিছুর মূলেই রয়েছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম। এই প্রেমকে অবলম্বন করে বৈষ্ণব কবিগণ এর বিভিন্ন বিষয় ও বিচিত্র পর্য্যায় এমন ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, একে 'বৃন্তহীন পুষ্প সম আপনাতে আপনি' বিকশিত, মর্ত্যলোক-অসম্পৃক্ত এক অব্যক্ত ভাবের প্রকাশ বলে কোনোমতেই গ্রহণ করা যায় না। এই জানা পথ ধরেই বৈষ্ণব কবিতা এক অজানা লোকের সন্ধান এনে দেয়। তাই বৈষ্ণব কবিতা সসীম ও অসীমের মিলনস্থল। অপরাপর কবিরা পৃথিবী এঁকেছেন, স্বর্গও এঁকেছেন, কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের রচনায় স্বর্গ ও পৃথিবী একাকার হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির স্মরণীয়—

> "দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
> প্রিয়জনে— প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
> তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা।
> দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

বৈষ্ণব কবিতাকে দার্শনিক নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলা যায়, এই কবিতার বক্তব্যই যেন লীলাকারে প্রকাশিত বৈষ্ণব পদাবলিতে। কারণ, প্রেমের গভীরতা অন্যান্য ভাবের তুলনায় যেমন অধিক, তেমনি একান্ত তরল লীলা-রস-আস্বাদের চপল বর্ণ বিকিরণকেও সে অস্বীকার করে না। দৈহিক ইন্দ্রিয়লব্ধ সীমাবদ্ধ কাম হতে রোমান্টিক দূরাভিসারে, অন্তর্গূঢ় রহস্যময়তায়— সর্বত্রই তার অবাধ বিচরণ। এই প্রেমকেই বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণ লীলারস আস্বাদনের মাধ্যমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন ও ভক্তির রসায়ণে তাকে মিলিয়ে এক উর্ধগতি দান করেছেন। লৌকিক প্রেমের এই উর্ধায়ণের ক্ষেত্রে যাঁর নাম সবার পুর্বে মনে আসে, তিনি চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাসের কাব্যের মাধ্যমেই আমরা প্রথম জানতে পারি যে দেহ-সর্বস্বতার সঙ্গে বৈষ্ণব কবিতার কোনো সম্পর্ক নেই, আবার এটি নিরালম্ব দেহাতীতও নয়।

কবিতা মানুষের হৃদয় প্রকাশের বাহন। বৈষ্ণব পদাবলি বাংলা সাহিত্যের এক মহামূল্য সম্পদ। এরই মধ্য দিয়ে বাঙালির হৃদয়ের ভাবধারা মুক্তিলাভ করে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলাদেশের আবেগময় স্নেহ প্রেমার্দ্র চিত্ত-বৃত্তিএই বৈষ্ণব কবিতার ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশের সার্থকতা লাভ করেছে। এরই প্রভাবে বাঙালির চিত্ত সরস সুন্দর উন্নত ধর্মানুগত এবং ভাবপ্রবণ হয়েছে।

আত্মগত সাধনায় এবং ধ্যানতন্ময়তায় বৈষ্ণব কবিরা জগৎ এবং জীবনকে আত্মসাৎ করেছিলেন। জীবনের গভীরতম সুষমাময়ী বাণীর প্রতিমূর্তি এই বৈষ্ণব কবিতা।

মূলে বৈষ্ণব কবিতা ধর্মমূলক কবিতা এবং বৈষ্ণব কবিদের ধর্ম প্রেমধর্ম। যে প্রেমের কোনো হেতু নেই, যে প্রেমে কোনো বাধা মানে না, যে প্রেম কোনো প্রতিদান চায় না, যে প্রেমে আত্মসুখের কোনো কামনাই নেই, যে প্রেম ইন্দ্র-সম ঐশ্বর্যকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে, যে প্রেম মরণজয়ী, —বৈষ্ণব কবিদের প্রেম সেই প্রেম। এই প্রেমধর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বৈষ্ণব কাব্য; এ কাব্য সৌন্দর্যের আকর। "কুৎসিতের স্থান নাহি এ হেন মন্দিরে" —তাই রাধা-কৃষ্ণের রূপ ওঅনুরাগের বর্ণনা করে শেষ করতে পারেননি বৈষ্ণব কবিগণ। "জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ নয়ন না তিরপিত ভেল" —এই বাণী কবি বিশেষের হয়েও তা সর্বসাধারণের হৃদয়ের অনুমোদন পেয়েছে তাই। শ্রীরাধার রূপ ও প্রেমের বর্ণনায় বৈচিত্র্য সাধিত হয়েছে দুভাবে, —এক দিকে রাধা সদা হাস্য-লাস্যময়ী, সর্বালঙ্কার ভূষিতা, রমনীয় হাবে-ভাবে কটাক্ষে যিনি বিদ্যুৎলতার ন্যায় সচকিতা, যিনি তিলতিল করে গড়ে ওঠা তিলোত্তমা, যাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে ছন্দের ঝঙ্কার, অলঙ্কারের শিঞ্জিনী শোনা যায়, আর অপর দিকে সম্পূর্ণ পৃথক এক রাধা— ধ্যানময়ী, তদ্‌গতপ্রাণা, বাহ্যিক সমস্ত আবরণ আভরণ সরিয়ে দিয়ে বেদনার সহজ সত্যের নিরলঙ্কৃত মহিমায় যিনি বিরাজমান, হৃদয়ের কনক মন্দিরে কমলাসনে বসিয়ে যিনি অন্তরের রক্ত-পদ্ম-অর্ঘ্য-উপহারে বরণ করতে চান তাঁর প্রেমাস্পদকে। আমরা বলতে পারি, এই দুই ভাবের রাধাকে তৈরি করেছেন চৈতন্য-পূর্ব যুগের দুই কবি— প্রথম ভাবের রাধা রাজসভাকবি বিদ্যাপতির হাতে গড়া, —রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর দ্যুতি ও দীপ্তি বিকিরিত; আর দ্বিতীয় ভাবের রাধার সৃষ্টিকর্তা গ্রাম বাংলার কবি চণ্ডীদাস, —অলঙ্কারের বদলে সহজ সুরে সৃষ্ট এই রাধা। এই দ্বিবিধ ভাবনাই দুজন কবি মানসের সৌন্দর্যের নির্যাস। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য সম্পর্কে বলেছেন— "সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া আমরা অনন্ত রঙ্গভূমি দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য বাতায়নে বসিয়া আমরা সুদুর আকাশের নীলিমা দেখি, সুদুর কাননের সমীরণ স্পর্শ করি, সুদুর পুষ্পের গন্ধ পাই, স্বর্গের সূর্যকিরণ সেইখান হইতে আমাদের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে।" —এই সৌন্দর্যই স্বর্গ, সৌন্দর্যই প্রেম, এবং প্রেমই পূজা। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী হয়েও চণ্ডীদাস প্রেমকে পূজার আলোকে তুলে ধরেছেন বৈষ্ণব পদাবলিতে।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় স্রোতধারায় যে কয়েকটি শাখায় বাঙালি প্রতিভার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতম এবং বিশিষ্টতম শাখা বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন ও বিকাশের ইতিহাসে পদাবলি সাহিত্যকে মধ্যযুগের বাঙালি কবির সর্বোত্তম সাহিত্য কীর্তি বলা চলে। মানব হৃদয়ের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি ও প্রবল উৎকণ্ঠা, প্রগাঢ় সৌন্দর্যানুভূতি ও সুকোমল প্রেমমাধুর্য, অতীন্দ্রিয় জীবন বোধ ও বিস্ময় বিমুগ্ধ ভাববিহ্বল জীবন চেতনা এবং জানা-অজানা,

ধরা-অধরা, পাওয়া-না-পাওয়ার দোলায় দুলে মিলনে বিরহে যে প্রেমসংগীত বিচিত্র রাগরাগিণীতে পদাবলিতে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে তা জীবনদৃষ্টির গভীরতায় ও অনন্ত রহস্যমণ্ডিত রোমান্টিক সুর-মূর্ছনায় অমূল্য রস সৌন্দর্যে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে।

পদাবলির মূলে রয়েছে রাধা-কৃষ্ণের মধুর লীলা। মধুরের সাধনা পরমের সাধনা-এ সাধনায় তপঃ সিদ্ধ হতে গেলে কঠোর দুর্গমের পথ বেয়ে দুঃসহ দুঃখানলে পুড়ে তবেই 'নিকষিত হেম' হওয়া যায়। রাধা প্রেমের বিকাশ সেই সাধনারই ইতিহাস।

বৈষ্ণব সাহিত্য শ্রেয়োবোধের দ্যোতনা-বাহী, তা মুক্ত জীবনের জয়ধ্বনিতে মুখরিত। তা জনপথবাহী হয়ে মধ্যযুগের প্রথানুবর্তী জীবনচেতনার মধ্যে পালা বদলের সূচনা ঘটিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"বৈষ্ণবধর্মে প্লাবনের সময় বিশ্বপ্রেম বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে সমস্ত কৃত্রিম সংকীর্ণতার বেড়া ভাঙিয়া দিয়া উচ্চনীচ শুচি অশুচি সকলকেই এক ভগবানের আনন্দলোকে আহ্বান করিল, সেই দিনকার বাংলাদেশের গান বিশ্বের গান হইয়া জগতের নিত্য সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। বৈষ্ণবকাব্যই আমাদের দেশের সাহিত্যকে প্রথম রাজসভার সংকীর্ণ আশ্রয় হইতে বৃহৎভাবে জনসমাজের মধ্যে বাহির করিয়া আনিল।"

আর এই সুদূর অসীম বিপুলের ডাক যিনি আমাদের কানে পৌঁছে দিলেন মধুময় কৃষ্ণনামের মধ্য দিয়ে তিনি গৌড়বঙ্গের অবতার স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব। মহাপ্রভুর আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে পদাবলি সাহিত্যকে তিনটি বিশেষ পর্যায়ে ভাগ করা যায়— চৈতন্য-পূর্ব যুগের পদাবলি, চৈতন্য-সমসাময়িক পদাবলি এবং চৈতন্যোত্তর পদাবলি সাহিত্য।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সময় থেকেই বৈষ্ণব পদাবলির যথার্থ আরম্ভ বলা যায়। তাঁর জীবন ও আচরণে যে প্রেমভক্তির জোয়ার জেগেছিল, তাঁর প্রভাবেই চৈতন্য-পূর্ববর্তী বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পূর্ণ পৃথক সুরের ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। তাঁকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন অজস্র জীবনীসাহিত্য গড়ে উঠেছিল তেমনি অপরদিকে বৈষ্ণব পদাবলিকে সমৃদ্ধ করেছিল এক নতুন ধারা। এ ধারায় একদিকে আছে— গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলি, অপরদিকে রয়েছে গৌরচন্দ্রিকা।

এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস একদিকে মহাপ্রভুর ভাবমূর্তি ও অপরদিকে রাধিকার মানস-মূর্তি সৃষ্টি করেছেন। চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে গোবিন্দদাস যেন ভাস্বর ভাস্কর।

বৈষ্ণব পদাবলি ভক্তির ভিত্তিতে, নয়নের অশ্রুতে, চিত্তের প্রীতিতে শাশ্বত হয়ে উঠেছে। পদাবলি সাহিত্য অশ্রুর সাহিত্য-আনন্দ ধারার সাহিত্য। পূর্বরাগ, অনুরাগ, সম্ভোগ, অভিসার, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, বিরহমিলন— এইভাবে পর্যায়ের পর পর্যায়ে প্রেম ভক্তির সুর গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠেছে। পদকর্তাগণ প্রেমিক ভক্ত। এক একটি বিশেষ পর্যায়ে বিশেষ এক একজন পদকর্তা শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করবার মত অসামান্যতা দেখিয়েছেন। ঠিক এমনি করেই রূপানুরাগের পদরচনায় কবি জ্ঞানদাস অতুলনীয়।

প্রাচীন কবিতায় প্রাকৃত বীজ থেকেই বৈষ্ণব পদাবলির অঙ্কুরোদ্‌গম হয়েছিল, কিন্তু জয়দেবেই ভিন্ন মৃত্তিকায় এই অঙ্কুরকে স্বতন্ত্র ভাবে রোপণ করেছিলেন। তবে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম ভক্তিসারের প্রভাবেই পদাবলি সাহিত্য মহীরুহ রূপে পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছিল। মহাপ্রভুর ভক্ত অলঙ্কারিক শ্রীরূপ গোস্বামী রসতত্ত্বের আলোকে একে অপ্রাকৃতলোকের গগনস্পর্শ করিয়েছেন একদিকে, অপরদিকে দিব্য প্রেমের আভিজাত্যে একে এমন ভাবে ঘিরে দিয়েছেন যে তা লৌকিক জগৎ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে গেছে।

চৈতন্যোত্তর যুগের পদকর্তারা একদিকে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তি লীলার প্রভাব, অপরদিকে শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রেমভক্তিতত্ত্বের প্রভাব— এই উভয়কেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে তাঁদের পদাবলি সাহিত্য রচনা করেছেন। এই উভয় প্রভাবের শক্তিকে ধারণ করেও যিনি চৈতন্য পূর্ব যুগের কবি সমাজের প্রভাব এড়াতে পারেননি আবার আপন রচনায় বিদ্যুৎ চমকের মতো একটি দুটি ছত্রে যিনি পরবর্তী রসপিপাসুর হৃদয়ে প্রভাব ফেলে গেছেন— তিনি চৈতন্য- পরবর্তী কবি জ্ঞানদাস।

এবারে আমরা পদাবলী ধারার চারজন কবি— বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদসের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করব।

১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

ভারতবর্ষে কখন এবং কেমন করে বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল তা নিয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মে বিচিত্র উপাদান যে মিশ্রিত আছে তাও বিচার্য বিষয়।

'শ্রীবিষ্ণু' ও 'বৈষ্ণব' শব্দ আমরা বৈদিক যুগ থেকেই দেখি। ভগবান বিষ্ণুকে যিনি ভক্তি দিয়ে উপাসনা করেন তিনিই বৈষ্ণব। ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও বিষ্ণুর প্রাধান্য যথেষ্ট কীর্তিত হয়েছে। উপনিষদেও বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তন হয়েছে। পৌরাণিক যুগেও বৈষ্ণব ধর্মের সন্ধান আমরা পাই। পদ্মপুরাণে চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। ভারতবর্ষে এই চার প্রকার বৈষ্ণবেরই দেখা পাওয়া যায় বর্তমানে।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আবির্ভূত হন পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। তার বহুপূর্ব থেকেই বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত ছিল। স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দ যাঁর আরাধ্য, তদীয় আবির্ভাব বিশেষ শ্রীগৌরাঙ্গ যাঁর প্রাণ, অনাদি বেদকল্পতরু হতে যার আবির্ভাব, শুক-নারদাদি পরমহংসগণ যে সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, ব্রহ্মা-শিব-ধ্রুব প্রহ্লাদাদি যাঁর পথ প্রদর্শক, এবং জগৎ পূজ্য শ্রীরূপ সনাতনাদি গোস্বামীগণ যে সম্প্রদারে আচার্য তার উৎকর্ষ স্বতঃসিদ্ধ।

শ্রীজয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাসের পদাবলি বাঙালি হৃদয়ের অনভিব্যক্ত ভাবরাশির আবেগময়ী অভিব্যক্তি।

পদাবলির অন্তরালে প্রবাহিত কাব্যের যে যমুনা-জাহ্নবী প্রবাহ দেখে সাহিত্যিকেরা বিমুগ্ধ হন, তা বৈষ্ণব ভক্তের কাছে বহিরঙ্গ ব্যাপার। তাঁরা পদাবলির গহনে প্রেম-ভক্তির সাগর তরঙ্গের রসভঙ্গি সন্দর্শনে মধুময়ী উপাসনার সন্ধান প্রাপ্ত হন এবং তা আস্বাদন করতে করতে ভাবরসে নিমজ্জিত হয়ে পড়েন।

অথচ বৈষ্ণব কবিতার উৎস ও পশ্চাৎপটের সন্ধানে গিয়ে আমরা লাভ করি লৌকিক প্রকীর্ণ কিছু কাহিনি। এই লৌকিক কাহিনির খোসার ভেতর কী করে এমন অনির্বচনীয় অলৌকিক প্রেমবীজের জন্ম হ'ল, আর এই বীজের পুরিপুষ্টি সাধনে কারা কীরূপে সহায়তা করেছিলেন তার সন্ধান করতে গিয়ে আমাদের চৈতন্য-পুর্ব ও চৈতন্যোত্তর পদকর্তাদের পদাবলি এবং তাঁদের কবিমানস সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আর সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই আলোচনার অবতারণা।

১.২ বিদ্যাপতি : কবি পরিচিতি

বিদ্যাপতি প্রকৃতপক্ষে কোন সময়ের কবি, তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। কবির রচনার মধ্য দিয়েই হয়তো তার সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণ এবং মিথিলারই রাজা শিবসিংহের সভাসদ ছিলেন। মিথিলার প্রচলিত রাজপঞ্জী অনুসারে শিবসিংহের ১৩৬৮ শকে (১৪৪৬ খ্রি.) সিংহাসনে বসেন। কবি তাঁর আদেশানুসারে 'পুরুষপরীক্ষা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। শিবসিংহ কবিকে বিসফী নামক গ্রাম দান করেন এবং 'সুকবি' 'নবজয়দেব' নামে পরিচিত হন বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষেরা সকলেই যশস্বী এবং বিদ্বান ছিলেন, মহারাজ গণেশ্বরের পরমসুহৃদ, গণপতি ঠাকুরই বিদ্যাপতির পিতা। কবি তাঁর 'পদ সমুদ্র'তে লিখেছেন—

"জনমদাতা মোর, গণপতি ঠাকুর, মৈথিলী দেশে করু বাস।
পঞ্চগৌড়াধিপ, শিবসিংহভূপ কৃপা করি লেউ নিজ পাশ।।
বিসফি গ্রাম, দান করল মুঝে, রহতহি রাজ-সন্নিধান।
লছিমাচরণধ্যানে কবিতা নিকশয়ে, বিদ্যাপতি ইহ ভাণ।।"

বিদ্যাপতির ঐতিহাসিক কাব্য 'কীর্ত্তিলতা'র মধ্যে আবার মিথিলার রাজা ভোগীশর বা ভোগীশ্বরের উল্লেখ আছে। তাঁর একটি পদে দিল্লীর সম্রাট আলম শাহের উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে আলমশাহের সময় ১৪৪৫-১৪৫১ খ্রিস্টাব্দ। বিদ্যাপতির আর একটি পদে জৌনপুরের হুসেন শাহের উল্লেখ আছে, যাঁর সমকাল ১৪৫৮-৭৬ খ্রিস্টাব্দ। অদ্বৈত মহাপ্রভুর সঙ্গে বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ হয় ১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে (১৩৮০ শকে)। এসকল প্রমাণ থেকেই বোঝা যায়, কবি ১৩৮০-১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিশ্চয়ই বর্তমান ছিলেন, এবং একাদিক্রমে মিথিলার রাজা কীর্তিসিংহ, দেবসিংহ, শিবসিংহ প্রমুখের সভাকবির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। বিদ্যাপতি অনেক পদেই তাঁর আশ্রয়দাতা শিবসিংহ এবং তাঁর মহিষী 'লছিমা দেবী'র নামোল্লেখ আছে। প্রবাদ আছে যে, লছিমা দেবীর সঙ্গে বিদ্যাপতির নিগূঢ় প্রণয় ছিল এবং মহিষীকে দেখলেই তাঁর কবিতা স্ফূরিত হত।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ :

(ক) মৈথিল কবি বিদ্যাপতি বিদ্বান যশস্বী বংশের সন্তান।

(খ) বিদ্যাপতির জীবৎকাল অনুমান সাপেক্ষ। বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রমাণ ও কবির

কাব্যের সূত্র থেকে অনুমান করা হয় তিনি ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন।

(গ) বিদ্যাপতি মিথিলার বেশ কয়েকজন রাজার সভাকবির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।

(ঘ) বিদ্যাপতির আশ্রয়দাতা শিবসিংহ কবিকে বিসফীগ্রাম দান করেন।

(ঙ) মিথিলার রাজা শিবসিংহের পত্নী লছিমা দেবীর সঙ্গে বিদ্যাপতির প্রণয় সম্পর্ক ছিল। কবির একাধিক পদে এই প্রণয়িনীর নামোল্লেখ আছে।

(চ) বিদ্যাপতি 'সুকবি' 'নবজয়দেব' ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

(ছ) কেবল বৈষ্ণব পদাবলিই নয়, বিদ্যাপতি অন্যান্য অনেক কাব্য রচনা করেন। তার মধ্যে 'কীর্ত্তিলতা' কাব্যখানি ঐতিহাসিক মূল্য দাবি করে।

(জ) অদ্বৈত মহাপ্রভুই বিদ্যাপতিকে প্রথম বাংলার সঙ্গে পরিচিত করান।

আত্ম সমীক্ষামূলক প্রশ্ন ঃ

(১) বিদ্যাপতি কোন সময়ের কবি?

....

(২) বিদ্যাপতিকে বাংলার সঙ্গে সুপরিচিত করান কে?

....

(৩) বিদ্যাপতির কয়েকটি গ্রন্থের নাম লিখুন।

....

(৪) বিদ্যাপতির জীবদ্দশায় মিথিলার বিখ্যাত রাজা কে ছিলেন?

....

(৫) লছিমা দেবী কে?

....

(৬) বিদ্যাপতির পিতার নাম কি?

....

(৭) কোন রাজা বিদ্যাপতিকে কোন গ্রাম দান করেছিলেন?

....

(৮) বিদ্যাপতি কোন নামে পরিচিত ছিলেন?

....

১.২.১ বাংলার সঙ্গে বিদ্যাপতির পরিচিতি

১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাপতির সঙ্গে শ্রীশ্রী প্রভুপাদ অদ্বৈত আচার্যের সাক্ষাৎ ঘটে।

প্রভুপাদ অদ্বৈত আচার্য তীর্থভ্রমণ কালে মিথিলায় উপস্থিত হয়ে পথিমধ্যে বটবৃক্ষমূলে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কিন্নর কণ্ঠে কৃষ্ণগুণ-গান করতে শুনে মোহিত হয়ে পড়েন। এমন সুন্দর কবিত্ব, সুন্দর ভাব এবং ভক্তিপ্রবণতা প্রভু কখনো দর্শন বা শ্রবণ করেননি। সঙ্গীত শ্রবণে প্রভু অদ্বৈতাচার্য বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় স্তম্ভিত হলেন, জিজ্ঞেস

করলেন— "হে মহাভাগ, আপনি কে?" ব্রাহ্মণ উত্তর দেন—

"মোর নাম দ্বিজ বিদ্যাপতি।
ব্রাহ্মণ ভোজনে মোর বিষয়েতে মতি।।
বাতুলতা করি মুঞি রচিনু এ গীত।
সারগ্রাহী সাধু তুহুঁ, তেঁই ইথে প্রীত।।
তোমা আকর্ষিতে শক্তি ধরে কোন জনে।
নিজ গুণে হইল মোর উদ্ধার সাধনে।।"

প্রভুপাদ তখন বললেন—

"অদ্ভুত তোমার রচিত এই গীতামৃত।
জীব কোন ছার, কৃষ্ণ হয় আকর্ষিত।।
ভাগ্যে মোর প্রতি কৃষ্ণ দয়া প্রকাশিল।
তেঁই পদকর্তা বিদ্যাপতির সঙ্গ হইল।।"

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার এক নতুন স্বর্ণালোক-মণ্ডিত দিগন্তকে সেদিন উন্মোচিত করেছিল।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ ঃ

(ক) বাংলার সঙ্গে বিদ্যাপতির যোগাযোগের প্রথম সেতু প্রভুপাদ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য।

(ক) প্রভুপাদ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য তীর্থ ভ্রমণ কালে মিথিলা নগরীতে উপস্থিত হয়ে পথে এক বটবৃক্ষমূলে সংগীতরত অবস্থায় বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ পান।

(গ) বিদ্যাপতির সঙ্গীতে মুগ্ধ প্রভু শ্রীঅদ্বৈত আচার্য বিদ্যাপতিকে স্বীকৃতি দেন।

(ঘ) কবি বিদ্যাপতি এবং প্রভুপাদ শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের সাক্ষাৎ ও কথোপকথনে বৈষ্ণবীয় বিনয় প্রকাশিত।

(ঙ) বৈষ্ণব পদাবলির অপর বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক।

(চ) অদ্বৈত প্রভু ১৪০৭ শকে ৫২ বৎসর বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মলীলা দেখতে সূতিকাগৃহে এসেছিলেন। তার বহপূর্বে তিনি তীর্থভ্রমণে গিয়েছিলেন। তাই বিদ্যাপতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার সত্য ঘটনা।

আত্ম সমীক্ষামূলক প্রশ্ন ঃ

(১) অদ্বৈতাচার্য কে ছিলেন?

....

....

(২) বিদ্যাপতির সঙ্গে কীভাবে আচার্য অদ্বৈতের সাক্ষাৎ ঘটে?

....

....

(৩) বিদ্যাপতির সঙ্গে প্রভুপাদ অদ্বৈতাচার্যের সাক্ষাৎ কোথায় ঘটেছিল?

....

....

১.২.২ বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে বিদ্যাপতির স্থিতি

বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে বিদ্যাপতির অবস্থানের কারণ প্রধানত দুটি—

(ক) বাংলাদেশে প্রচলিত প্রবাদ যেহেতু 'কানুছাড়া গীত নাই', তাই প্রাদেশিকতার কথাকে তুচ্ছ করেই রাধা-কৃষ্ণ লীলা-বিষয়ক রচনার কবি বিদ্যাপতি অতি সহজেই বাঙালির হৃদয়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছেন।

(খ) মধ্যযুগের মধ্যমণি মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং অন্যান্য মহাজনদের কাব্যের সঙ্গে বিদ্যাপতির কাব্যের রসাস্বাদ গ্রহণ করে অপার আনন্দ সাগরে ভেসেছেন। বিদ্যাপতি তাই নির্দ্বিধায় বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে এবং জনমানসে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

এ ছাড়াও বৈষ্ণব পদাবলির পশ্চাৎপট ও উৎস বিচারে আমরা দেখি যে, রাধাকৃষ্ণের লৌকিক আদিরসাত্মক প্রেমকাহিনিই ধীরে ধীরে দিব্য প্রেমলীলায় পরিণত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের হৃদয় অনুমোদনের দ্বারা আদিরসের ক্লেদ এই প্রেম কাহিনি থেকে একেবারে দূরীভূত হয়েছে এবং মানবজীবনের পরম ও চরম প্রাপ্তিতে পরিণত হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই আমরা বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলির কথা স্মরণ করতে পারি। তাঁর পদাবলিতে বৈষ্ণবতা ও বিলাসকলা— এই দুই-ই দেখা যায়, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল তাঁর বৈষ্ণবতাটুকুই গ্রহণ করেছেন। মৈথিল কবি এবং বিলাসকলার কবি হয়েও তাই বিদ্যাপতি বৈষ্ণব পদাবলিতে এক বিশেষ স্থানের অধিকারী।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ ঃ

(ক) বাংলাদেশের হাটে-মাঠে-ঘাটে বৈষ্ণবীয় বিনয় ছড়ানো, আর প্রেম ভক্তি রসাপ্লুত হৃদয়ে কৃষ্ণ হয়ে উঠেছেন আদরের 'কানু' বা 'কালা'। সেই 'কানু'র নাম রয়েছে যাঁর গানে তিনিও তাই বাংলাদেশের আদৃত। বাংলা সাহিত্যে তাই মৈথিল কবি বিদ্যাপতির মৈথিল পদ সহজেই অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে বিনা বাধায়।

(খ) মহাপ্রভু স্বয়ং বিদ্যাপতির কাব্যের রসাস্বাদ গ্রহণ করে আনন্দে আপ্লুত হয়েছেন। 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত'তে এর ঐতিহাসিক উল্লেখ পাই

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ।

অতএব, বাংলার 'নদের নিমাই' যাঁর পদ আস্বাদনে প্রীত হয়েছেন, সেই কবি বিদ্যাপতিকে বাঙালি যে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করবে, এতে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না।

(গ) বিদ্যাপতি রাজসভার কবি, বিলাস-কলা-কুতূহলের কবি। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলি ভক্তির আধার। অথচ এই বৈষ্ণব পদাবলির শ্রেষ্ঠ পদকর্তাদের মধ্যে বিদ্যাপতি একজন, তার কারণ হলো, বৈষ্ণব পদাবলির উৎসমূলে লৌকিক আদিরসাত্মক প্রেমকাহিনি থাকলেও মহাপ্রভুর হৃদয় অনুমোদনের দ্বারা আদি রসের ক্লেদ মুছে গিয়ে পদাবলিতে ফুটে উঠেছে নিত্য বৃন্দাবনের সচ্চিদানন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার দিব্য প্রেমলীলা, যা বৈষ্ণব ভক্তের পরম আকাঙ্খিত। তাই বিলাস কলার কবি হলেও বাংলা পদাবলিতে বিদ্যাপতির স্থান গ্রহণ করতে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আসেনি।

(ঘ) বিদ্যাপতি মৈথিল কবি। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্রের কোনো ভেদাভেদ নেই। প্রেমের প্রাবল্যে যেখানে ঘর বাহির হয়ে, বাহির হয়ে ওঠে ঘর, আপনজন পর হয়ে, পর হয়ে ওঠে আপন, সেখানে ভাষারূপ 'কাঠকি বাধা' কোনো বাধাই নয়। তাই প্রেম-সুখ-দুঃখের উল্লাসে-বিষাদে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি অতি সহজেই বাঙালির আদৃত ও বরেণ্য হয়ে উঠেছেন বাংলা সাহিত্যে।

আত্ম সমীক্ষামূলক প্রশ্ন :

(১) বাংলা বৈষ্ণব পদাবলিতে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির কাব্য কেন এত সমাদৃত— আলোচনা করুন।

....

....

(২) মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে বিদ্যাপতির পদের রসস্বাদন করেছেন তার প্রমাণ কী?

....

....

১.২.৩ মৈথিল কবি বিদ্যাপতি বাংলা সাহিত্যে প্রাদেশিকতার গণ্ডি ভেঙে দিয়েছেন

এ সম্পর্কে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব"— এ উল্লিখিত বক্তব্যটি অনুধাবনযোগ্য—

"বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলেও তাঁহাকে আমরা বাঙ্গালার প্রাচীন কবি শ্রেণীর অন্যতমই বলিতে চাই, যেহেতু তৎকালে মিথিলা ও বঙ্গদেশে অধিকতর ঘনিষ্ঠতা ছিল। উভয়দেশের ছাত্রগণ উভয়দেশে বিদ্যার আদান প্রদান করিতেন। প্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য প্রভৃতিও মিথিলা হইতে অধ্যয়ন করিয়া ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ শুনা যায়। অনেকের মতে সেনবংশীয় রাজাদের আমলে উভয় রাজ্য অভিন্ন ছিল। সেন রাজারা বর্তমান দ্বারভাঙ্গাকে (দ্বার বাঙ্গা বা বঙ্গদ্বার) বঙ্গরাজ্যের পশ্চিমদ্বার মনে করিতেন, তৎকালে ভাষাও প্রায় একরূপই ছিল। বঙ্গদেশের রাজা লক্ষ্মণ সেন প্রবর্ত্তিত শক এদেশে প্রচলিত না হইলেও অদ্যাপি মিথিলায় 'ল সং' নামে প্রচলিত

আছে, অতএব যখন বঙ্গদেশ ও মিথিলায় এতদূর ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পাইতেছে, তখন যে কবি বাঙ্গালার বিখ্যাত কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুসরণে শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন— যে সকল সঙ্গীত কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও সুগম্ভীর গম্ভীরালীলায় আস্বাদন করিয়া বিমোহিত হইতেন— যাহা বঙ্গদেশীয় কবিগণ স্বকীয় বোধে বহুকাল ধরিয়া সংকীর্ত্তন করিতেছেন— যাহাদের অনুকরণে বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব কবিগণ শত শত পদ রচনা করিয়া বঙ্গভাষা মাতৃকার সেবা করিয়াছেন— আমরা সেই কবিকে বঙ্গদেশীয় কবির আসন আসন হইতে সরিয়া যাইতে দিব না। বস্তুতঃ তাঁহাকে আমরা বঙ্গদেশেরই প্রচীন কবি বলিব এবং তাঁহার রচনা বঙ্গদেশের আদিম রচনা বলিয়া বোধ করিব।" (পৃঃ ৩১-৩৪)।

—এই ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং মানসিক কারণেই বিদ্যাপতি বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে চিরকালের আদৃত হয়ে প্রাচীন কবির আসন আলঙ্কৃত করে আছেন। বস্তুতঃ বাংলার কবি চণ্ডীদাস এবং মিথিলার কবি বিদ্যাপতি যেন বৈষ্ণব পদাবলির দুটি মেরুর অবস্থিতি রক্ষা করেছেন। বাঙালি কবিসমাজে বিদ্যাপতি যে অতি সহজেই আদৃত হয়েছেন তার প্রধান কৃতিত্ব বৈষ্ণব সাধক কবি ও কীর্তনীয়াদের। চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব কবিতার রূপ ও ভাবের সঙ্গে তাঁর এত মৌলিক পার্থক্য, তাঁর ভাষার সঙ্গে বাংলার বিস্তর দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও অনুসরণে, আস্বাদনে ও রস সংকীর্তনে তিনি অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর প্রভাব কেবল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কিংবা বৈষ্ণব সাধকদের মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তার প্রমাণ আমরা পাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভানুসিংহের পদাবলি' পাঠ করলে। এই রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির ভাব ও ভাষার দ্বারা কিরূপে প্রভাবিত হয়েছিলেন, একটি উদাহরণের দ্বারা তা দেখানো যেনে পারে।

"আজু সখি মুহু মুহু
গাহে পিক কুহু কুহু,
কুঞ্জবনে দুঁহু দুঁহু
দোঁহার পানে চায়।
যুবন মদ বিলসিত
পুলকে হিয়া উলসিত,
অবশ তনু অলসিত
মূরছি জনু যায়।
আজু মধু চাঁদনী
প্রাণ উনমাদনী,
শিথিল সব বাঁধনী,
শিথিল ভই লাজ।
বচন মৃদু মরমর,
কাঁপে রিঝ থরথর,
শিহরে তনু জরজর
কুসুমবনমাঝ।"

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি-র সূচনায় রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন এক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন— "পদাবলীর যে ভাষাকে ব্রজবুলি বলা হোত আমার কৌতূহল

প্রধানত ছিল তাকে নিয়ে।.....এক শব্দ যতবার পেয়েছি তার সমুচ্চয় তৈরী করে যাচ্ছিলুম। একটি ভালো বাঁধানো খাতা শব্দে ভরে উঠেছিল। তুলনা করে আমি অর্থ নির্ণয় করেছি। পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বিদ্যাপতির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন আমার খাতা তিনি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। ....

তার পরের সোপানে ওঠা গেল পদাবলীর জালিয়াতিতে। অক্ষয়বাবুর কাছে শুনেছিলুম বালক কবি চ্যাটার্টনের গল্প। তাঁকে নকল করবার লোভ হয়েছিল। একথা মনেই ছিল না যে, ঠিকমত নকল করতে হলেও শুধু ভাষায় নয়, ভাবে খাঁটি হওয়া চাই। নইলে কথার গাঁথনিটা ঠিক হলেও সুরে তার ফাঁকি ধরা পড়ে। পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয়, তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না। তাই ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই।"

বৈষ্ণবচিত্তের সঙ্গে ভানুসিংহের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা না থাকলেও বিদ্যাপতির সঙ্গে বাঙালির আত্মীয়-সম্বন্ধ কেমন তা কবির উক্তি বা তাঁর রচনার সাহায্যেই প্রমাণিত হয়।

শুধু এই-ই নয়, কোন ঐতিহাসিক কারণে বিদ্যাপতি বাংলার একজন হয়ে উঠেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

"তদানীন্তন মিথিলা দীর্ঘকাল ধরিয়া বাংলার সারস্বততীর্থ ছিল এবং স্বভাবতই তাহার উপর মৈথিল ভাষার একটা আকর্ষণ ছিল। মিথিলাতেই ব্রজবুলির ক্ষেত্র কতকটা প্রস্তুত হইয়াছিল— বিদ্যাপতি-উমাপতি স্বয়ং একাজ করিয়াছিলেন। শৈব মিথিলায় বৈষ্ণব ভাবধারা বর্ষিত হইয়াছিল বাংলারই 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্' হইতে। সেই ধারা-পানে যে কয়টি চাতক আনন্দে গাহিয়া উঠিয়াছিল, উমাপতি-বিদ্যাপতি তাহাঁদের মধ্যে প্রাচীনতম। সাধারণ মিথিলাবাসী যে সে-গানে মুগ্ধ হইবে না এবং বাঙালিই তাহা কান পাতিয়া শুনিবে, একথা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। তাই পদাবলী রচনায় তাঁহারা প্রয়োগ করিয়াছিলেন সরলতর ভাষা।....."

('বৈষ্ণব পদাবলী' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ভূমিকা)

বিদ্যাপতির পদাবলি পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর ভাব ও ভাষা বাঙালির চিত্তের অত্যন্ত কাছাকাছি। তাই বাঙালি রসিক সমাজ তাঁকে কেবল গ্রহণ করেছেন তা নয়, তাঁকে আত্মসাৎ-ও করেছেন। তাই বিদ্যাপতিকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এবং তাঁর রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কবিতাগুলি বাংলা বৈষ্ণব পদাবলির অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে বাঙালি পাঠকের ন্যায্য দাবি হিসেবেই মানা যায়। বাংলাদেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে তিনি মহাজনরূপেই স্বীকৃত হয়েছেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী না হলেও কিন্তু কীর্তনে তাঁর পদ অন্যান্য মহাজন পদকর্তার পদের মতোই শ্রদ্ধার সঙ্গে গীত হয় এবং প্রাদেশিকতা বা ধর্মের দাবিতে তাকে কখনোই অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়না।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ ঃ

(ক) মৈথিল কবি বিদ্যাপতি যে প্রাদেশিকতার সমস্ত গণ্ডী ভেঙে এবং ধর্মের বন্ধনকে শিথিল করে বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে মহাজনরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন বিভিন্ন আলোচনা ও তথ্যের মাধ্যমে সে কথা আমরা জানতে পারি।

(খ) প্রাচীন কালে বাংলা ও মিথিলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং আদান প্রদানের মাধ্যমেই বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক মৈথিল পদ সহজেই, বিনা প্রশ্নে, সানন্দে বাংলায় গৃহীত হয়েছে।

(গ) ঐতিহাসিক, সামাজিক ও মানসিক কারণেই বিদ্যাপতি বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে চিরকালের জন্য আদৃত।

(ঘ) বাংলার বৈষ্ণব সাধক কবি ও কীর্তনীয়াগণের দ্বারাই বিদ্যাপতি বাংলা বৈষ্ণব পদকর্তার আসন অলঙ্কৃত করেছেন।

(ঙ) চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে বিদ্যাপতির পদের ভাব ও ভাষার মৌলিক পার্থক্য সুদূর হওয়া সত্ত্বেও তিনি অপরিহার্য ছিলেন।

(চ) বিদ্যাপতির প্রভাব কেবল বৈষ্ণব সাধকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি, বাঙালি রসিক সমাজ তাঁকে গ্রহণ ও আত্মসাৎ করেছেন। এমনকি কবি রবীন্দ্রনাথও তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন তাঁর প্রথম যুগের একটি কাব্য রচনায়।

আত্ম সমীক্ষামূলক প্রশ্ন ঃ

(১) বিদ্যাপতি কোন ভাষায় পদাবলি রচনা করেছিলেন?

....

....

(২) বিদ্যাপতির ধর্ম কী ছিল?

....

....

(৩) বিদ্যাপতির সমকালীন আর একজন কবির নাম উল্লেখ করুন।

....

....

(৪) বিদ্যাপতিকে আধুনিক যুগে গ্রহণ করা হয়েছে কি?

....

....

(৫) রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন কাব্যে বিদ্যাপতির ভাব ও ভাষাকে অনুসরণ করেছিলেন?

....

....

১.২.৪ বিদ্যাপতির কাব্য ও কবিমানসের পরিচিতি

স্মার্ত পৌরাণিক ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের বংশধর কবি বিদ্যাপতি। এই বিদগ্ধ পণ্ডিত বংশের ছাপ তাঁর মধ্যেও পড়েছে। পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'কীর্তিলতার ভূমিকা'য় বলেছেন—

"তিনি মিথিলা, বাংলা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের ব্রাহ্মণের ন্যায় স্মার্ত ও পঞ্চোপাসক ছিলেন; অর্থাৎ স্মৃতির বিধান মানিয়া চলিতেন এবং গণেশ, সূর্য, শিব, বিষ্ণু ও দুর্গা এই পঞ্চদেবতার উপাসনা করিতেন।"

—এই তথ্য থেকে একটি কথা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় যে, বিদ্যাপতির কাব্য প্রেরণার উৎসমূলে কখনই বৈষ্ণব ভাবনা সক্রিয় ছিল না। তাঁর বৈচিত্র্যময় রচনাই তার প্রমাণ। নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভা এবং সৌন্দর্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণই তাঁকে বিচিত্র সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত করেছে। যে বিচিত্র বিষয়ের দিকেই তাঁর চিত্ত আকর্ষণ অনুভব করেছে সেই ভিন্নাস্বাদ বিষয়ের গ্রন্থ রচনাতেই তিনি অসামান্য বিস্ময়কর প্রতিভা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

বিদ্যাপতির রচিত গ্রন্থরাজির তালিকা ঃ

(ক) 'বিভাগসার', 'দানবাক্যাবলী'— স্মৃতিগ্রন্থ (ভাষা—সংস্কৃত)

(খ) 'বর্ষাক্রিয়া', 'গঙ্গাবাক্যাবলী', 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী'— পূজা ও সাধন পদ্ধতির সংকলন (ভাষা—সংস্কৃত)

(গ) 'কীর্তিলতা', 'কীর্তিপতাকা'— ইতিহাস গ্রন্থ (ভাষা—অবহট্‌ঠ)

(ঘ) 'ভূপরিক্রমা'— ভৌগলিক তীর্থ পরিচয় (মিথিলা থেকে প্রয়াগ-কাশী পর্যন্ত পথ বিবরণ) (ভাষা—সংস্কৃত)

(ঙ) 'লিখনাবলী'— অলঙ্কারশাস্ত্র (আদর্শ পত্রলিপি) (ভাষা—সংস্কৃত)

(চ) 'পুরুষপরীক্ষা'— গদ্যগ্রন্থ (কয়েকটি কাহিনি) (ভাষা—সংস্কৃত)

এছাড়াও রয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠতম হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলি।

বিদ্যাপতির রচিত বৈষ্ণব পদাবলি, সম্পর্কে তুলনা করে আমরা বলতে পারি পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী যেমন তাঁর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' নামক দুটি বিখ্যাত অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা কালে বলেছেন যে, তিনি অপার 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র মধ্য থেকে 'উজ্জ্বলনীলমণি'-স্বরূপ মধুর রস-রূপী মহারত্নকে তুলে নিয়ে যথাসাধ্য বিস্তৃতভাবে তার ঔজ্জ্বল্যকে প্রস্ফুটিত করে দেখিয়েছেন, ঠিক তেমনিই বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি তাঁর বহুল কাব্যরত্নের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল রত্ন হল তাঁর রচিত বৈষ্ণব পদাবলি। অর্থাৎ, বিদ্যাপতি কেবল বৈষ্ণব সাহিত্যতেই নিমগ্ন হয়ে থাকেননি, এই পদাবলি তাঁর সমগ্র সৃষ্টির একটি বিশেষ অংশমাত্র।

বহু বিস্তৃত বিদ্যাপতির পাণ্ডিত্য স্মৃতি থেকে পূজাপদ্ধতি, অলঙ্কার শাস্ত্র থেকে ইতিহাস কিংবা ভূপরিচয় পর্যন্ত তাঁর জ্ঞান কেবল যে আদিগন্ত বিস্তৃত ছিল তা নয়, সে জ্ঞান তাঁর এত গভীর ছিল যে তা নিয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করবার মতো বিস্ময়কর ক্ষমতা ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। একদিকে পাণ্ডিত্য অপরদিকে নান্দনিক ভাব তাঁকে বিচিত্র জ্ঞানগর্ভ রচনা থেকে শুরু করে সৌন্দর্য এবং ভাবমূলক রচনার এ-প্রান্ত থেকে সে-প্রান্ত পর্যন্ত অবগাহন করবার ক্ষমতা এনে দিয়েছে, আর একটি জিনিসও এক্ষেত্রে

লক্ষ না করে পারা যায় না। সে হল কবির ভাষার দখল। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর দক্ষতা আমাদের বিস্মিত করে তুলতে বাধ্য করে।

বিদ্যাপতির এই অবাধসঞ্চারী কৌতূহল ও আনন্দ, অবৈষ্ণব-মানস এবং পাণ্ডিত্যপুষ্ট জ্ঞানানুসন্ধিৎসু চিত্ত— অর্থাৎ সর্বাবস্থায় এক মুক্ত চেতনা তাঁর কাব্যের সৌন্দর্য স্বরূপের বিচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাঁর পাণ্ডিত্য তাঁর অন্তরের সাহিত্য চেতনাকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। একদিকে অতি সচেতন শিল্পপ্রবুদ্ধচিত্ত, বিচিত্র জ্ঞান এবং রসশাস্ত্রের উপর অগাধ দখল এবং অপরদিকে তাঁর প্রতিভার উপর প্রতিফলিত রাজসভার পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব— সব কিছুর প্রতিফলন ও সম্মেলনে তাঁর কাব্য 'রাজকণ্ঠের মণিমালার' মতো আলোক বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছে। রাজসভার উপযুক্ত হয়ে গড়ে-উঠা তাঁর মানস লোক—এ-ও তাঁর অন্তরেরই সামগ্রী। তাই সেকালের নাগর বৈদগ্ধ্য তথা সভ্যতার অন্যতম প্রতিনিধিরূপেই তাঁর আত্মপ্রকাশ।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ ঃ

(ক) বিদ্যাপতি মিথিলার স্মার্ত পঞ্চোপাসক ব্রাহ্মণ এবং বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।

(খ) কেবল বৈষ্ণব ভাবনায় ভাবিত হয়ে তিনি পদাবলি সাহিত্যে পদ রচনা করেননি।

(গ) তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, বিচিত্র বিষয়ের প্রতি তাঁর সমধিক আকর্ষণ, অগাধ-পাণ্ডিত্য আর অনন্ত সৌন্দর্য তৃষ্ণায় আকুল চিত্ত নিয়ে তিনি বিচিত্র বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলির পদগুলি তাদেরই একটি অংশ।

(ঘ) বিভিন্ন বিষয়ের মতো বিভিন্ন ভাষায়ও বিদ্যাপতির স্বাভাবিক ভাবেই গভীর দখল ছিল।

(ঙ) কাব্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি কোনো প্রাদেশিকতা বা কোনো ধর্মের গণ্ডীতে বদ্ধ থাকেননি। এক মুক্ত বিশাল হৃদয় ও শিল্পসচেতন মন এবং গভীর পাণ্ডিত্য নিয়ে তিনি শিল্পরচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

(চ) বিদ্যাপতির কাব্য রচনায় গভীর ভাবে প্রভাব ফেলেছিল রাজসভার প্রত্যক্ষ পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যকে বলেছেন 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'।

আত্ম সমীক্ষামূলক প্রশ্ন ঃ

(১) বিদ্যাপতি কী কী বিষয়ে কাব্য রচনা করেছেন?

....

....

(২) বিদ্যাপতির কয়েকটি গ্রন্থের নাম লিখুন।

....

....

(৩) বিদ্যাপতি কোন কোন ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন ?

....

....

(৪) বিদ্যাপতির কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে তুলনা করেছেন?

....

....

১.২.৪.১ রাজসভার কবি বিদ্যাপতি

অতীতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুললেই প্রতি রাজসভায় একজন রাজসভা কবির বিশিষ্ট আসন আমরা দেখতে পাই। পূর্বকালে রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু গুণী জ্ঞানী সভাসদকে আমরা পাই; বিশেষ করে সভাপণ্ডিত বা রাজসভাকবিকে আমরা দেখি সেই বিশেষ বিশেষ যুগের প্রতিনিধিরূপে। উদাহরণ হিসেবে আমরা বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নের মধ্যে উজ্জ্বলতম রত্ন কালিদাসের কথা উল্লেখ করতে পারি। কালিদাস কেবল রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ সভাকবি রূপে তাঁর সভার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলেননি, তিনি সেই যুগেরই প্রতিনিধি— তাঁর রচনায় সেই যুগ তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্জ্বল ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বিদ্যাপতি সম্পর্কেও আমরা বলতে পারি যে, তিনি গড়ে উঠেছেন এক বিশেষ যুগ, বিশেষ সমাজ ও বিশেষ প্রতিবেশে। সেই যুগ-সমাজ-পরিবেশ তাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ধরা দিয়েছিল বিদ্যাপতির কাব্যে। তাঁর কাব্য-সাধনা ও কবি-ভাবনার অন্তরঙ্গ সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে এবং তার বাস্তব জীবনের কাহিনি বা লোকশ্রুতির যে অংশ বিশেষ পাওয়া যায়, তার থেকে একথাই স্পষ্ট হয় যে কবি বিদ্যাপতি সে যুগের প্রতিনিধি-পুরুষ। তিনি মিথিলার পুরুষানুক্রমে রাজকার্যে নিরত রাজসভার কবি। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কাব্যজীবন অতিবাহিত হয়েছে একাধিক মিথিলাধিপতির পৃষ্ঠপোষকতায়। তবে রাজা শিবসিংহের রাজত্বকালই তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা সৃষ্টিশীল সুবর্ণযুগ।

রাজসভার আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন বলেই প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা শব্দকুশলী কবির শিল্পিত ছন্দোঅলঙ্কারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হয়ে চিত্র-সঙ্গীতময় হয়ে উঠেছে। অন্যান্য সভাকবির মতো গতানুগতিকভাবে বিদ্যাপতির রচনাতেও রাজসভা ও রাজার গুণাবলি নিয়ে সভাকবির প্রশস্তি রয়েছে।

যেমন ঃ

"ভন বিদ্যাপতি কম্পিত কর হো
বোলল বোল ন যায়।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাঅন
সামর সুন্দর কায়।।"

কিন্তু এছাড়া রয়েছে বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী, প্রত্যক্ষদর্শিতা ভোগবাদী সৌন্দর্য-চেতনা, আলঙ্কারিক শিল্পনৈপুণ্য, মার্জিত বর্ণনাভঙ্গি, মননশীলতা, বক্র কটাক্ষ, কৌতুক, রসজ্ঞতা, শৃঙ্গারচর্চা আদির মহাসমারোহ।

যেমন :

"সজনী, অপুরুব পেখল রামা।
কনয়লতা অবলম্বনে উঅল
হরিনহীন হিমধামা।।"

এই নাগরবৈদগ্ধ্য কলা-কুশলতা সভাকবিরই বিশিষ্ট লক্ষণ। কিন্তু বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে, সভাকবির যেগুলি ত্রুটি লক্ষণ— আবেগহীন ভোগসর্বস্বতা, ইন্দ্রিয়সর্বস্ব দেহলোলুপতা, চটুল চতুর নাগরিকতা, অলঙ্কারের প্রাচুর্য ও কৃত্রিমতা ইত্যাদি বিদ্যাপতির যৌবনকালের উচ্ছ্বলিত প্রথম দিনগুলির পদে পাওয়া গেলেও শেষ পর্যায়ের পদে তাদের অনুপস্থিতি আশ্চর্যভাবে লক্ষণীয়।

যেমন :

"মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনি ছোড়বি মোয়।।"

বরং শেষ দিকের পদে কবি বিগত যৌবনের মদিরতায় হারিয়ে ফেলা দিনগুলির জন্য অনুতপ্ত হয়ে বার বার কাতর প্রার্থনা জানিয়েছেন বৈষ্ণব পদে—

যেমন :

"মাধব হম পরিনাম নিরাসা।
তুহুঁ জগতারণ দান দয়াময়
অতএ তোহরি বিশোয়াসা।।

শুধু এ-ও নয়, মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যখন স্বয়ং তাঁর পদাস্বাদনে ভাবে বিভোর হয়েছেন, সেই সঙ্গেই একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, সকল ঐশ্বর্য আড়ম্বরের ঘনঘটার আড়াল ভেদ করে এমন এক গভীর বাণী তাঁর পদে নিশ্চয়ই উঁকি দিয়েছে যা সূর্যরশ্মির মতো যৌবন দীপাবলির সমস্ত আলোকচ্ছটাকে ম্লান করে দিয়েছে। আর এই গভীরতার স্বতঃ নিঃসরণের জন্যই ভক্তপ্রাণ আকুল হৃদয়াবেগে চিরকাল ধরে বিদ্যাপতির পদ আস্বাদন করেছেন, নতুবা এ-বৈদগ্ধ্য, এই পাণ্ডিত্য নিয়ে ভারতচন্দ্রের মতোই বিদ্যাপতিও কেবল যুগেরই প্রতিভূ হয়ে থাকতেন, সর্বকালের জন-মন-হরণ করে ভক্তির আবেগে প্রেমের বিহ্বলতায় ভক্ত প্রেমিককে চিরকাল ধরে এমন আনন্দের অশ্রু বন্যাবেগে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না। দুই বিপরীত ধর্মের এমন আশ্চর্য সমন্বয় কি করে তাঁর কাব্যে সাধিত হয়েছে, তা বিচার সাপেক্ষ। আমরা বৈষ্ণব পদাবলি অবলম্বনে কবির এই নৈপুণ্য আলোচনা করতে চাই।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ :

(ক) বিদ্যাপতি রাজ সভাকবির পদ অলঙ্কৃত করে রাজসভাও রাজার প্রশস্তিই কেবল রচনা করেছেন তা নয়।

(খ) বিদ্যাপতি যে যুগে ছিলেন, সেই যুগ, সমাজ ও পরিবেশের সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রচনায়।

(গ) বিদ্যাপতি বিশেষ এক যুগের প্রতিনিধি পুরুষ। সে যুগ মিথিলার স্বর্ণ যুগ।

(ঘ) অন্যান্য রাজসভা কবির মতোই বিদ্যাপতির প্রথম যুগের রচনায় নাগর বৈদগ্ধ্য কলা-কৌশল লক্ষণীয়।

(ঙ) কিন্তু বিদ্যাপতির বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর রচনায় শেষ পর্যায়ে এই নাগরিক বৈদগ্ধ্য ছলা কাল অলঙ্কার সমারোহ হৃদয়হীন ইন্দ্রিয় সর্বস্বতা, ভোগলোলুপতা অনুপস্থিত।

(চ) বৈষ্ণব পদাবলির মধ্যেও কবির রচনা বৈশিষ্ট্যের এই দুটি পর্যায় লক্ষ করা যায়।

আত্ম সমীক্ষামূলক প্রশ্ন ঃ

(১) বিদ্যাপতির কাব্যের দুটি পর্যায় কী কী?

....

....

(২) সভাকবি-রূপে বিদ্যাপতির রচনার বৈশিষ্ট্য কী কী?

....

....

(৩) বিদ্যাপতি ভোগবাদী না ভোগ সর্বস্ব কবি?

....

....

(৪) বৈষ্ণব পদাবলিতে কোন পর্যায়ে বিদ্যাপতির শেষ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?

....

....

(৫) বৈষ্ণব পদাবলির কোন পর্যায়ে বিদ্যাপতির নাগর-বৈদগ্ধ্য ও কলা-কুশলতা লক্ষ করা যায়?

....

....

১.২.৪.২ বৈষ্ণব পদাবলি ও বিদ্যাপতি

কোনো ভক্তপ্রাণ মানসিকতা নিয়ে আবেগ বিহ্বলতায় আবিষ্ট হয়ে বিদ্যাপতি বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করতে বসেননি। রাজমনোরঞ্জনার্থে শৃঙ্গারোপযোগী বিলাস কলার চর্চা হিসেবে অন্যান্য কাব্যের মতোই তিনি বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করেছেন। এই রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলি তিনি কোনো সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ভাবুকতার উপর নির্ভর করে সৃষ্টি করেননি; কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, এক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ কবিত্ব শক্তি সর্বজন স্বীকৃত।

জয়দেব রচিত শ্রীগীতগোবিন্দকে বাদ দিয়ে বলা যায়, আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম বৈষ্ণব পদকর্তা হলেন মৈথিল কবি বিদ্যাপতি। রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলাকে অবলম্বন করে তিনি যে সকল পদ রচনা করেছিলেন সেগুলি বাংলা বৈষ্ণব পদাবলির গঠন-প্রকৃতি, স্তবক বন্ধন, ভাষা প্রভৃতি ক্ষেত্রেত যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। এছাড়াও, মহাপ্রভুর অনুমোদনের জন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কাছে বিদ্যাপতি 'গোস্বামী' বলে বিবেচিত হন।

রাজসভার কবি বিদ্যাপতি, তিনি বিদগ্ধ কলাকুশলী সচেতন শিল্পী, মূলতঃ প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি। পদ রচনার ক্ষেত্রে তিনি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'কেই অনুসরণ করেছেন। তাঁর পদাবলিতে মর্ত্য-ভূমির ভোগের আধারে অধ্যাত্মলোকের ভক্তিরসের আধেয়ের মিশ্রণ দেখা যায়—

"কাঞ্চনে গঢ়ল পয়োধর সুন্দর
নাগর জীবন আধার হে।
ছুঁইত রতন তুল ন রহ অধিক মূল
কিনহি ন পার গমার হে।।

আমরা বলতে পারি, বিদ্যাপতির কাব্য সাধনার ক্ষেত্রে দুটি ক্ষেত্রে দুটি স্তর পরম্পরায় ক্রমপরিণতির পথ ধরেছে। এর প্রথম স্তরে আছে ভঙ্গি-প্রাধান্য আর দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে প্রাণের আবেগ। সব মিলিয়ে বিদ্যাপতির কাব্যে আমরা যে আবেগ লক্ষ্য করি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাকে প্রকাশ করা যায়—

"আমার এই দেহখানি তুলে ধর
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ কর।"

বিদ্যাপতির রাধা তথা কাব্যলতাও লৌকিক স্তরে প্রোথিত হয়ে ধীরে ধীরে উন্মার্গগামী হয়েছে আধ্যাত্মিক স্তরে—

"সজনি কে কহ আওব মধাঈ।
বিরহপয়োধি পার কিএ পাওব
মঝু মনে নহি পতি আঈ।।"

প্রথম স্তরে বিদ্যাপতিতে যে ভঙ্গি-লীলার বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ, মিলন, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ইত্যাদি। এই পর্যায় গুলিতে কবির বক্তব্য একটি বিশেষ রীতিকেই রূপময় করে তুলেছে। নিত্য বৃন্দাবন রাধাকৃষ্ণের নিত্য প্রেমলীলাকে কবি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টির আলোকে নানা ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিরীক্ষণ করেছেন— সে দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক সুর, ভক্তির আবেশ অল্প, কিন্তু তাতে বেশি রয়েছে এক অনন্ত কৌতূহল, অলঙ্কার বিলাস, অসীম সৌন্দর্য আবেশে মগ্ন স্বপ্নিলতা, আছে কবি-কথনের অপরূপ কৌশল। তাঁর মননশীলতায়, বক্র কটাক্ষে, মার্জিত বাচন ভঙ্গিতে, আলঙ্কারিকতায়, অতি সচেতন রূপনির্মিতিতে, তাঁর সৌন্দর্য চেতনায়, ইন্দ্রিয় প্রধান দেহ ভাবনায়, উপলব্ধির ব্যাপক ঐশ্বর্যে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর রাধা রিক্ততার বক্ষ-ভেদ করে আপনার বেদনাকে উন্মোচন করেন না। তাঁর রাধা রসালসে আপনি মগ্ন হয়ে সাজেন— কবিও তাঁকে প্রাণভরে সাজান সযত্নে কুসুম রতনে চন্দনে কুঙ্কুমে কেয়ুরে কণ্ঠহারে। কবি-হৃদয়ের সপ্ততন্ত্রী রুদ্রবীণার ঝঙ্কারে এই রাধার শিঞ্জিনী শিহরিত—

"মাধব ভেটলি পসাহনি বেরী।
আদর হেরলক পুছিও ন পুছলক
চতুর সখী জন মেরী।।"

আবার শেষ পর্যায়ে কবির পদাবলিতে গোধূলির গৈরিক বসনের আভাস ছড়ানো। তাঁর রাধা 'জনম অবধি' রূপ সুধা পান করেও অনন্ত রূপের তৃষ্ণা মেটাতে পারেন না— বলতে পারেন না "সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া হইলুঁ তোমার দাসী" বটে, কিন্তু কবি স্বয়ং রাজসভার ঝড়লণ্ঠনের বাহারি আলোক-বিচ্ছুরণ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনেন— শেষ পর্যায়ে এসে জীবনের হিসাব মিলাতে গিয়ে কবি অনুভব করেছেন—

"যাবত জনম হম তুয়া পদ ন সেবলুঁ
যুবতী মতি সঞে মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পিয়লুঁ
সম্পদ বিপদহি ভেলি।।"

এই পর্যায়েও অসাধারণ বিদ্যাপতির কবিত্ব— একথা কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না। পার্থিব জগৎ থেকে মুখ সম্পূর্ণ ফেরাননি কবি, কিন্তু যৌবনের তীব্র উন্মাদনায় মায়াকাননে ঘুরে ঘুরে জীবনের শেষ পর্যায়ে সত্যের পথকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় মাধবের চিরবাঞ্ছিত পদে শরণ নিতে চেয়েছেন। বিদ্যুৎরেখায় বিদীর্ণ করে দেখাতে চেয়েছেন অনুতাপ-বিদ্ধ রক্তাক্ত হৃদয়কে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার খুলে খুলে শেষ পর্যন্ত তিনি গিয়ে পৌঁছেছেন হৃদয়ের মর্মমূলে। এই-ই স্বাভাবিক, এই-ই সত্য— জীবনে এই নির্লিপ্ত প্রশান্তির আশ্রয়ের প্রয়োজন আছে— এই আশ্রয়ের আশায় বিদ্যাপতি দীর্ঘ পথের শেষে গোধূলির আলোক-ছায়ায় মাধবের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ ঃ

(ক) বিদ্যাপতির কাব্যে একটি ক্রমপরিণতি আছে। প্রথম দিকে তাঁর কাব্যে রয়েছে চটুল চপলতা, আর শেষ দিকে সেই চাঞ্চল্য স্থির হয়ে ধীরে ধীরে কবিকে পৌঁছে দিয়েছে এক প্রশান্ত আলোকের সামনে।

(খ) ক্রমপরিণতি আছে বলেই বিদ্যাপতি অনেক বেশি সজীব ও স্বাভাবিক।

(গ) যে কোনো পর্যায়েই বিদ্যাপতির কাব্য অভিনব।

আত্ম সমীক্ষামূলক প্রশ্ন ঃ

(১) রচনার প্রথম পর্যায়ে বিদ্যাপতির বিলাসকলার চর্চার কারণ আপনি কাকে বলতে চান।

....

....

(২) ক্রম পরিণতির জন্য বিদ্যাপতি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন কি হিসেবে?

....

....

(৩) বিদ্যাপতির প্রথম পর্যায়ের রচনার বৈশিষ্ট্য হিসেবে বৈষ্ণব পদাবলি হতে বিদ্যাপতির পদের একটি উদাহরণ দিন।

....

....

১.২.৪.৩ বিদ্যাপতির রচিত বৈষ্ণব পদাবলির বিশ্লেষণ

কাব্য-দর্শন-অলঙ্কার-তত্ত্ব-ধর্ম আদির বিচিত্রও বিশেষ সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলি। শ্রীমদ্ভাগবতের কাব্য-সম্পদ ধনী করেছে বৈষ্ণব কাব্যকে, এর প্রামাণ্য গৃহীত হয়েছে দর্শনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তরূপে, এর সিদ্ধান্তে বিধৃত আছে তত্ত্ব নির্ণয়ের শেষ কথা। তত্ত্ব-দর্শন-কাব্যের ত্রিবেণীর জোয়ারে ভেসে এসে বৈষ্ণব কাব্য-পুষ্প পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়েছে ত্রিবেণী সঙ্গমে।

জয়দেবের 'মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলি' হল গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলির মূল উৎস।

"রাধামাধবোর্য়জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ"— ধর্মের দিক থেকে গীতগোবিন্দের মূল সুর এটি। সর্বত্রই এই বিচিত্র লীলার মহিমা গান। বৈষ্ণব পদাবলি প্রেমধর্মের ভাষ্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে প্রেমভক্তি বা 'উন্নতোজ্জ্বলরসা স্বভক্তিশ্রী' শ্রীচৈতন্যের অবদান।

বৈষ্ণব পদাবলির মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যে প্রেমলীলা ব্যক্ত, ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে তা অধ্যাত্মসাধনার প্রতিচ্ছবি। বৈষ্ণব মহাজনেরা ভাববৃন্দাবনে অপ্রাকৃত রাধা-কৃষ্ণলীলা মানস-নয়নে দর্শন করে ধন্য হতে চান। বৈষ্ণব পদাবলি এই অলৌকিক নিত্য প্রেমলীলার সঙ্গীত।

অনেকের মতে, ধর্মমূলক কবিতা কাব্য হয় না। ধর্ম-দর্শন-তত্ত্বের কঠিন বর্ম ভেদ করে তার কাব্যস্বরূপ প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পায় না।

তবে এই ধরনের আলোচনা বিদ্যাপতির কাব্যকলার ক্ষেত্রে খাটে না। সৌন্দর্যের কবি বিদ্যাপতি। তাঁর হৃদয়কে অবলম্বন করে সৌন্দর্যানুভূতি যে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে কাব্য রচনায় তারই প্রকাশ ঘটেছে। আগে তিনি পদচারণা করেছেন সৌন্দর্যলোকে— পরে দর্শনের সোপান বেয়ে তাঁর যাত্রা বৈষ্ণব ধর্মের জগতে।

তাই বিদ্যাপতির রচিত পদাবলির আলোচনায় কবির এই মানসিকতাকে স্মরণ রাখা অপরিহার্য।

বিদ্যাপতির কাব্যকৃতির যে দুই স্তর নিয়ে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, তার প্রথম স্তরে রাজসভাকবি, মণ্ডনকলা নিপুণ, সচেতন রূপনির্মাণ দক্ষ, সৌন্দর্য সচেতন, শিল্পী কবি বিদ্যাপতির পূর্ণ পরিচয়। এই স্তরে বিদ্যাপতি পদাবলির যে পর্যায় সমূহের উপর পদ রচনা করেছেন, তাতে তিনি রাধাধিরাজ।

এই স্তরে বিদ্যাপতি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারেন পদাবলি সাহিত্যে রাধার বয়ঃসন্ধি পর্যায়ে। শারীরিক-মানসিক পরিবর্তনের নিপুণ বর্ণনায়, মনস্তত্ত্বের গভীর অন্বেষণে বিদ্যাপতি এক্ষেত্রে শুধু মৌল উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেননি, এখানে তিনি অভিনব দক্ষতার ছাপ রেখে গেছেন।

মনোবিজ্ঞানে বয়ঃসন্ধি-লগ্ন হল মানব জীবনের এক স্পর্শকাতর কাল। কৈশোরও যৌবনের এই সম্মিলনকে কাব্যের বিষয়বস্তু করে বিদ্যাপতি অতুলনীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। রাধার বয়ঃসন্ধির পর্যায়ে দেহ ও মন— এই উভয় রাজ্যকেই স্পর্শ করেছেন বিদ্যাপতি তাঁর পদাবলিতে—

"খনে খন নয়ন কোন অনুসরই।
খনে খন বসন-ধূলি তনু ভরই।।

....

হৃদয়জ মুকলিত হেরি হেরি থোর।
খনে আঁচর দেই খনে হয় ভোর।।"

-রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা বলতে পারি—

"......সকলই রহস্য পরিপূর্ণ। সদ্য বিকচ হৃদয় সহসা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে, আপনার সম্বন্ধে আপনি সবেমাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে, তাই লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। ....."

(বিদ্যাপতির রাধিকা ঃ আধুনিক সাহিত্য)

বয়ঃসন্ধির এই অভিনব হাবে-লাস্যে-রূপে কবিদৃষ্টির বিস্ময় ও কৌতুক প্রকাশিত হয়ে কবিতা এনেছে স্বাদবৈচিত্র্য।

প্রেমের ক্ষেত্রে এই বয়ঃসন্ধির লগ্নই হল পূর্বরাগের মহালগ্ন। পূর্বরাগে প্রেমের সূত্রপাত। এই পর্যায়ের মহাজন যদিও বা চণ্ডীদাস, কিন্তু বিদ্যাপতিও এই পর্যায়ে যথেষ্ট বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। তাঁর রাধা 'যেমতি যোগিনী পারা' নন, বা 'তার বিনু আর কারো নই' বলে একাগ্রচিত্ত হতে পারেননি। বিদ্যাপতির রাধা চটুল, চপল, চঞ্চল। নিজের সদ্যপ্রস্ফুটিত যৌবনকে যেমন করে তিনি লুকোচুরি করে দেখতে চান, জানতে চান, ঠিক কৃষ্ণকেও তিনি তেমনি করেই আড়াল আবডাল থেকে দেখেন—

"তঁহি পুন মোতি হার তোড়ি ফেকল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনি লেল।।"

এই পূর্বরাগ পর্যায়ে বিদ্যাপতির রাধায় লীলাচাতুর্যের সঞ্চার হয়েছে, বয়সের নবীনতা ঘোচেনি। প্রথম তারুণ্যের লাবণ্যদীপ্তি, "কেবল একবার কৌতূহলে চম্পক-অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর" হওয়ার মধ্যে আপনাকে চমৎকার ভাবে প্রকাশ করেছে।

রাধার মানস-বিবর্তনে ও নবতর বৈদগ্ধ্যের স্তরে বিদ্যাপতির বক্র বাচনভঙ্গি ও চাতুর্য লক্ষণীয়।—

"আধ আঁচর খসি আধ বদনে হসি,
আধ হি নয়ান তরঙ্গ।"

নানা ভঙ্গিমায়, নৃত্যে, ছন্দে, এই নবতর প্রেমহিল্লোলের সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত। প্রথম প্রণয়ের অলক্তরাগে রাঙিয়ে-ওঠা হৃদয়ে একটু ব্যাকুলতা, একটু আশা-নিরাশার আন্দোলন আছে, কিন্তু যৌবনের উচ্ছ্বসিত পঞ্চম স্বরে বাঁধা পড়ে সে কেবল বর্ণবৈচিত্র্যের সমারোহ সৃষ্টি করেছে, —মর্মঘাতী বেদনায় উদাস বিধুর করে তোলেনি।

পূর্বরাগের পরেই যে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের বর্ণনা বিদ্যাপতি দিয়েছেন, সেখানেও রাধা ভীতি-বিহ্বলা, ব্রীড়া-কুণ্ঠিতা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"দূরে সহাস্য সতৃষ্ণ লীলাময়ী, নিকটে কম্পিত শঙ্কিত বিহ্বল।" কৃষ্ণকে দেখার ভঙ্গি যেমন তাঁর মধুর, দেখা দেবার ভঙ্গিও তেমনই মনোহারী—

"যব গোধূলি-সময় বেলি
তব মন্দির-বাহির ভেলি।
নজলধরে বিজুরী রেহা দ্বন্দ্ব বাঢ়াইয়া গেলি।"

নবযৌবনের তরঙ্গ-হিল্লোলে এই উৎসবময়ী কিশোরী গিরিবক্ষ বিহারিণী নির্ঝরিণীর মতো নৃত্য-চপলা, আবেগ-চঞ্চলা।

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের পদে কৃষ্ণের আহ্বানে দেহধর্ম সম্পর্কে অর্ধচেতন বালিকার আর্তনাদ রাধার বিহ্বলতায় প্রকাশিত—

"বচন চাতুরি হাম কছু নাহি জান।
ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান।।"

রাধার চিত্তের প্রগলভ নাগরীরূপ প্রকট হয়ে উঠেছে বিদ্যাপতির কাব্যে প্রথম স্তরে। দেহভাবনার সঙ্গে অতি তীক্ষ্ণ-তীব্র রূপচেতনা প্রকাশিত—

"তনুর পসেদে পসাহনি ভাসলি
পুলক হ তইসন জাগু।
চুণি চুণি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি
বাহুক বলআ ভাঁগু।।"

বিশ্বের সুন্দরতম বস্তুর প্রতি কবির চিরকালের আকর্ষণ। আর সেই সুন্দরকে তিল তিল করে ভাবে-ভাষায় চয়ন করে কবি গড়ে তুলেছেন তাঁর বাক্‌প্রতিমা। এ সৌন্দর্য কেবল বস্তুর অভিনবত্বে নয়, তার নিজস্ব স্বরূপ সৌন্দর্যে। রাধার রূপচিত্রণে বিদ্যাপতির পদাবলিতে কৃষ্ণের তীক্ষ্ণ রূপচেতনার সঙ্গে মিশে গেছে তীব্র সম্ভোগ-কামনা—

"বদন চাঁদ তোর নয়ন চকোর মোর
রূপ অমিঅরস পীবে।
অধর মাধুরী ফুল পিয়া মধুকর তুল
বিনু মধু কতখন জীবে।।"

এই নাগর বচন-চাতুর্যের পশ্চাতে রয়েছে তীব্র কামভাবনা। কিন্তু বিদ্যাপতি কবি, লৌকিক কামনা বাসনা-জাত বিশিষ্ট রূপরসই তিনি উপভোগ করতে চেয়েছেন। ভাষার প্রগলভতায়, চিত্রের বর্ণাঢ্যতায় সেই সাধনাই বিদ্যাপতির।

রাধার বয়ঃসন্ধি থেকে প্রেমবৈচিত্ত্য ইত্যাদি পর্যন্ত বিদ্যাপতির প্রথম স্তরের রচনায় ভঙ্গি-প্রাধান্য। এই স্তরে রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো দ্যুতিময় দীপ্তিময় রাধার প্রাণোচ্ছল ভঙ্গিমা। মনস্তত্ত্বের প্রতিটি পর্যায় এখানে অপূর্ব বর্ণনা কৌশলে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছে আমরা অনুভব করি যে, বিদ্যাপতির রাধা তিলে তিলে তিলোত্তমা হয়ে উঠেছেন। কোন্ কবি-মানস-গর্ভ হতে রাধার জন্ম— যে প্রসঙ্গান্তরের কথা, কিন্তু তাঁকে লালন করে যৌবন-স্বর্গে তুলেছেন জয়দেব-সহ বিদ্যাপতি। তাই বিদ্যাপতির রাধা প্রথমে একেবারেই লৌকিক। প্রেমবৈচিত্ত্য পর্যন্ত বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলায় মানবীয় প্রেমের প্রতিচ্ছবি, হৃদয়াপেক্ষা ইন্দ্রিয়ের প্রাধান্যই বেশি।

দ্বিতীয় স্তরে যে মুহূর্তে কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরায় গমন করলেন— রাধার তীব্র গতিবেগ রুদ্ধ হয়ে গেল; সমস্ত সঙ্গীত, চাপল্য, চঞ্চলতা পলকেই থেমে গেল।

বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে 'মাথুর' পর্যায়ে বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর রাধার আর্তি এক অপরূপ করুণ বেদনায় অঙ্কিত। বিদ্যাপতির বিরহের পদ কেবল প্রকাশ্য গৌরবানুভূতিতেই সমাপ্ত নয়, তার এক নিভৃততম রূপও আছে।

মাথুর পর্যায়ে কবি যে- বিরহিনী রাধার বেদনা ব্যক্ত করেছেন, তাতে প্রিয় বিরহে কাতর নারীর অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ ক্রন্দন উদ্বেল হয়ে উঠেছে—

"চীর চন্দন উরে হার ন দেলা।
সো অব গিরি নদী আতর ভেলা।।"

কৃষ্ণের মথুরা গমনের পর রাধার এই বিরহ, আক্ষেপ ও আর্তির গভীর বিস্তার হৃদয়স্পর্শী।

তবে, একটি কথা স্মরণীয় যে, বিদ্যাপতি রাধার বেদনাকে অনুভব করেছেন, অতি গভীর ভাবেই হৃদয়গত করেছেন; কিন্তু সে বেদনা রাধারই, বিদ্যাপতির নয়—

"পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা।
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরয ধর চিতে, মিলব মুরারি।।"

মাথুরের পদগুলিতে বিদ্যাপতি যেন এক নতুন লোকের সন্ধান দিয়েছেন। বিরহ খণ্ডে ও বিরহান্তিক মিলন বর্ণনায় আমরা বিদ্যাপতির যে রাধাকে দেখি, তিনি সম্পূর্ণ নতুন—

"শুন ভেল মন্দির শুন ভেল নগরী।
শুন ভেল দশদিশি শুন ভেল সগরী।"

বিরহিণীর আকুল ক্রন্দন এই শূন্যতাকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। অলঙ্কারের ঝঙ্কার এখানে নীরব। হৃদয়ের একটি আকুলতাই সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে। আবার বিরহান্তক মিলনের পদ বা ভাব সম্মিলনের পদেও আছে হৃদয়াবেগ—

"আজু রজনী হম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।

জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা।।"

জীবন যৌবনের সফলতার আনন্দে উল্লসিত বিদ্যাপতির রাধা হৃদয়াবেগকে বাধা দিতে না পেরে বলেছেন—

"আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই।।"

এক দিব্যানন্দ লাভের ব্যঞ্জনায় রাধার হৃদয় ধ্বনিত হয়েছে এখানে।

বিদ্যাপতির কাব্যে আলোর উল্লাস আছে, সেই সঙ্গে কাব্যে আলো এবং ছায়ার মাখামাখি এক অসীম রহস্যের ধূসরতা পরিব্যাপ্ত। আজীবন তিনি শিল্পরীতির চর্চা করেছেন। তাঁর কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের লীলার মধ্য দিয়ে চিরন্তন মানব জীবনেরই লীলা আমরা প্রত্যক্ষ করি। মানব জীবনের অনন্ত রহস্য, অন্তহীন ট্র্যাজেডি, এবং আনন্দ রূপ ধরে তাঁর কাব্যকে শিল্প-সাধনার সার্থক স্তরে পৌঁছে দিয়েছে।

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।।
জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
....
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল।।"

এই সকল পাওয়ার মাঝে যে মনের বেদনা বাজে না-পাওয়ার অতৃপ্তিতে—এটাই মানব জীবনের চিরন্তন রহস্য, যা রাধার বাণীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

এই কবিতাটি উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথে বলেছেন—

"বিদ্যাপতি একটি শেষ কথা বলিয়া রাখিয়াছেন। তাহাকে শেষ কথা বলা যাইতে পারে অশেষ কথাও বলা যাইতে পারে; এত লীলা খেলা নব নব রসোল্লাসের পরিণাম কথা এই......। নবীন প্রেম একেবারে লক্ষ লক্ষ যুগের পুরাতন হইয়া গেল। ইহার পরে ছন্দ এবং রাগিণী পরিবর্তন করা আবশ্যক।"

এই ছন্দ এবং রাগিণী পরিবর্ত্তিত হয়ে পরিণত হয়েছে "প্রার্থনা" বিষয়ক পদে কবির অন্তরাত্মার হাহাকারে। এই পর্যায়ে মানসভোগের অতৃপ্তি এবং সম্ভবত বস্তুভোগের নৈরাশ্য তাঁকে এক উর্ধ্বতর অনুভূতির জগতে তুলে দিয়েছে। ড° বিমানবিহারী মজুমদার 'বিদ্যাপতি' গ্রন্থে 'কবিচিত্তের ক্রমবিকাশ' অধ্যায়ে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, তাঁর পদগুলি কালানুক্রমিকভাবে সাজালে রাজসভাশ্রিত কবির প্রথম যৌবনের উল্লাসময় জীবন-ভাবনার সঙ্গে শেষ জীবনের পদের গভীর ও গম্ভীর প্রেমভাবনার মধ্যে যেমন পার্থক্য ধরা পড়ে, তেমনি প্রথম জীবনের তরল অসংযত রচনারীতির সঙ্গে পরিণত বয়সের সংযত সুন্দর পদরীতির পার্থক্যও সুস্পষ্ট।

মিলন বা সম্ভোগের পদে বিদ্যাপতি যেমন সুখের, ভোগের কবি, বিরহের পদে তেমনি তিনি দুঃখের ও ভোগবৈরাগ্যের কবি। আসল কথা তিনি ভোগী কবি, কিন্তু ভোগবদ্ধ কবি নন। ভোগজনিত জীবনরস উপলব্ধির একটি বিস্তৃতি আছে। তাই যে-বিদ্যাপতি সৃষ্টির প্রথম স্তরে শব্দ ও অর্থের বিদ্যুৎ-চমকে আমাদের চোখ ঝলসে দিয়েছেন, শেষস্তরে তিনিই আমাদের ভাবের গভীরে এক অরূপ রতনের সন্ধান দিয়েছেন।

প্রথম পর্যায়ে যে-রাধাকে বিদ্যাপতি রূপদান করেছেন, সে রাধা ভক্ত-প্রাণের আকৃতি-জাত নয়, আত্মপ্রাণের সৌন্দর্য-পিপাসা চরিতার্থতার জন্যই তিনি এই অসীম সৌন্দর্যময়ী রহস্যময়ী তিলোত্তমা-মূর্তি গড়েছেন। আর এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে বৈজ্ঞানিকের মতো মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ। তাই প্রথমাংশে বিদ্যাপতির বিমুগ্ধ প্রাণের সেই উচ্ছ্বসিত কামনা আমাদের উন্নাসিক করে তোলে না, বরং বিস্ময়ে মুগ্ধতায় বিভোর করে। রাজসভার ঐশ্বর্যলালিত কবি তিনি, বিনয়ী বৈরাগ্যলালিত ভক্ত নন; আত্ম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত নয় বলে নানা পরিবেশে রাধার মধ্য দিয়ে বালিকা কিশোরী যুবতীর নব নব বিকাশ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন— স্বরূপ-বিভোর হননি। তাই তাঁর কাব্যে চিত্রধর্ম, নাটকীয়তা, অলঙ্কার, বিলাস-বৈদগ্ধ্যের ছড়াছড়ি।

কিন্তু বিদ্যাপতির কাব্য সাধনার এক গভীরতর এবং শ্রেষ্ঠতর দিক আছে। উল্লাস-উচ্ছৃংলতার দিবালোকের উপর তাই সজলঘন রসের ধারা নেমে এসেছে তাঁর কাব্য সাধনার দ্বিতীয় স্তরে।

প্রদীপ জ্বালাবার আগে যেমন সলতে পাকানোর প্রস্তুতি আছে, তেমনি বিদ্যাপতির কাব্য রচনার দ্বিতীয় স্তরের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে রাধার অভিসার পর্যায় থেকে। মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠত্ব যেখানে,—সাধন-দহনের নির্মল আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে— সেখানেই মানুষ ইন্দ্রিয়-বাঁধন অতিক্রম করে যায়। জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্য মিলনে নয়— বিরহে লগ্ন, তা মানুষের অধ্যাত্ম চেতনাকেই পরিতৃপ্ত করে। বৈষ্ণব পদাবলি এই বিরহকেই শ্রেষ্ঠ রক্তপদ্ম অর্ঘ্য-উপহারে সাজিয়ে তুলেছে রাধার বেদন-দহনে।

যদিও মাথুর বা বিরহ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি, কিন্তু তাঁর রাধার গভীর বেদনা অন্তরের অতলে তলিয়ে যাবার নয়, হৃদয়ের পাত্র উছলে চারপাশের জগত সংসারকে প্লাবিত করার মত বিপুল। বেদনারও একটা ঐশ্বর্যের দিক আছে, সেখানে বিশ্ব প্রকৃতির বিরাট পটভূমির সঙ্গে তার সংযোগ। —

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খরশর হন্তিয়া।।"

প্রকৃতির শব্দচিত্রের সঙ্গে রাধার বিরহের আর্তিকে বুনে বুনে এগিয়েছেন কবি অসূচিভেদ্য নিপুণতায়। কোন তত্ত্বচিন্তা নয়, এ আবেগ-আর্তি প্রত্যক্ষ, সরল এবং অকৃত্রিম। এরমধ্যে চাতুর্য নয়, মাধুর্য নয়, আছে অতিরিক্ত একটি ঐশ্বর্যবোধ।

মিলনের মদির মুহূর্তে যখন বলা হয়—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।

....

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল।।"

চিরন্তন পুরুষের এই অনাদি রূপ-রহস্য— চিরন্তন নারীর চির প্রাণ-বিস্ময় এই— আর এখানেই কাব্যের ব্যঞ্জনা। বিদ্যাপতি এই ব্যঞ্জনার শ্রেষ্ঠ কবি। ভাবের বাণী নির্মাণ এবং ভাবের মধ্যে ভাবাতীতকে স্পর্শ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বিদ্যাপতির।

ভাব সম্মিলন ও ভাবোল্লাসের পদে বিদ্যাপতি প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। জীবন থেকে তিনি সুখকে বিসর্জন দেননি। দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখই নয়— তা আনন্দরূপামৃতং। বিদ্যাপতির ভাবোল্লাসের পদে আছে তার প্রমাণ। —

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল।।"

এই আনন্দোল্লাস সেই কবিরই, যিনি রসস্বরূপকে পেয়েছেন আপন চেতনায়।

কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক বন্দনারীতির বশবর্তী না হয়ে বিদ্যাপতি মাধবরূপী সেই সত্যস্বরূপের কাছে যে ভাবে আত্মোদ্‌ঘাটন করেছেন, বৈষ্ণব পদসাহিত্যে তা অভিনব। এ যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"সন্ধ্যা বেলায় নয়ন ভরিয়া এনেছি অশ্রুবারি।"

বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদে অভিনব কবি-ভাবনা প্রকাশিত—

"আধ জনম হাম নিদেঁ গমায়লুঁ
জরা সিসু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রভসরঙ্গে মাতলুঁ
তোহে ভজব কোন বেলা।।

....

ভণই বিদ্যাপতি শেষ সমন-ভয়
তুঅ বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহাওসি
তারণ ভার তোহারা।।"

—যে গভীর আন্তরিকতা ও সুতীব্র আকূতির সুর এতে ধ্বনিত হয়েছে তা কবির আপন হৃদয়েরই আকুলতা। কারণ, এই আকুল আক্ষেপ ও আত্মগ্লানি, এই পার্থিব নৈরাশ্য— বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ছাড়া উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব। রাজসভার কবি তিনি। রাজ্য ও রাজার উত্থান-পতনের সঙ্গে জড়িত তাঁর ভাগ্য। রাজনীতির বৃহত্তর ঘূর্ণিপাকে কবিজীবন বারবার আন্দোলিত হয়েছে। সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে রাজসভার অভিজ্ঞতা, সভাকবির কাব্যোপজীবী সম্পদ। রাজসভার ঐশ্বর্য, সম্পদ, সন্দেহ-ঈর্ষা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা,

বিলাস-ব্যসন, কামিনী-কাঞ্চন, নাগরিক আচার-আচরণ, মার্জিত আদব-কায়দা, স্তুতি-নিন্দা— সব মিশিয়ে রাজসভার কবি এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবন দৃষ্টির অধিকারী— ব্যাপক অর্থে এই হল কবির রাজসভার অভিজ্ঞতা। বিদ্যাপতিও এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র নন। তাছাড়া, তিনি সাত্ত্বিক ভক্ত প্রেমিক নন, তিনি রাজসিক। ভোগজনিত জীবন রস উপলব্ধির একটা বিস্তৃতি আছে। যে ভোগ করেনি, ত্যাগের মূল্য উপলব্ধি করে ভোগের অসারতা সে কখনই উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা স্বয়ং বিদ্যাপতির জীবনেই এসেছে, আর তাই তিনি সহজেই ক্রমোপলব্ধির পথে আরোহণ করেছেন। তাঁর জ্ঞান, তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাই তাঁকে পরবর্তী পর্যায়ে আত্মসমর্পণের আবেগে বিগলিত করেছে। নাগরিক কবি হয়েও এখানে তিনি তাই স্বাভাবিক, কৃত্রিম নন।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ :

(ক) শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণব পদাবলির মূল আধার।

(খ) গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলির মূল উৎস হল জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ।

(গ) বৈষ্ণব পদাবলি তত্ত্ব-দর্শন-কাব্যের সমন্বয়।

(ঘ) গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে প্রেম ভক্তি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অবদান।

(ঙ) বৈষ্ণব পদাবলি প্রেমধর্মের ভাষ্য।

(চ) বৈষ্ণব সাধকেরা বৈষ্ণব পদাবলির রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় অধ্যাত্ম সাধনার প্রতিচ্ছবি দেখেছেন। এ লীলা নিত্য বৃন্দাবনের নিত্যলীলা।

(ছ) বিদ্যাপতির কাব্যকলা বিশেষ কোনো কাঠামো বা বিশেষ ভাবধারার মুখাপেক্ষী নয়।

(জ) বিদ্যাপতি সৌন্দর্যের কবি। এই সৌন্দর্যের ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি রাধাকৃষ্ণ ও তাঁদের লীলাকে অবলম্বন করেছেন।

(ঝ) বিদ্যাপতির কাব্যকৃতির দুটি স্তর। প্রথম স্তরে রাজসভাকবি বিদ্যাপতির মণ্ডন কলার নৈপুণ্য, রূপ নির্মাণে দক্ষতা, সৌন্দর্য সচেতনতা প্রকাশিত। এই স্তরে তিনি ভোগৈশ্বর্য, আড়ম্বর প্রিয়। এই স্তরে ইন্দ্রিয়জ রূপচেতনা, সম্ভোগ কামনার প্রাধান্য।

(ঞ) দ্বিতীয় স্তরে বিদ্যাপতি অরূপ-সন্ধানী। প্রগল্‌ভতা, নাগরী-বৈদগ্ধ্য, অলঙ্কারের ঝঙ্কার ধীরে ধীরে মৃদু হয়ে এসেছে। পরিবর্তে দেখা দিয়েছে হৃদয়ের আকুলতা।

(ট) বিদ্যাপতির লেখার প্রথম স্তরে রাধার বয়ঃসন্ধি থেকে মাথুর পর্যায়ের পূর্ব পর্যন্ত অবস্থা এবং দ্বিতীয় স্তরের নিদর্শন মাথুর ও প্রার্থনা বিষয়ক পদে।

(ঠ) বিদ্যাপতি রাধার বিরহকে অনুভব করেছেন, কিন্তু সে বেদনার সঙ্গে তিনি একাত্ম নন। সে বেদনা রাধারই, বিদ্যাপতির নয়।

(ড) বিদ্যাপতির কাব্যে রাধা কৃষ্ণের লীলার মধ্য দিয়ে চিরন্তন মানব-লীলার বাণী ধ্বনিত।

(ঢ) বিদ্যাপতি ভোগের কবি, কিন্তু ভোগবদ্ধ কবি নন।

(ণ) বিদ্যাপতি রচিত পদাবলি ভক্তপ্রাণের আকুতি জাত নয়, তা কেবল আত্মপ্রাণের সৌন্দর্য পিপাসা চরিতার্থতার পন্থা। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জ্ঞানী পুরুষের বিজ্ঞান-মনস্ক কৌতূহল।

(ত) বিদ্যাপতি বসন্তের কবি, মিলনের কবি।

(থ) প্রার্থনা শীর্ষক পদে বিদ্যাপতি আপন অন্তরের প্রার্থনা নিবেদন করেছেন। কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িকতার বশবর্তী না হয়ে মাধবরূপী সেই সত্যের কাছে কবি যে ভাবে আত্মোদ্ঘাটন করেছেন পদাবলি সাহিত্যে তা অভিনব সংযোজন।

(দ) শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি, মাথুর, ভাবোল্লাস, প্রার্থনা— বৈষ্ণব পদাবলির এই পর্যায় গুলিতে বিদ্যাপতি অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ।

আত্ম সমীক্ষামূলক প্রশ্ন :

(১) রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির রাধার বয়ঃসন্ধি লগ্নে কোন্ ভাবের কথা বলেছেন?

....

....

(২) বিদ্যাপতির কাব্য সাধনার দুটি স্তর কী কী?

....

....

(৩) কোন্ পর্যায়ের পদে (পদাবলির) বিদ্যাপতি শ্রেষ্ঠ?

....

....

(৪) বিদ্যাপতি পদাবলিতে কোন্ কোন্ বিষয়ে পদ রচনা করেছেন?

....

....

(৫) বিদ্যাপতির পদ কী কারণে গতানুগতিক নয়?

....

....

(৬) বিদ্যাপতি কি শুধুই ভোগের কবি? —আলোচনা করুন।

....

....

১.৩ চণ্ডীদাস : কবি পরিচিতি

চৈতন্য-পূর্ব যুগে বিদ্যাপতির সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ পদাবলি রচয়িতা কবি চণ্ডীদাস। বাংলা ভাষায় প্রথম তিনিই বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করেন। তাঁকে সাধারণতঃ পদকর্তা চণ্ডীদাস বলা হয়। চণ্ডীদাসকে নিয়ে বাংলার বিদ্বন্মহলে জটিল সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, খুব সহজে এ সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়। তবে, চণ্ডীদাস নামধারী অন্ততঃ চারজন কবির উপস্থিতি অনুভব করে পণ্ডিত সমাজ নানা তথ্য এবং উপাদানকে আশ্রয় করে চণ্ডীদাস সমস্যার সমাধানে ব্রতী হয়েছেন। এ-সম্পর্কে পর্যায়ে আমরা পৃথকভাবে আলোচনা করব।

চণ্ডীদাসের একান্ত ব্যক্তি পরিচয় তেমনভাবে জানা যায় না। জনশ্রুতি অনুযায়ী বলা যায়, তিনি বীরভূম জেলার নানুর বা নান্নুর গ্রামে বাস করতেন। জাতিতে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রথমে তিনি বাসুলী বা চণ্ডীর সেবক ও উপাসক হলেও পরে সহজ

মার্গের সাধনায় ব্রতী হন। তিনি রামী নামক এক রজক কন্যাকে সাধনসঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর কোনো পদে রজকিনী রামীর কথা উল্লিখিত রয়েছে। যেমন—

"রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
কামগন্ধ নাহি তায়।"

কথিত আছে যে, চণ্ডীদাসের সংগীত শ্রবণে গৌড়দেশের বেগম তাঁর গুণের অনুরাগিণী হন এবং সে কথা নবাবের কাছে বেগম নির্ভীকভাবে স্বীকার করলে চণ্ডীদাস গৌড়ের নবাবের ক্রোধে পতিত হয়ে হস্তিপদতলে দলিত পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারান। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, ঐ একই ঘটনায় "নবাবের আদেশে চণ্ডীদাস হস্তিপৃষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া দারুণ কশাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন।" চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্পর্কে অন্য একটি কিম্বদন্তী আছে যে, তিনি কীর্তন করার সময় নাট্যশালা চাপা পড়ে প্রাণত্যাগ করেন এবং ঐ নাট্যশালা নবাবের কামানের গোলায় ধ্বংস হয়েছিল। এর বেশি চণ্ডীদাসের জীবন বৃত্তান্ত আর জানা যায় না। তাঁর সম্পর্কে যত কাহিনি প্রচলিত রয়েছে সবকিছুর কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে রামী-চণ্ডীদাসের প্রেমকাহিনি। এ ছাড়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এই বিখ্যাত পদকর্তার কবি-ব্যক্তিত্ব সংশয়াচ্ছন্ন। অথচ পদাবলি সাহিত্যে চণ্ডীদাস চিরকাল বাঙালির প্রিয়তম কবি। এ সম্পর্কে বিখ্যাত সমালোচক শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বসু বলেছেন— "আমাদের সমগ্র জাতি চৈতন্যের মূলে তাঁহার আসন। তাঁহার স্পষ্ট ব্যক্তি পরিচয়কে মুছিবার পিছনে বোধহয় কালের চক্রান্ত ছিল; স্পষ্টতর কঠিন মূর্তি ঘুচিয়া একটা ভাবতনু গড়িয়া উঠুক, ভাবুকের যে আরাধ্য দেবতা। কিন্তু কাল জব্দ ঐতিহাসিকের কাছে। গবেষণার পর গবেষণায় চণ্ডীদাসের রঙ্ ও রাঙ্ দুই-ই ঘুচিয়াছে— কাঠামোয় নাড়া দিতে গিয়া দেখা গেল জরাসন্ধের মতো জোড়া মূর্তি— বেশ কয়েকজোড়।" —চণ্ডীদাস সম্পর্কে এই সংশয় নিয়ে আমরা পরবর্তী কালে আলোচনা করব। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল চণ্ডীদাসের কবি-আত্মা ও কাব্য শিল্প নিয়ে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ ঃ

(ক) মধ্যযুগে চৈতন্য-পূর্ব কালের বিদ্যাপতির সমসাময়িক অপর একজন শ্রেষ্ঠ পদাবলি রচয়িতা চণ্ডীদাস।

(খ) বাংলা ভাষায় প্রথম বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করেন চণ্ডীদাস।

(গ) চণ্ডীদাসের বৈচিত্র্যপূর্ণ পদাবলি লক্ষ্য করে বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাসকে কেন্দ্র করে এক জটিলতর সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্যার কেন্দ্র হল চণ্ডীদাস প্রকৃতপক্ষে একজন না একাধিক এবং চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ববর্তী না পরবর্তী কবি।

(ঘ) চণ্ডীদাসের ব্যক্তি পরিচয় সংশয়াচ্ছন্ন।

(ঙ) জনশ্রুতি আছে যে, চণ্ডীদাস নানুর গ্রামের অধিবাসী এবং সেই গ্রামের বাশুলি দেবীর উপাসক; জাতিতে তিনি ব্রাহ্মণ হয়েও রামী নামক রজকিনী কন্যাকে তাঁর সহজিয়া সাধনার সাধন-সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করেন।

(চ) চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্পর্কেও বিভিন্ন কিম্বদন্তী প্রচলিত রয়েছে।

(ছ) চণ্ডীদাস ও রামীর প্রেম-কাহিনি ঘিরে অনেক কাহিনি প্রচলিত রয়েছে।

আত্ম সমীক্ষামূলক প্রশ্ন ঃ

(১) চণ্ডীদাসের সমসাময়িক অপর একজন বিখ্যাত পদকর্তার নাম লিখুন।

....

....

(২) প্রথম বাংলায় রচিত পদাবলির রচয়িতা কে?

....

....

(৩) চণ্ডীদাসের সাধন সঙ্গিনী কে ছিলেন এবং তিনি কোন জাতের ছিলেন?

....

....

(৪) প্রথমে চণ্ডীদাস কার উপাসক ছিলেন?

....

....

(৫) চণ্ডীদাসের মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল?

....

....

১.৩.১ চণ্ডীদাসের পদাবলির সমস্যা

চণ্ডীদাসের ব্যক্তি পরিচয় যেহেতু কুহেলিকাচ্ছন্ন, তাই তাঁকে কেন্দ্র করে এক জটিল ঐতিহাসিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসে পণ্ডিত মহল যে মতামতগুলো তুলে ধরেছেন, তার সবটাই মোটামুটি অনুমানের উপর ভিত্তি করে ব্যক্ত হয়েছে। হয়তো এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারত স্বয়ং চণ্ডীদাসের কবিতা। কিন্তু সে পথও রুদ্ধ। কারণ প্রাচীন বা অর্বাচীন কোনো সঙ্কলন গ্রন্থ থেকে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত কবিতার সাহায্যে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভবপর হয়নি। তার কারণগুলি হল—

প্রথমত, সম্ভবত বড়ু চণ্ডীদাস ও পদকর্তা চণ্ডীদাস একজন ব্যক্তি নন।

দ্বিতীয়ত, পদকর্তা চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ব অথবা পরবর্তী যাই-ই হন-কেন, তিনি চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মান্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন না।

তৃতীয়ত, সম্ভবত চণ্ডীদাস সহজিয়া ছিলেন। অবশ্য তাঁর লেখা নয়, এমন ক্ষুদ্রপ্রাণ বহু সহজিয়া কবির কবিতা তাঁর নামে প্রচলিত হয়েছে।

চতুর্থত, খ্যাতনামা কবি চণ্ডীদাস— বাঙালির প্রেমভক্তির কেন্দ্রীয় সুরটিকে তিনি স্পর্শ করেছেন। তাই পরবর্তী ক্ষুদ্র ও মাঝারি কবিদের এই নামটি গ্রহণ করে তাঁর পূর্বখ্যাতি আত্মসাতের চেষ্টা থাকা অসম্ভব বলে মনে হয় না।

ফলে, চণ্ডীদাস যা লেখেননি, বা কল্পনা করেননি, এমন বহু কবিতায় তাঁর নামাঙ্কিত পদাবলির ধন ভাণ্ডারটি পূর্ণ হয়ে আছে। তাই পরবর্তীকালে তাঁর কবিতা রসপর্যায়ে ভাগ করতে গিয়ে কীর্তনীয়া ও সঙ্কলকগণ বিষম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে বলতে গেলে কিন্তু জনপ্রিয় কবি চণ্ডীদাসকে সঙ্কলক ও কীর্তনীয়াগণ বহুকাল পর্যন্ত গ্রহণ করতেই পারেননি।

আসল কথা চণ্ডীদাসের উজ্জ্বল অবস্থান বাঙালির প্রেমাবেগে আকুল হৃদয়ের কনকমন্দিরে, কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে তাঁর আবির্ভাব সর্বজনস্বীকৃত হলেও তাঁর প্রকৃত অবস্থিতি সংশয়াকুল।

এদিক থেকে ভাবতে গেলে বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মধ্যযুগের এই অদ্বিতীয় প্রেমসাধনার বাণীবাহকের প্রকৃত কবিস্বরূপকে উদ্ঘাটন করতে না পেরে। তাই— "আকাশ-ভরা তারার মাঝে আমার তারা কই? ওই কি হবে ওই"— বলে তার অনন্তকালের অন্বেষণ অব্যাহত রয়েছে।

আর একদিক থেকে দেখতে গেলে চণ্ডীদাসই বাংলা সাহিত্যকে বৈচিত্র্যময় সমৃদ্ধি এনে দিয়েছেন। চিরকালই আমরা দেখেছি কত প্রতিভার আশার মুকুল অকালেই বিনষ্ট হয়ে যায়; অখ্যাতি-অবহেলার মন্দ বাতাসে হারিয়ে যায় তাদের নিদ্রাবিহীন রাত্রিদিনের নিরলস প্রচেষ্টার পাণ্ডুলিপি। চণ্ডীদাস স্বয়ং কাণ্ডারী হয়ে তাঁর সমসাময়িক এইরূপ কিছু অখ্যাত কবির বিখ্যাত কবিতাকে কালের সোনার তরীতে তুলে দিতে পেরেছেন।

কিন্তু বিপদে পড়েছেন কীর্তনীয়া ও সঙ্কলকগণ। চণ্ডীদাসকে কোথায় কীভাবে বিন্যাস করা হবে এটাই হল মূল সমস্যা। বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এ অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। পদকর্তা চণ্ডীদাসকে অনেকেই চৈতন্য-পূর্ব বা চৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে অসম্পৃক্ত কবি বলে মনে করেন। চণ্ডীদাসের কবিতাগুলি রসপর্যায়ে বিন্যস্ত করতে গিয়ে তাই ভাববিপর্যয়ে পড়তে হয়। যদি কবি সহজিয়া মতাবলম্বী হন তবুও তাঁর অবদান প্রেমানুভূতির অতি নিগূঢ় অন্তর্মুখিতার দিকে। এই প্রেমের সহজ সরল প্রাণময় মূর্তি কেবল অনুভববেদ্য, বুদ্ধিগম্য নয়। বাইরের বস্তুরূপে নয়, অন্তরের একাকিত্বে এই প্রেম বহমান। চণ্ডীদাস মূলত কবি-প্রাণের অধিকারী ছিলেন বলেই সহজিয়া তত্ত্ব বিবৃতিকে প্রকাশ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। সেই সাধন তত্ত্বের মাধ্যমে আপন কবিপ্রাণে এক সুগভীর প্রেম-দৃষ্টি আয়ত্ত করার প্রেরণা লাভ করেছেন।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ ঃ

(ক) চণ্ডীদাসের ব্যক্তি পরিচয়ের সমস্যা চণ্ডীদাসের পদাবলিরও সমস্যা।

(খ) অনুমান করা হয় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস এবং পদাবলির চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি নন।

(গ) চণ্ডীদাসের চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মান্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না।

(ঘ) বহু অখ্যাত সহজিয়া কবির রচনা চণ্ডীদাসের রচিত বলে প্রচলিত আছে।

(ঙ) চণ্ডীদাসের কবিতা রসপর্যায়ে ভাগ করতে গিয়ে পরবর্তীকালের কীর্তনীয়া ও সঙ্কলকেরা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।

(চ) চণ্ডীদাসের পদাবলির এই সমস্যার জন্য বহুকাল পর্যন্ত চণ্ডীদাসকে গ্রহণ করা যায়নি।

(ছ) চণ্ডীদাসকে কোথায় কীভাবে বিন্যাস করা যায়, মূল সমস্যা ছিল এটিই। কারণ, রসপর্যায়ে বিন্যস্ত করতে গিয়ে তাঁর পদাবলি নিয়ে ভাব বিপর্যয়ে পড়তে হয়।

(ঙ) চণ্ডীদাস মূলত কবিপ্রাণের অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি সহজিয়া মতাবলম্বী হলেও সহজিয়া তত্ত্ব বিবৃতিকে প্রকাশ করেননি।

(ঝ) সহজিয়া সাধন তত্ত্বের মাধ্যমে কবি এক সুগভীর প্রেমদৃষ্টি লাভ করেছেন। তাঁর কাব্যে তাই প্রেমই হল মূল সুর। প্রেমের গভীর অন্তর্মুখী ভাবনাকে কবি কাব্যে রূপদান করেছেন।

আত্ম সমীক্ষামূলক প্রশ্ন :

(১) কবি চণ্ডীদাস কোন্ মতাবলম্বী ছিলেন?

....

....

(২) চণ্ডীদাসের কাব্য নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে কেন?

....

....

১.৩.২ কবি চণ্ডীদাসের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প

রহস্যের আলো-আঁধার হতে কবি চণ্ডীদাসের জীবন-বৃত্তান্ত আজও পরিপূর্ণভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এবং আজও এক ঐতিহাসিক সাহিত্য-গোষ্ঠী এই ব্যাপারে নিরলস প্রয়াসের সাধনায় ব্রতী হয়ে রয়েছেন। কিন্তু মুগ্ধ পাঠক কিংবা সমালোচকের অন্তরাত্মা কবি চণ্ডীদাসের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্পের যথাযথ মর্মোদ্ঘাটনে সক্ষম হয়েছেন। বোধহয় কবি চণ্ডীদাসের কাব্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক যথাক্রমে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শঙ্করীপ্রসাদ বসু। এই তিন রসিক চিত্তের অন্তরতম বাণীর অংশবিশেষকে উদ্ধার করে আমরা চণ্ডীদাসের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্পের আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের আলোচনা—

"তিনি বাশুলী মন্দিরে, সুবর্ণমণ্ডিত স্তম্ভের অন্তরালে প্রাতঃসূর্যের আলোকে এক সোনার পুতুলীকে দেখিয়াছিলেন, সেই শুভ দৃষ্টিতে তাঁহার সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল;" "চণ্ডীদাস হৃদয়ের যে মর্ম্ম কথাটি কহিয়াছেন, প্রেমকে যে উচ্চ স্থানে দাঁড় করাইয়াছিলেন, উপমা ও উৎপ্রেক্ষা রাজ্যের গণ্ডী ছাড়িয়া প্রেমের যে স্বরূপ আবিষ্কার করিয়াছেন— বঙ্গীয় গীতি কবিতায় সেরূপ আর কেহ করিতে পারেন নাই।" "চণ্ডীদাসের অনেক পদে যে সর্বোচ্চ প্রেমের ইঙ্গিত আছে, তাহাতে পার্থিব প্রেম অপার্থিবের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, ...তিনি প্রেম সম্বন্ধে একটি সার কথা বলিয়াছেন— 'চণ্ডীদাস কহে, শুনি বিনোদিনী, পীরিতি না কহে কথা। পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পীরিতি মিলয়ে তথা।" "যখন জাতীয় কোন বহু কৃচ্ছ্রপূর্ণ তপস্যার ফলে ভাবরাজ্যের রাজা অবতীর্ণ হইলেন, তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার আগমনী চারিদিক হইতে ধ্বনিত হয়।.....চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই জয়দেব মেঘদর্শনে রাধিকার আনন্দ ও কৃষ্ণভ্রম বর্ণনা করিয়াছিলেন, মাধবেন্দ্রপুরী মেঘদর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের মধ্যে মহাপ্রভুর লীলার আভাস সর্ব্বাপেক্ষা বেশি পাওয়া যায়— ইহা তাঁহার আগমনী গান;"

চণ্ডীদাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আমাদের চণ্ডীদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি যে সকল কবিতা লেখেন নাই তাহারই জন্য কবি। তিনি এক ছত্র লেখেন ও দশ ছত্র পাঠকদের দিয়া লিখাইয়া লন।" "চণ্ডীদাসের কথা এই যে, প্রেমে দুঃখ আছে বলিয়া প্রেম ত্যাগ করিবার নহে। প্রেমের যা কিছু সমস্ত দুঃখের যন্ত্রে নিংড়াইয়া বাহির করিতে হয়।" "দুঃখের পাষাণে ঘর্ষণ করিয়া প্রেমের সৌরভ বাহির করিতে হয়। যতই ঘর্ষিত হইবে, ততই সৌরভ বাহির হইবে। চণ্ডীদাস কহেন প্রেম কঠোর সাধনা। কঠোর দুঃখের তপস্যায় প্রেমের স্বর্গীয় ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।" "পরকে আপন করিতে হইলে যে সাধনা করিতে হয়, যে তপস্যা করিতে হয়, সে কি সাধারণ তপস্যা?" ".....চণ্ডীদাস জগতের চেয়ে প্রেমকে অধিক দেখেন..... হৃদয়ের তুলাদণ্ডে মাপিয়া দেখিলেন, প্রাণের অপেক্ষা প্রেম অধিক হইল। .....এত বড়ো প্রেমের ভাব চণ্ডীদাস ব্যতীত আর কোন প্রাচীন কবির কবিতায় পাওয়া যায়? ....চণ্ডীদাসের নূতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ব আছে, আবেগের গভীরতা আছে। যে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি একেবারে মগ্ন হইয়া লিখিয়াছেন। .....চণ্ডীদাসের প্রেম কি বিশুদ্ধ প্রেম ছিল। তিনি প্রেম ও উপভোগ উভয়কে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি প্রণয়িণীর রূপ সম্বন্ধে কহিয়াছেন 'কাম গন্ধ নাহি তায়'। .....অর্থাৎ এ প্রেম বাহ্য জগতের দর্শন-স্পর্শনের প্রেম নহে, ইহা স্বপ্নের ধন, স্বপ্নের মধ্যে আবৃত থাকে, জাগ্রত জগতের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। ইহা শুদ্ধমাত্র প্রেম, আর কিছুই নহে। ....কঠোর ব্রত সাধনা—স্বরূপে প্রেম সাধনা করা চণ্ডীদাসের ভাব...."

শঙ্করীপ্রসাদ বসু চণ্ডীদাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন— "চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ চণ্ডীদাসস্বামীর পশ্চাৎপটে চিত্রিত।" "চণ্ডীদাসের রাধা শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশ, কিন্তু তাঁহার আত্মার শিখা মৃৎভাণ্ডে জ্বলিয়াছে।" "বাঙালিকে আত্মদর্শন ও আত্মনিবেদনের বাণী সৌভাগ্য চণ্ডীদাসই দিয়াছিলেন মধ্যযুগে এবং সেখানেই তাঁহার কবি গৌরব।" "চণ্ডীদাস গণপ্রাণের কবি, অতি গভীর সত্যকে সাধারণীকৃত করার ক্ষমতা তাঁহার মতো আর কাহারও ছিল না। তাই চণ্ডীদাসের, একমাত্র চণ্ডীদাসের মর্মগ্রাহিতা ও সংবেদনশীলতাই মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে হৃদয় রহস্যকে প্রেমের বন্ধনে ক্ষুদ্র রেখায় বাঁধিতে পারিয়াছে।" "চণ্ডীদাস আমাদের প্রেমের স্বর্গোদ্যানে লইয়া গিয়াছেন, যেখানে কৃষ্ণ আছে, রাধা আছে, আর আছে মধুর শয়তান, প্রেম।" "চণ্ডীদাস 'মরম' আর 'ধরমের' কবি। তাঁহার কাব্যে রূপের ঐশ্বর্যের-তরঙ্গ, শব্দের চূর্ণ ঝঙ্কার, বর্ণের বাসন্তী উচ্ছ্বাস কিংবা রসকৌতুকের নর্মলীলা প্রত্যাশামত পাইব না। .....একটি মেদুর মেঘকজ্জল দিবসে এই কবি আমাদের চিরদিনের অধিকার দিয়াছেন। সে দিবসের সর্বত্র আচ্ছন্ন আছেন কৃষ্ণ, কৃষ্ণের দেহে যতটুকু রাধাদেহের আলো, ততটুকুই আমাদের দৃষ্টির গোচর। চণ্ডীদাসের বৃন্দাবন পূর্ণিমাধৌত যমুনাতটে নয়— কৃষ্ণ যমুনার অশ্রুজলতলে।" "চণ্ডীদাস যে ভাবের ভাবুক, সেই সহজিয়া সাধনার প্রেমের ঐকান্তিক নিভৃতিই বৈশিষ্ট্য। ....ভাব আস্বাদনে অন্তরঙ্গ চাই। ....কৃষ্ণ-হুতাশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবে ক্রন্দন কীর্তন যেখানে রাধার দুঃখকে বিজয়ার সার্বজনীন চণ্ডীমণ্ডপে শান্তিবারিতে ও বচনে নিষিক্ত করিয়াছে, সেখানে চণ্ডীদাসের রাধা নিজের নির্জন সত্তায় প্রস্থান করিয়া, এমনকি সখীদের সামনে পর্যন্ত কপাট লাগাইয়া, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছেন— 'কাহারে কহিব মনের মরম, কেবা

যাবে পরতীত।' "চণ্ডীদাসের কাব্যে পিরীতির ছড়াছড়ি। পিরীতি হইল কমল, সে কমলফোটে রসের সায়রে— 'পিরীতি বলিয়া একটি কমল রসের সায়র মাঝে', ঐ একপদ্ম পিরীতির সৃষ্টি-বিষয়ক অলৌকিক কাহিনী কবি লিখিয়াছেন। চণ্ডীদাস যে এত 'পার্থিব', পিরীতিকে কিন্তু তিনি স্বরূপে অপার্থিব রাখিয়াছেন। .....কবির কাছে পিরীতি সাধারণ প্রেমের প্রতিশব্দ মাত্র নয়। পিরীতিই তাঁহার জীবনের ধৃতি ও ভিত্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের 'প্রেমের' মতোই 'পিরীতি' কবির নিকট সাধ্য ও সাধন উভয়ই। পিরীতি যদি প্রবৃত্তি জীবনের আবেগমাত্র হইত, তবে এমন করিয়া কবি পিরীতির সর্বাত্মক স্বীকরণের জন্য সংগ্রাম করিতেন না। চণ্ডীদাস অদ্বৈতবাদী সাধক। নিজের স্থূল দেহকে পিরীতির সত্তায় একীভূত করাই তাঁহার সাধনা। চণ্ডীদাস পিরীতি-ব্রহ্মের বৈদান্তিক প্রেমিক।" "চণ্ডীদাস কিন্তু ভনিতায় বিশেষ উদ্দীপিত। পদগুলি যে তাঁহার নিবিড়তম অনুভূতি বাণীবাহন— কাব্য প্রয়াসমাত্র নয়— তার প্রমাণ ভণিতায় মেলে। চণ্ডীদাস রাধাভাবিত কবি। রাধামুখে তিনি নিজেকেই ব্যক্ত করিয়াছেন। .....চণ্ডীদাসের সেই নিজের কথার সঙ্গে পদমধ্যগত রাধার নিজের কথার ভাবগত পার্থক্য কিছুমাত্র নাই। .....কালজ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে রাধামুখে যে কৃষ্ণ-চরিত্র পরিব্যক্ত, তাহাতে সেই নিরপেক্ষতা নাই, যে বস্তু ছিল 'প্রমিকা' চণ্ডীদাসের ভণিতায়। পদের মধ্যে রাধা-কণ্ঠে কৃষ্ণচরিত্র উদ্‌ঘাটন করিয়া পদশেষে নিজকণ্ঠে কবি সিদ্ধান্তটি জানাইয়াছেন। ভণিতা সেই সিদ্ধান্ত।" "চণ্ডীদাসের পদে একটি সুদীর্ঘ প্রণাম, যুগ-যুগ, জীবন-জীবন দীর্ঘ। ....চিন্ময় সূর্যকে তিনি প্রভাতেই দেখিয়াছেন। সেই সূর্যকে তৎক্ষণাৎ মানিয়া মৃত্তিকায় সূর্যবরণের সাধনায় মাতিয়াছেন। দ্বিধা, সন্দেহ তাঁহার ছিল না, শুধু ছিল বরণ আর নিবেদন। চণ্ডীদাস এবং তাঁহার রাধিকা বেদনার গান গাহিয়া সূর্য সত্যকে বন্দনা করিয়া গিয়াছেন। ....চণ্ডীদাসের মতো পবিত্র আত্মসমর্পণ বৈষ্ণব সাহিত্যে আর কোথাও নাই।" ".....সকল বর্ণের মধ্যে কালোর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করাই কঠিনতম। .....চণ্ডীদাস এই কালো আলোর কবি। কঠিন তাঁহার সাধনা। .....চণ্ডীদাস কালোর কালো, আলোর আলোকে পাইয়াছিলেন তাদাত্ম্য সাধনায়।"

"চণ্ডীদাস অতি প্রবল অধ্যাত্ম-উপলব্ধিকে প্রেমানুভূতিতে স্নিগ্ধ করিয়া ভাষায় ধরিয়াছেন।"

চণ্ডীদাসের কাব্য শিল্প সম্পর্কে শেষ কথা বোধহয় এই উদ্ধৃতিসমূহে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিনটি ভাবুক-হৃদয় সহৃদয়-সামাজিক হয়ে পান করেছেন ভাবুক মরমিয়া কবি শিল্পীর সৃষ্ট অমিয়-সুধা। প্রকৃত রসিকচিত্ত বলেই এমন্ ভাবে উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছেন প্রেমরস-জারিত সেই কবি-আত্মার বাণীশিল্পকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় বলেছেন—

"একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুইজনে,
একজন গাবে গলা খুলে, আরজন গাবে মনে।।"

—চণ্ডীদাসের তিনজন রসিক সমালোচকের সমালোচনায় একথাই চূড়ান্ত সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

তবু কবিতা দ্রৌপদীর শাড়ী ..... দিনে দিনে আদিগন্ত-ব্যাপৃত তার অনন্ত-প্রকাশের ইঙ্গিত পরতের পর পরত খুলে যেতেই থাকে। তাই পূর্বোদ্ধৃত সমালোচনার পথ ধরেই চণ্ডীদাসের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্পের আরো বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা থাকে।

চণ্ডীদাসের কবিতার কাব্য সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে-কথাগুলো মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন সেগুলি হল—

চণ্ডীদাস-সৃষ্ট রাধাকে দেখতে গিয়ে বিদেশী শিল্পীর একটি বাক্য সার্থক বলে মনে হয়— "Who paints a figure, if he cannot be it, cannot do it" এই ব্যাপারটিই ঘটেছে চণ্ডীদাসের সৃষ্টিক্ষেত্রে। তাঁর রাধা তাঁরই আপন অন্তরাত্মার প্রতিফলন—

"পিরীতি আখর তিন না দেখি নয়ানে।
যে কহে তাহার আর না দেখি বয়ানে।।
পিরীতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।
চণ্ডীদাসে কহে রামি ইহার গুরু তুমি।।"

নিরাসক্ত দর্শক বা শিল্পীর দৃষ্টিতে দুর থেকে রাধার ভাবানুভূতিকে দেখে তার রূপনির্মাণ তিনি করতে পারেননি। তাই রাধার অন্তরমথিত ক্রন্দন ও হাহাকারে কবি ভরে দিয়েছেন আপন অনুভূতি ও প্রেমবোধের আর্তিকে। বিদ্যাপতির রাধা যেমন মাধবের নাম নিতে নিতে নিজেই মাধব বলে নিজেকে মনে করেছেন, তেমনি চণ্ডীদাস রাধার বেদনদহনজ্বালাকে বর্ণনা করতে করতে নিজেরই রক্ত-অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত প্রেমিক হৃদয়কে তুলে ধরেছেন তাঁর কাব্যে—

"জন্ম হইতে কুল গেল ধর্ম গেল দূরে।
নিশি দিশি প্রাণ মোর কানু গুণে ঝুরে।।
নিষেধিলে নাহি মানে ধরম বিচার।
বুঝিনু পিরীতের হয় স্বতন্ত্র আচার।।"

—এই 'পিরীতের' বেদনা-বিপত্তি কেবল রাধার নয়, এই অসহনীয় অবস্থা স্বয়ং কবিরই। সেজন্যই তাঁর রাধার বিরহ এত হৃদয়গ্রাহী— অন্তরের অন্তরতম স্থলে যে না পাওয়ার অতৃপ্ত বেদনার অনুভূতি— সেই চরমকে সে জাগিতে তোলে। চণ্ডীদাসের রাধার ক্ষেত্রে এই 'সাধন ধন সুদুর্লভ' স্বয়ং কৃষ্ণ, চণ্ডীদাসের ক্ষেত্রে সেই-ই 'পিরীতি' আর সাধারণের ক্ষেত্রে যে হল সেই চরম রোমান্টিক 'অধরা মাধুরী'। এইদিক থেকে তাঁর কাব্যের লিরিক ধর্ম সার্থক হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, চণ্ডীদাস ভাবাবেগে বিহ্বল কবি। তাঁর কবিতার প্রাণকেন্দ্রে থরথর করে কাঁপে অনুভূতির রসাপ্লুতি। কোনো কিছু বিশ্লেষণে দুটি ভিন্ন ধর্মের দৃষ্টিকোণ কাজ করে। একদিকে রয়েছে বুদ্ধি ও যুক্তির শাণিত রূপ, অপর দিকে রয়েছে আবেগ। একদিকে পাণ্ডিত্য, অপরদিকে প্রেম। চণ্ডীদাস পণ্ডিত হলেও তাঁর কাব্যে বুদ্ধির শাণিত দীপ্তি, যুক্তির ক্ষুরধার বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না; তাঁর কাব্যে রয়েছে প্রেমের গভীর উপলব্ধি, ভাবের অহৈতুক বানভাসি। এই ভাব-বিহ্বলতার প্রবণতা আবার অতিমাত্রায় কোমল ও স্পর্শকাতর, একান্ত করুণ। বাংলার 'জলসিঞ্চিত ক্ষিতি'র সৌরভ, বাংলার 'সজল শ্যামল ঘন দেয়া'র মাধুরিমা এর অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো। চণ্ডীদাস ঐকান্তিক ভাবেই এই রূপসী বাংলার কবি, গ্রাম বাংলার পরকীয়া প্রেমের বেদনার কথাকার— বাংলার বুক ভরা মধু তাই তাঁর কাব্যের ছত্রে ছত্রে অমৃতধারা বর্ষণ করেছে।

প্রথম চণ্ডীদাসই বাংলার 'কানের ভিতর দিয়া মরমে', সংগীত ঢেলে দিয়েছেন, রাধার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে বাংলার বৈষ্ণব পদাবলির দুখ জাগানিয়া গান শুনিয়েছেন। শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন— "বাঙালীর জীবনের নিতান্ত গ্রাম্যরূপ, ঐ জীবনে সমাজের প্রভাব, সমাজপতির শাসন, সহজ সংস্কার, নীতি ও সতীত্ববোধ, সেখানে প্রেমের আকস্মিক আবির্ভাবের প্রতিক্রিয়া, প্রেমের মতো বিপ্লবকারী চেতনাকে প্রথমে উৎপাতরূপে গ্রহণ, নিজের পূর্বাগত সংস্কার ও সমাজের রক্তচক্ষুর সঙ্গে সহসা উন্মত্ত বাসনার সংঘর্ষ ও তাহার দ্বারা মূর্ছিত কিম্বা উন্নীত সত্তা— এ সকলের প্রাণখচিত অভিব্যক্তি চণ্ডীদাসের ভাষায় মিলিতেছে। সেখানে আরো দেখিব, শত বাধার মধ্যেও প্রেমের দুরন্ত বিজয়ীরূপ, বাংলার কোমল মৃত্তিকা পীঠে প্রেমের সর্বত্যাগিনী যোগিনী মূর্ত্তি, কিম্বা সর্বনাশিনী অগ্নিপ্রতিমা।"

প্রবাদ-প্রবচনে, ভাষায়, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সমাজ-সংস্কার— সবকিছু মিলিয়ে চর্যাপদের পরে আরো গভীরভাবে বাংলাদেশের খাঁটি রূপটি প্রথম আমরা পাই চণ্ডীদাসের পদাবলিতে।

যেমন ঃ

(১) "কোন বিধি সিরজিল সোতের শেওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি।।"

(২) "সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়।।"

(৩) "তিতা কৈল দেহ মোর ননদী বচনে।
কত না সহিব জ্বালা এ পাপ পরাণে।।"

(৪) "বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী।।"

(৫) "হেদেরে দারুণ বিধি তোরে সে বাখানি।
অবলা করিলি মোরে জনম দুখিনী।

(৬) "ঘরে গুরু জ্বালা জলের শিহালা
পড়সী জিয়ল মাছে।
কুল পাণিফল কাঁটা যে সকল
সলিল বেড়িয়া আছে।"

(৭) "ওঝা রোঝা আন গিয়া পাইয়াছে ভূতা,
কাঁপি কাঁপি উঠে ঐ বৃষভানুসুতা।।"

—এ সকল অনুষঙ্গ, ভাষাভঙ্গি, প্রবাদ, সংস্কার, সমাজ— এ একান্তভাবেই গ্রামবাংলার জিনিস। এমনকি রাধার বেদনা, বলার ভঙ্গিটিও একান্তই গ্রামবাংলার।

চণ্ডীদাস সহজিয়া সাধনার কবি, সহজভাব ও ভাষার কবি। চর্যাপদে আছে— "তুলা ধুনি আসুঁ রে আসুঁ।"—চণ্ডীদাস প্রেমের ধুনুচি দিয়ে কাব্যের গভীরভাব ও জটিল ভাষাকে সহজ থেকে সহজতর করে তুলেছেন।

চণ্ডীদাসের কাব্যের একটি মূল সুর হল মানবপ্রেম ও মর্ত্যপ্রীতি। তাঁর সৃষ্ট রাধা-কৃষ্ণও এই মৃত্তিকার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে কবির অলৌকিক প্রতিভা বলে নিত্য বৃন্দাবনের দিকে নিজেকে তুলে ধরেছেন।

চণ্ডীদাসের রাধাকে আমরা দেখি প্রগাঢ়যৌবনা। তাঁর যৌবনধর্ম কবির পদাবলির একটি প্রধান লক্ষণ।

চণ্ডীদাসের পদে আছে—

"আমার উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী ভুবনময়।"

কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা যৌবনেই মহাযোগিনী। তবে এই যোগিনীর পরিধানে ত্যাগ-ধূসর গৈরিক বসন নয়, প্রেম-রক্তিম রাঙাবাস।—

"বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে
যেমত যোগিনী পারা।"

—এই বর্ণনা চণ্ডীদাসের রাধাকে সন্ন্যাসিনীর কঠোর ব্রহ্মচর্যের নিরাসক্ত ধূসরতা থেকে যৌবনের বর্ণাঢ্য রাজ্যে নিয়ে আসে।

তবে, লক্ষণীয়, রাধার যৌবনধর্ম দেহধর্ম ইন্দ্রিয়বোধ-সর্বস্ব নয়; তাঁর ইন্দ্রিয়বোধ গভীরতম প্রেমপ্রত্যয়ে আত্মহারা—

"ধিক্ রহ এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব।।"

—ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক অনুভূতির দ্বারকে রুদ্ধ করে দিয়েছেন চণ্ডীদাসের রাধা।

"আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।"

সেই খোলা অভ্যন্তরের দ্বার দিয়ে কেবল একটিমাত্র মুগ্ধ উপলব্ধির দিকে রাধার গতি। মর্ত্যপ্রীতি কবির স্বাভাবিক ধর্ম হলেও রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শের এই বস্তু জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য কবির কল্পনাকে আকর্ষণ করেনি। একটি হৃদয়ের বেদনার তারে তারে সুরকে বুনেছেন কবি— সেই হৃদয়ের সুর রাধার এবং একটিই বিচিত্র অনুভূতিকে ঘিরে ঘিরে এই সুর বাঁধা হয়েছে— সে অনুভূতির নাম কৃষ্ণ—

"কালা হইল জপমালা
সই আর না বলিস মোরে।
কালিয়া বরণ মনেতে পড়িলে
যে বড়ি প্রমাদ করে।।"

এই কৃষ্ণ না কোনো রক্তমাংসের মানুষ, না কোনো অপ্রাকৃত 'রসস্বরূপ'। এ কেবল রোমান্টিক কবি কল্পনার এক বিশুদ্ধ সৌন্দর্য আর অনন্ত প্রেমের কুহেলিকাচ্ছন্ন অবয়বহীন রেখাহীন চেতনা। হয়তো রাধা কিংবা স্বয়ং চণ্ডীদাসের কামনা-বাসনা-আর্তি আদর্শের তিল তিল ভাবনার সমন্বয়ে এই কৃষ্ণ রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। সে মানস-পুরুষ। তাই সে রূপ নয়, কেবল একটি নাম—

"দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া।।
কালমাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু গুণ যশ কানে পরিব কুণ্ডলে।।
কানু অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিব।।"

চণ্ডীদাসের কাব্যে রাধার এই কৃষ্ণনাম-গানেই প্রেমের এক মঙ্গল-প্রভাতী সুর বেজেছে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলিতে—

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরম পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

চণ্ডীদাসের রাধার প্রণয়ের অনুভূতিতে হৃদয়ের এত বেশি প্রাধান্য যে, বস্তুর ইঙ্গিতই তার পক্ষে যথেষ্ট। তাই বস্তুর ইন্দ্রিয়গম্য রূপ নয়, সেই রূপের মধ্যে অপরূপের যে গভীর আভাস— তারই প্রতি রাধার আকর্ষণ—

"না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।"

বস্তুগত ভিন্নতা, বর্ণের বৈচিত্র্যে অমিল থাকা সত্ত্বেও একটা ভাবের সম্মোহন কাঠির স্পর্শে এর গভীর সামীপ্য এনেছেন রূপদক্ষ কবি—

"এক দিঠ করি ময়ূরী ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।"

অথবা—

"সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন তারা।"

এই ব্যাকুল অসীম দ্যোতনা ও কামনার বর্ণ বিচ্ছুরণেই তাঁর কৃষ্ণকল্পনা অন্তরে রূপ পরিগ্রহ করে। কবি রূপান্ধ নন, বস্তুরূপের অন্তরে সূক্ষ্ম ও গভীর ভাবানুভূতির গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে তিনি সার্থক।

তবে, একটি কথা স্মরণীয় যে, চণ্ডীদাসে ভাবের আবেগ বেশি থাকলেও দেহবাস্তবকে না ভুলেই কবি আত্মার কথাই বেশি বলেছেন।

পূর্বরাগের প্রথম পর্যায়ে চণ্ডীদাসের রাধা চঞ্চল—

"ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়।।"

দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে প্রেমের প্রথম পরশনেই এই ভাব বিপর্যয় কিন্তু বেদনা সঞ্চারে ধীর স্থির গভীর রূপ ধরেছে।

"বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা।"

কৃষ্ণের বংশীধ্বনির 'মোহনিয়া ফাঁদে' ধরা পড়েছেন অবলা কিশোরী রাধা—

"বাঁশি কেনে ডাকে থাকি থাকি।
সেই হৈতে মোর মন নাহি হয় সংবরণ
নিরন্তর ঝুরে দুটি আঁখি।"

সরল হৃদয়া রাধা অকপটেই স্বীকার করেন তাঁর প্রেম—

"গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি।।"

এই সরলতাই চণ্ডীদাসের কবিতার ঐশ্বর্য। এই অকপট সাহসিনী রাধা চণ্ডীদাসেরই রাধা।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ :

(ক) চণ্ডীদাসের কাব্যের যথাযথ বিশ্লেষণ ও মর্মোদ্‌ঘাটনে সার্থকতা দেখিয়েছেন আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

(খ) চণ্ডীদাসের রাধার বিষাদে কবির আপন অন্তরাত্মার প্রতিফলন ঘটেছে।

(গ) চণ্ডীদাসের কাব্যে আছে লিরিক ধর্ম।

(ঘ) চণ্ডীদাসের কাব্যে রয়েছে প্রেমের গভীর উপলব্ধি, ভাবের বিহ্বলতা।

(ঙ) চণ্ডীদাসের কাব্য কোমল, করুণ, স্পর্শকাতর।

(চ) চণ্ডীদাসই প্রথম বাংলা বৈষ্ণব পদাবলির কবি। বাঙালি জীবনের গ্রাম্যরূপ, সমাজের প্রভাব, সমাজপতির শাসন, জীবনের সহজ সংস্কার, নীতি ও সতীত্ববোধ, পরকীয়া প্রেমের উদ্বেলতা ও শিহরণ, প্রেমের দুরন্ত বিজয়ী রূপ চণ্ডীদাসের কাব্যে ধরা দিয়েছে।

(ছ) চণ্ডীদাসের কাব্যের মূল সুর হল মানবপ্রীতি ও মর্ত্যপ্রীতি। তাঁর সৃষ্ট রাধাকৃষ্ণ একান্ত মর্ত্যের হয়েও কবি প্রতিভার যাদুকাঠির স্পর্শে অলৌকিক হয়ে উঠেছে তাঁদের প্রেমলীলা।

(জ) চণ্ডীদাসের রাধা যৌবনেই যোগিনী পারা। কিন্তু এ-যোগিনী নিরাসক্ত নন, প্রেমের বেদনায় যোগিনীবেশ তাঁর।

(ঝ) চণ্ডীদাসের রাধার দেহধর্ম ইন্দ্রিবোধ-সর্বস্ব নয়, তার প্রেম ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে মর্মস্পর্শী হয়েছে।

(ঞ) চণ্ডীদাসের কাব্যের বেদনা কেবল একটি অনুভূতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে— তা হোল কৃষ্ণানুভূতি।

(ট) চণ্ডীদাসের রাধার কৃষ্ণবিরহ কবির কামনা-ভাবনা-বাসনা-আর্তি-আদর্শের তিল তিল রোমান্টিক ভাবনার সংমিশ্রণে রূপ ধরেছে।

(ঠ) চণ্ডীদাসের রাধায় হৃদয়ের প্রাধান্য।

(ড) রূপের মধ্যে অপরূপের আভাসে উদ্ভাসিত চণ্ডীদাসের পদাবলি।

(ঢ) সূক্ষ্ম ও গভীর ভাবানুভূতির ব্যঞ্জনা চণ্ডীদাসের পদাবলির প্রাণ-স্বরূপ।

(ণ) চণ্ডীদাসের রাধা প্রথমে ব্যাকুল, পরে ভাবগভীর।

(ত) সরলতা ও অকৃত্রিমতা চণ্ডীদাসের কাব্যের ঐশ্বর্য।

আত্ম সমীক্ষামূলক প্রশ্ন ঃ

(১) চণ্ডীদাসের বিখ্যাত কয়েকজন সমালোচকের নাম লিখুন।

....

....

(২) চণ্ডীদাসের রাধা সম্পর্কে লিখুন।

....

....

(৩) চণ্ডীদাসের পদাবলি সম্পর্কে আপনার ধারণা লিখুন।

....

....

(৪) চণ্ডীদাসের কাব্যের মূল সুর কী?

....

....

১.৩.৩ চণ্ডীদাসের পদাবলি বিশ্লেষণ

চণ্ডীদাসকে পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়। বৈষ্ণব পদাবলির মূল যে সুর তা ধ্বনিত হয়েছে যে দুটি পদে সে পদগুলি উল্লেখ করেই চণ্ডীদাসের পদাবলির বিচার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যায়। উল্লিখিত দুটি পদের একটি বিদ্যাপতির রচনা—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

অপরটি স্বয়ং চণ্ডীদাসের রচনা—

"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।"

এই অপরিতৃপ্তি, এই আশঙ্কা, এই বিষাদের অশ্রুজলই বৈষ্ণব পদাবলির প্রাণবিন্দু। রহস্যের অবসানে মাধুর্যেরও অবসান ঘটে। যেখানে কৌতূহল নেই, সেখানে আকর্ষণও নেই। এই কৌতূহল, এই রহস্য বৈষ্ণব পদাবলিকে সমৃদ্ধতর করেছে ভাবনার দিক থেকে। তাই দেবতাকে কখনো মনে হয়েছে প্রিয়, প্রিয় কখনো দেবতার রূপে ধরা দিয়েছে আরাধনায়। তাই বৈষ্ণব পদাবলিকে আমরা লৌকিক জগৎ থেকেও যেমন বিসর্জন দিতে পারি না, তেমনি অলৌকিকত্বকেও এর শরীর থেকে মুছে নিতে পারি না। এই লৌকিক-অলৌকিকের দোলাচলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাসের জীবনে যতখানি সত্য রামীর প্রেম, ততখানিই সত্য রাধার প্রেমলীলা। এই পার্থিব-অপার্থিব উভয় প্রেমের মধুর স্মৃতি চণ্ডীদাসের কাব্যকে পরম রমণীয়ত্ব এনে দিয়েছে। চণ্ডীদাস সম্পর্কে যে জনশ্রুতি আছে, তার থেকে বোঝা যায় তাঁর জীবনে প্রেম নিষ্কণ্টক পথ ধরে আসেনি, মিলন থেকে বিচ্ছেদের বেদনাই বেশি ছিল তাতে; তাই সেই পার্থিব প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত তাঁর রাধা প্রথম থেকে অশ্রুর বন্যায় ভেসেছেন, উদাসী যোগিনী হয়েছেন। চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই। পূর্বরাগ যদিও প্রেমের প্রথম সোপান, কিন্তু চণ্ডীদাস পূর্বরাগেই প্রেমের চরম পরিণতি দেখিয়েছেন—

"কানু যে জীবন জাতি প্রাণ ধন
দুখানি আঁখির তারা।

পরাণ অধিক হিয়ার পুতলি
নিমিখে নিমিখে হারা।।"

লোক মনোরঞ্জনের জন্য নয়, আত্মগত সাধনায় এবং ধ্যান তন্ময়তায় চণ্ডীদাস জগৎ এবং জীবনকে আত্মসাৎ করেছিলেন। তাই তাঁর কাব্য কেবল কাব্য নয়, জীবনের গভীরতম সত্তার সুষমাময়ী বাণীর প্রতিমূর্তি—

"সই বিধি দিল মোরে শোক।
পিরীতি করিয়া আশ না পূরল
কলঙ্ক ঘুষিল লোক।।"

তাঁর ধর্ম প্রেমধর্ম। যে প্রেমের কোনো হেতু নেই, যে প্রেম কোনো বাধাকেই মানতে চায় না, যে প্রেম কোনো প্রতিদানও চায় না, যে প্রেমে আত্মসুখের কোনো কামনা নেই, যে প্রেম ইন্দ্রসম ঐশ্বর্যকে তুচ্ছজ্ঞান করে, সেই মরণজয়ী প্রেমের বাণী চণ্ডীদাসের পদাবলিতে রূপ ধরেছে। এই প্রেমই তাঁর কাছে বাস্তব। তাই প্রথম থেকেই এই প্রেমে পাকা রঙ ধরেছে। নাম শুনেই আবেগ-বিহ্বলা চণ্ডীদাসের রাধা—

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

ভাব যেখানে গভীর, প্রকাশের ভঙ্গিমা সেখানে স্থির স্তব্ধ। এখানেই পূর্বরাগের চরম পরিণতি— আর চণ্ডীদাসের রাধা কবির মানস-গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েই এখানে প্রতিষ্ঠিতা। প্রেম-জিজ্ঞাসার এমন এক গভীর স্তরে চণ্ডীদাস অবতরণ করেছিলেন যে, সেখানে বাইরের অবস্থাগত পর্যায়ভেদ তুচ্ছ হয়ে যায়। তাই রাধা—

"বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা।"

চণ্ডীদাসের অবলোকন প্রেমানুভূতির অতি নিগূঢ় অন্তর্মুখিনতার দিকে। তাই পূর্বরাগের প্রথম পর্যায়ে তাঁর রাধা আবেগচঞ্চলা, কিন্তু বয়ঃসন্ধির চাপল্য তাঁর নেই।—

"ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়।"

এই রাধার মধ্যে হৃদয়ানুভূতির এতই প্রাধান্য যে, বস্তুর ইঙ্গিতই তাঁর কাছে যথেষ্ট, সে বস্তুর ইন্দ্রিয়গম্য রূপের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ নেই। এই বস্তুরূপের অতীত ইন্দ্রিয়াতীত কৃষ্ণমুখিতা রাধার আর্তিতে প্রকাশিত।

"কালো জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে।।"

এই কালা রঙের অসীম ব্যাপ্তি ও অতলান্ত গভীরতায় বাইরের বস্তুবোধের তুচ্ছ পার্থক্য ও সামান্য সীমারেখা এখানে এক বিরাট মহৎ ও সমুন্নত উপলব্ধির মধ্যে একাকার হয়ে গেছে।

এরূপ যাঁর কৃষ্ণ-চেতনা তাঁর পূর্বরাগের অনুভবেই চির-বিরহিণীর শাশ্বত ক্রন্দন শোনাই স্বাভাবিক। নিখিলের রূপ থেকে অরূপের দিকে চিরন্তন সৌন্দর্য ও প্রেম কামনার এবং বিরহের সুতীব্র সুগভীর আর্তি চণ্ডীদাসের নিরলঙ্কৃত সহজ, মর্মস্পর্শী ভাষায়, আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ কবিতায় প্রাণের যে সুগভীর আকুলতা প্রকাশিত— এটিই কবির কবিতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ—

"কালিয়া রভস কালা মনেতে গাঁথিয়া মালা
জাগিয়া জপিয়া প্রাণ গেল।।
নিশি দিশি অনুক্ষণ প্রাণ করে উচাটন
বিরহ অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয় পরিণাম কি বা হয়
কি মোহিনী জানে কালা কানু।।"

যুগে যুগে দেশে দেশে সকল প্রেম-পাগলিনীর সঙ্গে রাধার যে একটি স্বাজাত্য রয়েছে, অথবা রাধা যে নিখিলের প্রেম-পাগলিনীর প্রতীক— এই সত্যের ব্যঞ্জনা আমরা চণ্ডীদাসের রাধার পূর্বরাগের পদেই পাই।

চণ্ডীদাস বেদনার কবি, আক্ষেপনুরাগের কবি। তাঁর সৃষ্ট রাধা এক সূক্ষ্মভাবের জ্যোতির্ময়ী বিগ্রহ। জন্ম-জন্মান্তরে তিনি কৃষ্ণগত প্রাণা-দুঃখবেদনায় আধ্যাত্মিক জগতের অভিযাত্রী। তাই তাঁর রাধা চরিত্রের কোনো ক্রমবিকাশ আমরা পাই না।

দেহকেন্দ্রিক মিলন বা প্রেম রঙ্গলীলার তরঙ্গভঙ্গ চণ্ডীদাসের পদে নেই। তাঁর রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও মিলনের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "দেহহীন চামেলির লাবণ্য" বিলাসের বেদনাবিধুর অনুরাগ ফুটে উঠেছে। কবি দৈহিক মিলনানন্দের কবি নন, অতীন্দ্রিয় লোকের, অধরা মাধুরীর সন্ধানী—

"যারে নাহি দেখি শয়নে স্বপনে
না দেখি নয়নকোণে।
তবু যে সজনি দিবস রজনী
সদাই পড়িছে মনে।।"

চণ্ডীদাসের রাধার প্রেম এক গভীরতম জীবনবোধের নির্যাস। নিবিড় দুঃখবোধের বেদনা বিধুরতা দিয়েই তাঁর পদবলির প্রেমের জগৎ গঠিত। তাঁর রাধা প্রেমের সাধনায় ব্যাকুল ও গভীর, প্রেম সাধনায় দুঃসহ তপস্যার বেদনদহনেই তাঁর ভূমানন্দের সাক্ষাৎ লাভ। তাই "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথঃ"— এর মধ্য দিয়েই তাঁর রাধার সাধনা। তিনি জানেন "সত্য সে কঠিন"—কিন্তু তাকে ভালবাসলে সেই কঠিন কাউকে কোনোদিনও বঞ্চনা করে না।

চণ্ডীদাস ও তাঁর রাধা জানেন— "সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তার ঠাঁই"— একথা বোঝানোর নয়, অন্তরে বেজে ওঠার। কঠোর দুঃখের সাধনায় নির্মল প্রেমের স্বর্গীয় দ্যুতি ফুটে ওঠে। দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামে, সেই মুহূর্তেই বক্ষের দরজায় বঁধুর রথ এসে থামে। চণ্ডীদাসের পদাবলিতে প্রেমের সেই শ্রেয়োবোধ এক অপার্থিব রসঘনলোক সৃষ্টি করেছে। সেখানে ভোগের কামগন্ধ নেই, আছে আত্মানুভূতির নিবিড়তম আনন্দ। ফলে চণ্ডীদাসের কাব্যের আধ্যাত্মিক ভাবুকতা সকলের

চিত্তকে আকৃষ্ট করে—

"এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি।।
দুই কোরে দুই কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া।।"

এই প্রেমের সাধনা 'বড়ো আমি'র সাধনা। সেই সাধনায় কুলশীল-জাতিমান সব বিসর্জন দিয়ে পরকে আপন ও আপনকে পর করে, পদে পদে রক্ত-অলক্তক রেখার চিহ্ন এঁকে কুল-হারানো পথ-ভোলানো অভিসারে বের হতে হয়।

ভাবের আবেগে বিভোর বিহ্বল কবি, কিন্তু পারিপার্শ্বিককে তিনি ভোলেননি। তাই বিরুদ্ধ সমাজ ও সংসারের পটভূমিকায় দেখিয়েছেন এই পরকীয়া প্রেমের দীপ্তি। তাই রাধার আক্ষেপানুরাগে রোমান্টিক সৌন্দর্যতৃষ্ণা ও ব্যর্থতার আকুল আর্তির সঙ্গে মিশে গেছে বাঙালি গার্হস্থ্য নারী-হৃদয়ের করুণ ক্রন্দন—

"কোন বিধি সিরজিল সোতের শেঁওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি।।"

সব অবহেলা করে একমাত্র প্রেমকে সম্বল করে প্রেমের আকর্ষণে ঘরছাড়া রাধা, প্রিয়তম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার বেদনা তাই তাঁর পক্ষে নিদারুণ। তখন মৃত্যুকামনা ছাড়া আর পথ নেই। কারণ রাধার সৃজন-কর্তার অভিমত—

"পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পীরিতি মিলয়ে তথা।।"

তাই এই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি প্রথম থেকেই বিশেষ ভাবে তৈরি। তাঁর পদে রাধার তদ্গত চিত্তের রূপটি সহজ ভাষায় প্রশান্ত রূপ নিয়েছে।

কৃষ্ণকে না-দেখার, না-পাওয়ার এই "হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা"— কত গভীর তা কেবল অনুভবের—

"সখীর সহিত জলেতে যাইতে
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ঝলমল
তাহে কি পরাণ রয়।।"

সমস্ত ভুবনময় রাধার ছড়িয়ে আছেন শ্যাম। তাই ছলোছলো আঁখির জলভরা মেঘমেদুরতা নিয়ে গুরুজনদের সম্মুখে দাঁড়াতে সলজ্জিতা কুণ্ঠিতা রাধা, অথচ শ্যাম বিরহে তাঁর 'উচাটন মন ঘরে রয় না', কুলধর্ম রাখা তাঁর কাছে এক বিষম দায়— "কুলের ধরম রাখিতে নারিনু কহিলুঁ সবার আগে।" এই সাধনা তদ্গত চিত্তের সাধনা। সব জলাঞ্জলি দিয়ে কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে রাধা-কৃষ্ণপ্রেমের নৈবেদ্যরূপে নিজেকে সমর্পণ করেন।—

"তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া হইনু তোমার দাসী।।"

এই ঐকান্তিক আত্মনিবেদনে বেজে উঠেছে প্রেম ও ভক্তির সুর "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

কৃষ্ণ-প্রেম এক রহস্যঘন অসীম ও গভীর বিষয়। তাই মিলনেও রাধার অহেতুক বিচ্ছেদ ভাবনা—

"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।"

দিবারাত্রির ব্যবধান ঘুচিয়ে নিরন্তর দুঃখের সাধনাতেও রাধা বুঝতে পারেননি সেই সাধন-ধন-সুদুর্লভের স্বরূপ।—

"রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি।।"

সমস্ত বেদনা ও বিষাদের মধ্যেও রাধার অনুভূতি প্রেমের সেই উত্তুঙ্গ শিখরেই চিরভাস্বর।

"ভাবিয়া দেখিনু শ্যাম বঁধু বিনে
আর কেহ মোর নয়।"

তাই প্রিয়তমকে হারানোর ভয়ে বিহ্বলা রাধা—

"সেই কেমনে ধরিব হিয়া।
আমারি বঁধুয়া আনবাড়ী যায়
আমারি আঙ্গিনা দিয়া।।"

তবে প্রেমের মহিমা আশঙ্কা, কলঙ্কের কালো অন্ধকারকেও করে আলোকময়—

"গুরু দুরুজন বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে এ তনু বেচিনু
তিল তুলসী দিয়া।।"

"ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে" —রাধাকে তাই একমুখী হয়ে সব বিসর্জন দিয়ে প্রিয়মিলন কামনায় অভিসারে বের হতে হয়। তবে এ-কামনায় কোনো ভোগবাসনা নেই, আছে কেবল— "কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা"— অপেক্ষমান প্রিয়তমের যাতনা দেখে তাই রাধার প্রাণ কেঁদে ওঠে—

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলে বাটে।
আঙিনার মাঝে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।"

প্রিয়তমের জন্য বক্ষের তন্ত্রীতে এই যে নিষ্ঠুর মীড়ের মোচড়, সে কথা যে শুধু অনুভবের, সেই অনুভূতি জাগাতে চেয়েছেন রাধা নিঠুর কালিয়া বঁধুর বুকে—

"মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন, তোমারে করিব রাধা।।"

পূর্বরাগ থেকে ভাবসম্মিলন পর্যন্ত— যত পদই চণ্ডীদাস রচনা করেছেন, সর্বত্রই রাধার বৈরাগ্যের বিষাদ বিধুর তপস্বিনী মূর্তি গড়ে তুলেছেন। আক্ষেপানুরাগের পদ চণ্ডীদাসের হাতে কী করুণ ও মর্মস্পর্শী—

"বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে পীরিতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে।।"

শুধুই অপরিসীমা বেদনা ও আত্মহাহাকার বুকে নিয়ে পর্যায়ের পর পর্যায় পার করে গেছেন চণ্ডীদাসের রাধা। বিরহে সেই হাহাকার তীব্রতর অথচ মধুরতর—পদ্মের মাঝখানে বজ্রের মতো তার রূপ। ভাবোল্লাসে এই বেদনা বিধুরতাকেই শান্ত সমাহিত ভাবে রাধা কৃষ্ণের কাছে ব্যক্ত করেছেন। আর প্রেম বৈচিত্ত্যের পদে মিলনের মধ্যেও কল্পিত অনাগত ও সমাগত বিরহের আত্যন্তিক অনুভূতি বেদনামধুর রসসৃষ্টি করেছে— "কানুকানু করি রোয়ই সুন্দরী দারুণ বিরহ হতাশে।"

চণ্ডীদাসের কাব্যে মিলনের কোন প্রত্যক্ষ পদ নেই। প্রেমসুখের প্রাপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়েও তাই তাঁর রাধার দেহকামনার উতরোল উল্লাস নেই, আছে মধুর সান্নিধ্যের এক অনাস্বাদিতপূর্ব সৌরভ। চণ্ডীদাসের কবিতায় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠের বেদনার্ত বাণী ও উদাস কারুণ্যের শ্যামস্নিগ্ধ মাধুর্য সর্বত্র ব্যাপ্ত। প্রেমের এই অনাদ্যন্ত অতৃপ্তিকে চণ্ডীদাস সহজ সরল অনলঙ্কৃত ভাষায় ব্যঞ্জনাগর্ভ করে তুলেছেন।—

"এমন পীরিতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি।।
....
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।।"

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ ঃ

(ক) চণ্ডীদাস পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ কবি।

(খ) পূর্বরাগ প্রেমের প্রথম সোপান হলেও চণ্ডীদাস প্রেম-জিজ্ঞাসার এক গভীর স্তরে অবতরণ করেছিলেন।

(গ) চণ্ডীদাসের কাব্য জীবনের গভীরতম সত্তার সুষমাময়ী বাণীর প্রতিমূর্তি।

(ঘ) চণ্ডীদাসের ধর্ম প্রেমধর্ম।

(ঙ) বাইরের অবস্থাগত প্রভেদ ভুলে চণ্ডীদাস প্রেম-জিজ্ঞাসার এক গভীর স্তরে অবতরণ করেছিলেন।

(চ) প্রেমানুভূতির নিগূঢ় অন্তর্মুখিনতায় চণ্ডীদাসের কাব্য সার্থক।

(ছ) চণ্ডীদাসের কাব্যে পূর্বরাগ পর্যায়ে আবেগময়ী রাধা কিন্তু বয়ঃসন্ধির চাপল্যে চঞ্চল নয়।

(জ) চণ্ডীদাসের রাধা প্রগাঢ় যৌবনা।

(ঝ) চণ্ডীদাসের রাধার হৃদয়ানুভূতির প্রাধান্য বেশি।

(ঞ) চণ্ডীদাসের রাধার পূর্বরাগ পর্যায়ে রয়েছে চির বিরহিণীর শাশ্বত ক্রন্দন ধ্বনি।

(ট) চণ্ডীদাস বেদনার কবি, আক্ষেপানুরাগের কবি।

(ঠ) চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ যেমন নামের মাধ্যমেই এক অনন্তের রূপ পরিগ্রহ করে, তেমনি তাঁর রাধা এক সুক্ষ্ম ভাবের জ্যোতির্ময়ী বিগ্রহ।

(ড) চণ্ডীদাস দৈহিক মিলনানন্দের কবি নন।

(ঢ) চণ্ডীদাসের রাধার প্রেম এক গভীর জীবনবোধের নির্যাস।

(ণ) চণ্ডীদাসের কাব্যে ভোগ নেই, ত্যাগ আছে, কামনার রক্তিমতা ফেনিলতা নেই, আছে আত্মানুভূতির নিবিড় আনন্দ। তাই তাঁর কাব্য আধ্যাত্মিক ভাবুকতায় সমৃদ্ধ।

(ত) রাধার কৃষ্ণপ্রেমের সাধনা শ্রেয়ের পথ ধরে 'বড়ো আমি'র সাধনা।

(থ) চণ্ডীদাস ভাবাবেগ বিহ্বল কবি হলেও সমাজ সংসারকে বিসর্জন দিয়ে তাঁর কবিতা নয়। তাই বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রাধার পরকীয়া প্রেমের দীপ্তি আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।

(দ) চণ্ডীদাসের পদে রাধার তদ্গত চিত্তের রূপটি সহজ ভাষায় প্রশান্ত রূপ নিয়েছে।

(ধ) রাধার আত্মনিবেদনে ঐকান্তিক প্রেম ও ভক্তির সুর শুনি চণ্ডীদাসের কাব্যে।

(ন) রাধার সাধনা নিরন্তর দুঃখের সাধনা, তাই মিলনেও অহেতুক বিচ্ছেদাশঙ্কার বিষাদ।

(প) পূর্বরাগ থেকে ভাবসম্মিলন পর্যন্ত চণ্ডীদাস রাধার বৈরাগ্য বিধুর তপস্বিনী মূর্তি এঁকেছেন।

(ফ) চণ্ডীদাসের কাব্যে মিলনের কোনো প্রত্যক্ষ পদ নেই। প্রেমের এক অনাদ্যন্ত অতৃপ্তিকে কবি সহজ সরল অলঙ্কারহীন ভাষায় ব্যঞ্জনাগর্ভ করে তুলেছেন।

আত্ম সমীক্ষামূলক প্রশ্ন ঃ

(১) চণ্ডীদাসকে কী বিষয়ে শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়?

....

....

(২) চণ্ডীদাসের রচনার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

....

....

(৩) চণ্ডীদাস কী কী পর্যায়ের পদ রচনা করেছেন?

....

....

(৪) চণ্ডীদাসের রাধা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

....

....

১.৩.৪ বিপ্রলম্ভের কবি চণ্ডীদাসের বিশেষত্ব

চরম প্রেমের মহান কবি হলেও চণ্ডীদাস বিরহের বাণী স্রষ্টা বিপ্রলম্ভের কবি। তাঁর পদাবলিতে "করুণ মরণের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় অমর প্রেমের দীপশিখা" জ্বলে উঠেছে। দুর্লভ প্রেমের পাওয়া-না-পাওয়ার মর্মভেদী বেদনায় তাঁর কাব্য অশ্রুসিক্ত। প্রেম-যোগিনী ধ্যানমগ্না রাধার সুগভীর অনুভূতি, করুণ আবেগ ও আর্তি চণ্ডীদাসের সহজ ভূষণবিহীন ভাষায় এমন গভীর হয়ে ফুটে উঠেছে যে, তা পাঠক মাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করে। তাঁর পদাবলি যেন নিবিড় বেদন-বৈরাগ্যের একতারার সুর। তাঁর রাধা পরম প্রাপ্তিতে সুখী হয়ে বলে উঠতে পারেননি যে "চিরদুখ অব দূরে গেল"; কিন্তু সেই প্রেম-তাপসিনী "অশান্তির অন্তরে যেথা শান্তি সুমহান"-তাকে উপলব্ধি করেছেন।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই চণ্ডীদাসের পদাবলির সুর বাংলার ঘরে-মাঠে-হাটে-ঘাটে বেজে উঠেছিল। সেই চিরচেনা সুরে জেগে উঠে বাঙালি প্রথম অনুভব করেছিল "যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা"। তিনি বাঙালির প্রাণলোকের ক্রান্তদর্শী কবি। তাঁর পদাবলি যেমন বাঙালির চিত্তকে রসার্দ্র করেছে, তেমনি তা মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ও তাঁর ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রটি প্রশস্ত করে তুলেছিল।

চণ্ডীদাসের ভাষা এত সহজেই যে বাঙালির অন্তরতম স্থল স্পর্শ করে প্রেমভক্তির এত গভীর অথচ এত সহজ সরল ভাবটিকে আত্মস্থ করতে বাঙালিকে সাহায্য করেছে তার কারণ হ'ল, তাঁর ভাষা বাঙালির মুখের ভাষা, সহজ প্রাণের ভাষা। বাংলার মাটির অলঙ্কার ও মাঠের ফুলে তাঁর কাব্য সমৃদ্ধ। সহজ সরল অনাড়ম্বর অকৃত্রিম ভাষায় তিনি গভীরতম আবেগ ও হৃদয়ের নিভৃতলোকের রহস্যকে প্রকাশ করেছেন।

চণ্ডীদাস নিভৃত পল্লী বাংলার বর্ণ-বিরল সরল সৌন্দর্যের কবি। পদাবলি সাহিত্যে তিনি যে অসাধারণ কাব্যকলা সৃষ্টি করেছেন— এর জন্য না ছিল তাঁর কোন শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য, না ছিল কারুর প্রভাব। এ কেবল আপনাতে আপনি বিকশিত, 'আপনার মাঝে আপন হারা' এক স্বয়ং সম্পূর্ণ ভাব। বৈষ্ণব পদাবলিতে তাই চণ্ডীদাস স্বয়ং একটি ধারা— যে ধারার প্রকৃত উৎস রহস্যাবৃত। সহজ অনুভূতির সাহায্যে জীবনের সহজ ভূমি থেকেই হয়তো তিনি কাব্যবীজ সংগ্রহ করেছিলেন— যা গ্রামীণ মাধুর্য, আবেগের গভীরতা, দুঃখবোধের দ্যোতনায় প্রেমচেতনা ও ভক্তি ভাবুকতার অপরূপ মাধুর্যে পরিপূর্ণ। তার কাব্য শিল্পকৃতি বা সাহিত্যিক সৌন্দর্যের বাহ্যাড়ম্বর নেই। ভাব গভীরতার জন্যই তিনি সর্বজন-মনোহর। তাঁর পদাবলির সহজ সুরে মানব জীবনের দেশ কালাতীত আনন্দ বেদনার বাণী ধ্বনিত। তিনি মন্ময় কবি। তাঁর রাধার বেদনার সঙ্গে তাঁর হৃদয় বেদনার এক অবিচ্ছেদ্য আত্মিক যোগ সাধিত হয়েছে। তাঁর পদে শব্দের ঐশ্বর্য থেকেও শব্দের প্রতিভাস ইঙ্গিতে কাজ করেছে বেশি। তিনি নিজে একছত্র লেখেন, কিন্তু পাঠকের উপর ন্যস্ত করেন দশছত্র লেখার ভার। তাঁর ভাষা সহজ অথচ ব্যঞ্জনাধর্মী— পাঠকের চিত্তে এক ভাবরসঘন মূর্তি গড়ে তোলার কারিগর তিনি। শব্দের বন্ধন ছাড়িয়ে তাঁর ভাষা ভাবের স্বাধীন লোকে উর্ধ্বগামী হয়েছে মাটির প্রদীপের শিখার মতো।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ ঃ

(ক) চণ্ডীদাস বিপ্রলম্ভের কবি।

(খ) চণ্ডীদাসের কাব্যে প্রেম যোগিনী ধ্যানমগ্না রাধার সুগভীর অনুভূতি-আবেগ আর্তি এমন সহজ সরল অথচ গভীর প্রাণে বোধ থেকে ফুটে উঠেছে যে তা পাঠক মাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করে যায়।

(গ) চণ্ডীদাসের পদাবলি যেন নিবিড় বেদনার ও চরম বৈরাগ্যের সুরে বাধা।

(ঘ) চণ্ডীদাস বাঙালির প্রাণলোকের ক্রান্তদর্শী কবি।

(ঙ) মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই চণ্ডীদাসের পদাবলির সুর বাঙালিকে প্রেম ভক্তিতে এমন ভাবে জাগিয়ে তুলেছিল যে, তা মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ও তাঁর ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রটিকেই প্রশস্ত করে তুলেছিল।

(চ) চণ্ডীদাসের ভাষা বাঙালির মুখের ভাষা, প্রাণের গীতি।

(ছ) সহজ সরল অনলঙ্কৃত ভাষায় চণ্ডীদাস গভীরতম আবেগ ও হৃদয়ের নিভৃতলোকের রহস্যকে প্রকাশ করেছেন।

(জ) কোন শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য অথবা কারুর প্রভাব গ্রহণ না করেই চণ্ডীদাস অতি সহজ সুরে অসাধারণ কাব্যকলা সৃষ্টি করেছেন।

(ঝ) পদাবলি সাহিত্যে চণ্ডীদাস এক স্বয়ং সম্পূর্ণ ধারা।

(ঞ) চণ্ডীদাসের পদাবলির সহজ সুরে মানব জীবনের দেশ কালাতীত আনন্দ বেদনার বাণী ধ্বনিত।

(ট) চণ্ডীদাসের রাধার বেদনা আর কবির হৃদয় বেদনা একস্থানে একাকার হয়ে গেছে।

(ঠ) চণ্ডীদাসের ভাষা সহজ কিন্তু ব্যঞ্জনাধর্মী।

আত্ম সমীক্ষামূলক প্রশ্ন ঃ

(১) কোন পর্যায়ের কাব্য রচনায় চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ?

....

....

(২) চণ্ডীদাসের পদাবলির ভাষা কীরূপ?

....

....

(৩) চণ্ডীদাসকে বিপ্রলম্ভের কবি বলা হয় কেন?

....

....

১.৪ গোবিন্দদাস : কবি পরিচিতি

কবি গোবিন্দদাস শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। তিনি শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তার পিতার নাম শ্রীচিরঞ্জীব সেন এবং মাতা সুনন্দা দেবী। তিলিয়া বুধুরীর পশ্চিম পাড়ায় কবির বাসস্থান, এই গ্রাম বর্তমান পদ্মানদীর তীরবর্তী 'বুবোর' গ্রাম নামে খ্যাত। কবি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। কবির জন্ম হয়েছিল শ্রীখণ্ডে। শাক্ত মাতামহের আশ্রয়ে লালিত পালিত হওয়ার ফলে কবি প্রথমে শাক্ত ধর্মাবলম্বীই হয়েছিলেন। কিন্তু দৈবক্রমে কঠিন ব্যধিগ্রস্থ হওয়ায় আসন্ন মৃত্যুর জন্য অধীর হয়ে অগ্রজ রামচন্দ্রের কাছে আচার্য প্রভুর চরণ দর্শনের জন্য আকুলতা জানান। রামচন্দ্রের সহায়তায় গোবিন্দদাসের শয়নগৃহে আচার্য প্রভু উপস্থিত হয়ে তাঁর মস্তকে চরণ ছোঁয়ালে গোবিন্দদাস আনন্দে আত্মবিস্মৃত হন। পরদিন কবির দীক্ষা হয়। মৃত্যুশয্যাশায়ী গোবিন্দদাস পুনর্জীবন লাভ করেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রথম পদটি রচনা করেন এই স্বভাবকবি গোবিন্দদাস।

"ভজহুঁরে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয়চরনারবিন্দরে।
দুলহ মানুষ-জনম সৎসঙ্গে তরহ এ ভবসিন্ধুরে।।"

শ্রীআচার্য প্রভুর কৃপায় গোবিন্দদাস শ্রীগৌর-কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলি রচনায় মনোনিবেশ করেন। ক্রমে সমস্ত বাংলাদেশে তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। 'ভক্তি রত্নাকরে' প্রকাশ যে তিনি হরিনারায়ণ রাজার আদেশে 'শ্রীরাম চরিত্র গীত' বর্ণনা করেন; খেতরির রাজা সন্তোষ দত্তের অনুরোধে 'সঙ্গীতমাধব নাটক' বর্ণনা করে অতুলনীয় কাব্য শক্তির প্রকাশ করেছেন। অষ্ট কালীয় 'একান্নপদ'ও এঁর রচিত। শুধু বাংলাদেশে নয়, শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণব-মণ্ডলীও এঁর অসাধারণ কাব্য-প্রতিভায় মুগ্ধ ও চমৎকৃত ছিলেন। বৃন্দাবনবাসী থেকে প্রত্যাবর্তন-কালে কবি গোবিন্দদাস কবিবর বিদ্যাপতির শ্রীপাট দর্শন করেন ও তাঁর বহুপদ উদ্ধার করে আনেন। বুধুরীতে অবস্থান-কালে ইনি পঞ্চপল্লীর রাজা নরসিংহের এবং যশোহরের প্রখ্যাত মহারাজা প্রতাপাদিত্যের রাজাসভায় যেতেন। ১৫৩৪ শকে ইনি দেহরক্ষা করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিত্য স্মরণীয়, বন্দনীয় ও অর্চনীয় অষ্ট কবিরাজের মধ্যে গোবিন্দদাসও একজন।

পদকল্পতরুতে গোবিন্দদাসের ভনিতায় প্রায় ৪৩০টি ব্রজবুলি পদ রয়েছে। পদামৃতসমুদ্রে আরো কিছু পদ রয়েছে। 'গীতাবলী' গোবিন্দদাসের রচনা।

নিঃসন্দেহে ব্রজবুলি ভাষায় বাঙালি কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাসের পদই সর্বোৎকৃষ্ট। তিনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এঁর পদাবলি অলঙ্কার-সমৃদ্ধ। ছন্দোমাধুর্যে তাঁর পদবলি সর্বশ্রেষ্ঠ। নায়ক-নায়িকার বিলাস বর্ণনায় গোবিন্দদাসের অতুলনীয় বর্ণনাভঙ্গি লক্ষণীয়।

মৈথিল কবি বিদ্যাপতির অসমাপ্ত কয়েকটি পদকে তিনি পূর্ণ করেছেন এবং তাঁরই আদর্শে গোবিন্দদাস অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

শ্রীজয়দেবের মতো গোবিন্দদাসের পদাবলিতেও পদমাধুর্য এবং অনুপ্রাসপ্রিয়তা দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি যেন জয়দেবকেও ছাড়িয়ে গেছেন। বলা যায় যে চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণবপদাবলি সাহিত্যে গোবিন্দদাসই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে বুৎপত্তিসম্পন্ন এবং বৈষ্ণবীয় দর্শনে বিদগ্ধ পণ্ডিত কবি

তিনি। স্বাভাবিক এবং ঐশ্বরিক কবি প্রতিভার অধিকারী গোবিন্দদাস ছন্দোসঙ্গীতের বাণীশিল্পে যে অপরূপ সুন্দর কাব্যভুবন সৃষ্টি করেছেন সেই দিক থেকে তিনি জয়দেব-বিদ্যাপতির সমগোত্রীয়। তবে বিদ্যাপতির সঙ্গে তাঁর ভাবগত আত্মীয়তা বেশি। আদর্শের দিক থেকে বিদ্যাপতিকে তিনি এমনভাবে গ্রহণ করেছেন যে তাঁর পদাবলির ভাব ও ভাষার জন্য তাঁকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। গোবিন্দদাসের সমসাময়িক শ্রীনিবাস আচার্যের অপর শিষ্য বল্লভদাস কবির সম্পর্কে বলেছেন—

"ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হৈতে নহে ন্যুন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি।।"

তবে সমালোচকের মতে— "গোবিন্দ দাস বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বটে। কিন্তু বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের ভাবানুভূতির প্রকাশে, জীবনদৃষ্টির গভীরতায় ও তত্ত্বের রসসৌকর্যসাধনে ও মন্ডন কলার শিল্পদ্যোতনায় গোবিন্দদাস বহুস্থলে বিদ্যাপতির থেকেও উচ্চস্তরের কবি।"

বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণযুগ নামে পরিচিত ষোড়শ শতাব্দীতে গোবিন্দদাস হীরকখন্ডের দ্যুতি নিয়ে এসেছিলেন। বৈষ্ণব কাব্যধারার পরিণতি সাধনে গোবিন্দদাসের নাম উল্লেখনীয়। বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত গোবিন্দদাস 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' এবং, 'উজ্জ্বলনীলমণি' গভীরভাবে অনুশীলন করেছেন এবং বৈষ্ণব ভক্তিরসশাস্ত্রের আনুগত্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁর রচিত পদাবলিতে। শ্রীরূপ গোস্বামীর সঙ্গে পত্র বিনিময় এবং ষড় গোস্বামীর প্রভাবে গোবিন্দদাসের কাব্য সংস্কার গড়ে উঠেছিল।

গোবিন্দদাস নিষ্ঠাবান ভক্ত কবি, ঐকান্তিক সাধক, উৎকৃষ্ট রূপদক্ষ শিল্পী। তাই তিনি কালজয়ী পদকার। একদিকে প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য অপরদিকে তাঁর শিল্পী চেতনার মেলবন্ধন ঘটেছে বলেই তাঁর পদাবলি সৃজনশীলতার অভিনবত্বে বিকশিত হয়ে উঠেছে। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাঁর পদাবলি সংস্কৃত ভাষার সুললিত মাধুর্য ও ক্লাসিক সংহতির সুমহান গাম্ভীর্যে দীপ্যমান হয়ে উঠেছে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ ঃ

(ক) কবি গোবিন্দদাস শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য।

(খ) গোবিন্দদাসের পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন এবং মাতার নাম সুনন্দা দেবী।

(গ) গোবিন্দদাসের জন্ম মাতুলালয়ে শ্রীখণ্ডে, আর তাঁর বাসস্থান তিলিয়া বুধুরীতে।

(ঘ) শাক্ত মাতামহের কাছে পালিত হওয়ায় প্রথম জীবনে গোবিন্দদাস ছিলেন শাক্ত।

(ঙ) কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার পর গোবিন্দদাস আচার্য প্রভুর দর্শন এবং আশীর্বাদ লাভ করে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হন এবং পরে আচার্য প্রভুর কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন।

(চ) আচার্য প্রভুর কৃপায় গোবিন্দদাস শ্রীগৌর-কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলি রচনা করতে আরম্ভ করেন।

(ছ) গোবিন্দদাস বিরচিত গ্রন্থ সমূহের নাম 'শ্রীরামচরিত্র গীত', 'সঙ্গীতমাধব' নাটক, অষ্টকালীয় 'একান্নপদ', 'গীতাবলী' ইত্যাদি।

(জ) শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব গোস্বামীগণের সঙ্গে এঁর পরিচয় এবং পত্রের আদান-প্রদান ছিল।

(ঝ) বৈষ্ণব গোস্বামীগণ কর্তৃক ইনি 'কবিরাজ' বা 'কবীন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত হন।

(ঞ) গোবিন্দ দাস বিদ্যাপতির শ্রীপাট দর্শন করে তাঁর বহুপদ উদ্ধার করেন। বিদ্যাপতির কিছু অসমাপ্তপদকে ইনি পূর্ণ করেন। বিদ্যাপতি তাঁর কাব্যকলার আদর্শ। তাঁকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলা হয়।

(ট) গোবিন্দদাসের ভণিতায় প্রায় ৪৩০টি ব্রজবুলি পদ পাওয়া যায়।

(ঠ) গোবিন্দদাস সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে বুৎপত্তি সম্পন্ন এবং, বৈষ্ণবীয় দর্শনে বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' এবং 'উজ্জ্বলনীলমণি' গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেছেন।

(ড) বাঙালি কবিদের মধ্যে ব্রজবুলি ভাষায় লেখা পদের মধ্যে গোবিন্দদাসের পদই সার্বোৎকৃষ্ট। বৈষ্ণব কাব্যধারার পরিণতি সাধনে তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য।

(ঢ) গোবিন্দদাস নিষ্ঠাবান ভক্ত কবি, ঐকান্তিক সাধক এবং, উৎকৃষ্ট রূপদক্ষ শিল্পী।

(ণ) গোবিন্দদাসের পদাবলি অলঙ্কার সমৃদ্ধ এবং ছন্দোমাধুর্যে সর্বোৎকৃষ্টতার দাবি করতে পারে।

(ত) তাঁর দৈবপ্রদত্ত কবি প্রতিভার সঙ্গে মিলেছে বিদ্যাপতির আদর্শ, সংস্কৃতের সুললিত মাধুর্য ও ক্লাসিক সংহতির সুমহান গাম্ভীর্য।

(থ) ১৫৩৪ শকে গোবিন্দদাস দেহরক্ষা করেন।

আত্ম সমীক্ষামূলক প্রশ্ন ঃ

(১) গোবিন্দদাসের জীবন সম্পর্কে লিখুন।

....

....

(২) গোবিন্দদাসকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' বলা হয় কেন?

....

....

(৩) জয়দেব ও বিদ্যাপতির সঙ্গে গোবিন্দদাসের মিল কোথায়?

....

....

(৪) গোবিন্দদাসকে 'কবিরাজ' আখ্যা দিয়েছেন কে?

....

....

(৫) গোবিন্দদাসের সঙ্গে কোন গোস্বামীর পত্র বিনিময় হয়েছিল?

....

....

(৬) গোবিন্দদাস কোন ভাষায় পদাবলি রচনা করেন?

....

....

(৭) গোবিন্দদাসের পদাবলির বৈশিষ্ট্য কী?

....

....

১.৪.১ গোবিন্দদাসের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প

গোবিন্দদাস ভক্ত, সাধক এবং, রূপদক্ষ শিল্পী। নিষ্ঠাবান ভক্ত কবি তিনি। গৌরলীলা এবং রাধা কৃষ্ণলীলার পূর্বরাগ,'অভিসার, বাসক সজ্জা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা ও মাথুর প্রকৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের পদ রচনা করেছেন তিনি—

(ক) গৌরলীলা ঃ

"অপরূপ গোরা নটরাজ।
প্রকট প্রেম বিনোদ নাগর
বিহরে নবদ্বিপ মাঝ।।"

(খ) রাধা-কৃষ্ণের পূর্বরাগ ঃ

"এ সখি কাহে ভেটলুঁ নন্দনন্দনা।
মন্দির গহন দহন ভেল চন্দনা।।"
"আজু যো পেখলু হাম গোরী কিশোরী।
ত্রিভুবন থির বিজুরি কিয়ে জোরি।।"

(গ) বাসকসজ্জা ঃ

"কুলবতি চরিত পিরীতি লাগি খোঁই।
হা হা হরি করি কাননে রোই।।
পন্থ নেহারি নয়ন লয় লাগি।
টুটত রজনি বাঢ়ত অনুরাগি।।"

(ঘ) খণ্ডিতা ঃ

"শুন মাধবকোন কলাবতি সোই।
প্রেমহেম গহি আপন রঙ্গ দেই
এহেন সাজায়নি তোই।।

(ঙ) মাথুর ঃ

"হরি নহ নিরদয় রযময় দেহ।
কৈছন তেজব নবিন সনেহ।।
পাপী অক্রূর কিয়ে গুণ জান।
সব সুখ করিলেই চলু কান।।

অভিসার পর্যায়ে গোবিন্দদাস অদ্বিতীয় কবি এবং তাঁর গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে ভক্তিতন্ময়তার একক নিদর্শন। গৌবিন্দদাসের মতো রূপদক্ষ শিল্পীর ভাবের গূঢ়তা ও গাঢ়তা, আলঙ্কারিক শিল্প নৈপুণ্য, চিত্র ও সঙ্গীতধর্মিতা এই পর্যায়গুলিতে অসাধারণ ও অনুপম কাব্য গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

গোবিন্দদাস সৌন্দর্যের কবি। কবি মাত্রেই সৌন্দর্যের পিয়াসী, বিশ্বের রঙ-রস-রূপকে ছেঁকে নিয়ে গঠিত হয় তাঁর মানস প্রতিমা, সৌন্দর্যের ইন্দ্রধনু দিয়ে রচিত হয় তাঁর কাব্যের ভুবন। বৈষ্ণব কবিরা এই সৌন্দর্য প্রতিমা গঠন করেছেন, কিন্তু স্বয়ং সেই সৌন্দর্য-প্রতিমার প্রেমপাশে বদ্ধ না হয়ে তাঁকে 'ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়েৎ' বলে আরাধ্য কৃষ্ণের পদেই নিবেদন করেছেন। গোবিন্দদাস ই সৌন্দর্যকে কেবল দুচোখ দিয়ে নয়— সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। তাই তাঁর রাধা তাঁর মানস লোকের পুঞ্জীভূত সৌন্দর্যের সমাহারে গঠিতা। সেই রাধা অলৌকিক এবং অপরূপা—

"যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনুজ্যোতি।
তাহাঁ তাহাঁ বিজুরি চমকময় হোতি।।
যাহাঁ যাহাঁ অরুণ চরণ চল চলই।
তাহাঁ তাহাঁ থলকমলদল খলই।"

গৌবিন্দদাসের কৃতিত্ব এই যে তিনি ভক্তি ও রূপের মধ্যে নিবিড় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। তাঁর কাব্যের অমরাবতী রচিত হয়েছে ভাষার ঐশ্বর্য ও অলঙ্কৃতি, ছন্দের ঝঙ্কার, ভাবের গভীরতা ও গাম্ভীর্যের দ্বারা। তাঁর সৌন্দর্য চেতনার বাহ্যিক রূপের সঙ্গে হৃদয়ের গভীর অনুভূতি মিশে রসঘন শিল্প পরিণতি দান করেছে তাঁর পদাবলিকে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রকল্পে তত্ত্ব ও সৌন্দর্য, মানবিক ভাবানুভূতি এবং আধ্যাত্মিকতা অপরূপ বাণীমূর্তি লাভ করেছে। কাহিনি ও নাট্যরসের সমন্বয়ে তাঁর কাব্যে গতিশীলতা ও স্বাদবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। এই নিপুণ মনস্তাত্ত্বিক শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিখুঁত আলেখ্য রচনা করেছেন তিনি পদাবলি সাহিত্যে।

গোবিন্দদাস একাধারে ক্লাসিক ও রোমান্টিক কবিপ্রতিভার অধিকারী। গঠন পরিপাট্যে তাঁর পদে ক্লাসিক শিল্পীরীতির নিদর্শন মেলে; ভাবের বাণীমূর্তি নির্মাণে তিনি শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কার প্রয়োগে ধ্রুপদী শিল্পরীতির নিদর্শন রেখেছেন। কাব্যের কায়াগঠনে ক্লাসিক সংযম, দৃঢ়তা ও স্পষ্টতা ভাস্কর্য শিল্পের মতো অটল গাম্ভীর্যে মহীয়ান তাঁর রচনায়। কাব্যের রূপনির্মাণে তিনি নিরাসক্ত জীবনদৃষ্টির অধিকারী। ভাষার ঐশ্বর্যে, ধ্বনিগাম্ভীর্যে, ভাবের গাঢ়তায় তাঁর রচনা ক্লাসিক রীতির অনবদ্য রূপ ধরেছে—

"শিথিল ছন্দ নিবিক বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
বিগলিত বেণি লোলনি।।"

অন্যদিকে তাঁর রচনায় অন্তর্লীন হয়ে আছে কল্পনা কুশলতার রোমান্টিক উল্লাস অনুভূতি—

"যাকর চরণ নখর রুচি হেরইতে
মুরছিত কত কোটি কাম।
যো মঝু পদতলে ধরণি লোটায়ল
পালটি না হেরলুঁ হাম।।"

কাব্যের রূপ নির্মাণে গোবিন্দদাস চিরকাল বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বের নির্দেশ অনুসরণ করেছেন। বৈষ্ণব সাধক তিনি, তাই মঞ্জরী ভাবের সাধক হলে কিছু কবিতায় আত্মগত ভাবানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত উৎসার ঘটেছে তাঁর। সেখানে রাধার হৃদায়ানুভূতির সঙ্গে কবির হৃদয় একাত্ম হয়ে গেছে— যেখানে এই মহামিলন সাধন হয়েছে সেসব কবিতাই ভাবাবেগের রহস্য ও সঙ্গীতময়তার গুণে রোমান্টিক হয়ে উঠেছে।

গোবিন্দদাস মূলত চিত্ররসের কবি। তাঁর ভক্তির আবেগ আকুলতা চিত্ররূপে সংহত রূপ নিয়েছে। বস্তু এবং চিত্রের মধ্যে যে দূরত্ব ভক্তি ও কাব্যের মধ্যেও সেই দূরত্ব সীমারেখা টেনে কবি সাফল্য লাভ করেছেন— এ তাঁর গভীর শিল্প চেতনারই প্রমাণ। তাঁর কাব্যে সঙ্গীত যেমন চিত্রের বাহন তেমনি নাট্যরসও চিত্রসৌন্দর্যের সহায়ক হয়েছে—

"অন্তরে আওয়ে আষাঢ়।
বিরহিনি বেদনা বাঢ়।।
বার ফুল্লিত বল্লি তরুবর
চারু চৌদিশে সঞ্চরে।
ও তাপে অপিত ধরনি-মাজরি
নিরখি নব নব জনধরে।"

চিত্রসৃষ্টির বহু পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে প্রধান-প্রত্যক্ষ চিত্র অলঙ্কার প্রধান চিত্র। গোবিন্দদাস এক্ষেত্রে সব্যসাচীর মতো উভয় শ্রেণির চিত্র রচনায় সমান দক্ষতা অর্জন করেছেন।

অলঙ্কারের মৌলিকতায় ও অভিনবত্বে গোবিন্দদাস সাধারণভাবে প্রাচীন সংস্কৃত কবিকুল এবং বিশেষভাবে বিদ্যাপতির আদর্শ অনুসরণ করেছেন।

ভাষাচিত্র অঙ্কনে— প্রত্যক্ষ চিত্রাঙ্কনে কবি পরিণত শিল্পী।

ইন্দ্রিয়ালু কামনার অতিরেক অথবা বুদ্ধিমার্জিত সংক্ষিপ্ত ঔজ্জ্বল্য গোবিন্দদাসের চিত্ররচনার উপকরণ নয়, তাঁর ক্ষেত্রে চিত্ররস আস্বাদনের পেছনে যে রূপ সম্ভোগের বাসনা— তা এতই দেহভাবনাবিচ্যুত যে আমাদের আশ্চর্য হতে হয়। এর পেছনে রয়েছে একদিকে শিল্পীসুলভ বিস্ময়কর নিরাসক্তি এবং অপরপক্ষে কবির প্রৌঢ়ত্বের মার্জিত রুচিশীলতা। এই শৈল্পিক নিরপেক্ষতার সিদ্ধির প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সৃষ্ট রাধা বা কৃষ্ণ চরিত্রের সঙ্গে আত্মলীন হবার বাসনায়।

যে রূপাসক্তি বৈষ্ণবের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ তার মূলে রয়েছে রসের সাধন। এদিক থেকে গোবিন্দদাসের পদ আস্বাদনীয়।

গোবিন্দদাস অভিজাত এবং মার্জিত রুচিসম্পন্ন কবি। ভাষার ঐশ্বর্য ও অলঙ্কৃতি, ভাবের গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য, ছন্দের বিত্ত ও নৃত্য দ্বারা তিনি তাঁর রূপলোক নির্মাণ

করেছেন। তাঁর ভাষায় রয়েছে তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দের আধিক্য— তাই তাঁর কৃত্রিম ব্রজবুলি ভাষাও সুকোমল, শ্রুতিমনোহর, স্পন্দনশীল হয়ে উঠেছে। তাকে তিনি আপন মনের খেয়ালে নানা ছন্দে, নানা পর্বে, নানাবিধ মিলে সাজিয়ে বিচিত্র ধ্বনিমাধুর্যের সৃষ্টি করেছেন এবং এই ধ্বনিমাধুর্যের দ্বারাই তিনি যুগ যুগান্তর ধরে শ্রোতাকে সহজে মুগ্ধ করেছেন—

"ভালে বনি আওত মদনমোহনিয়া।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম
রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন নাচনিয়া।।"

এর উপর রয়েছে তাঁর সঙ্গীত গুণ। যদিও খাঁটি অর্থে তিনি লিরিক কবি নন, তথাপি সঙ্গীতের অবিচ্ছিন্ন স্রোতোধারায় একেবারে ডুবিয়ে দিতে তাঁর জুড়ি নেই—

"আজু বিপিনে যাওত কান
মুরতি মূরত কুসুমবাণ
জনু জলধর রুচির অঙ্গ
ভঙ্গি নটবর শোহনি।"

অপরের লীলারসকে বেদনার সকরুণ আর্তিকে তিনি প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সর্বত্র তার সঙ্গে কবি নিজেকে একাত্ম করে ফেলেননি। ফলে তাঁর পদাবলিতে এসেছে নাটকীয়তা ও চিত্রধর্মিতা।

গোবিন্দদাসের কাব্যের মূল কথা দুর্বার গতিবেগ। এই গতি ও বেগের ক্ষেত্রে তাঁর কবি প্রতিভা এক স্বাভাবিক স্ফূর্তি খুঁজে পায়। তাঁর রচিত পদাবলির অভিসার পর্যায়ে রয়েছে তার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত—

"ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার।"

অভিসারের পদে গোবিন্দদাস রাজাধিরাজ। এই অতুলনীয়তার কারণ হল কবির স্বকীয় প্রতিভা ধর্ম— তাঁর চলিষ্ণুতা, ও চিত্ররস রসিকতা এবং পরোক্ষ অভিজ্ঞতা রস। তাঁর নিজ কবি ধর্ম কাব্যের রূপ নির্মাণে শক্তি দিয়েছে এবং শ্রীচৈতন্য-জীবনের অপূর্ব অভিজ্ঞতা সেই শক্তিকে সার্থকতার পথ দেখিয়েছে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ ঃ

(ক) গোবিন্দদাস নিষ্ঠাবান ভক্ত কবি, তপস্বী সাধক এবং রূপদক্ষ শিল্পী।

(খ) গৌবিন্দদাস গৌরলীলা-সহ রাধা-কৃষ্ণ লীলার বিচিত্র পর্যায়ের পদ রচনা করেছেন।

(গ) গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ এবং অভিসার পর্যায়ে গোবিন্দদাসকে শ্রেষ্ঠ কবি বলা যায়।

(ঘ) গোবিন্দদাসের ভাবের গাঢ়তা, আলঙ্কারিক শিল্পনৈপুণ্য, ছন্দোলালিত্য এবং চিত্র ও সঙ্গীতধর্মিতা অসাধারণ ও অনুপম।

(ঙ) গোবিন্দদাস সৌন্দর্যের কবি— সেই সৌন্দর্য কেবল দৃষ্টির নন্দন নয়, তা হৃদয় বেদ্য।

(চ) গোবিন্দদাসের রাধা তাঁর মানসলোকের পুঞ্জীভূত সৌন্দর্যের সমাহারে গঠিত হয়ে অলৌকিক এবং অপরূপ হয়ে উঠেছেন।

(ছ) ভক্তি ও রূপের মধ্যে গোবিন্দদাস নিবিড় ঐক্যসাধন করেছেন।

(জ) তাঁর সৌন্দর্যচেতনার বাহ্যিক রূপের সঙ্গে হৃদয়ের গভীর অনুভূতি মিলে তাঁর পদাবলি সাহিত্যকে অসাধারণ শিল্প পরিণতি দান করেছে।

(ঝ) প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রকল্পে তত্ত্ব ও সৌন্দর্য, মানবিক ভাবানুভূতি ও আধ্যাত্মিকতা এনেছেন তিনি।

(ঞ) কাহিনি ও নাট্যরসের সমন্বয়ে তাঁর কাব্যে গতিশীলতা ও স্বাদবৈচিত্র্য এসেছে।

(ট) গোবিন্দদাস একাধারে ক্লাসিক ও রোমান্টিক কবি প্রতিভার অধিকারী।

(ঠ) কাব্যের রূপ নির্মাণে গোবিন্দদাস বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বের নির্দেশ মেনেছেন।

(ড) গোবিন্দদাস মূলত চিত্ররসের কবি।

(ঢ) অলঙ্কারধর্মী চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে গোবিন্দদাস প্রাচীন সংস্কৃত কবিকুল ও বিশেষত বিদ্যাপতির আদর্শ-অনুসারী।

(ণ) ভাষাচিত্রাঙ্কণে গোবিন্দদাস পরিণত শিল্পী।

(ত) শিল্পীসুলভ বিস্ময়কর নিরাসক্তি ও প্রৌঢ় কবির মার্জিত রুচিশীলতা নিয়ে গোবিন্দদাস কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

(থ) গোবিন্দদাসের ভাষায় তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দের আধিক্য রয়েছে।

(দ) তাঁর কাব্যের আসল প্রাণমূল হল তাঁর ধ্বনিমাধুর্য।

(ধ) সঙ্গীতগুণও তাঁর পদাবলির মূলে রয়েছে।

(ন) গোবিন্দদাসের কাব্যের মূল কথা গতিবেগ।

(প) কবির স্বকীয় প্রতিভাধর্ম— তাঁর চলিষ্ণুতা ও চিত্ররস-রসিকতা এবং পরোক্ষ অভিজ্ঞতা রস তাঁর পদাবলিকে করে তুলেছে অনুপম।

আত্ম সমীক্ষামূলক প্রশ্ন ঃ

(১) গোবিন্দদাস পদাবলি সাহিত্যের কোন্ কোন্ পর্যায়ের পদ রচনা করেছেন?

....

....

(২) কোন পর্যায়ে গোবিন্দদাস শ্রেষ্ঠ পদকর্তা?

....

....

(৩) গোবিন্দদাসের কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য কী?

....

....

(৪) গোবিন্দদাস একাধারে ক্লাসিক ও রোমান্টিক কবি— কবি প্রতিভার কোন বৈশিষ্ট্য এ-কথাকে সত্য প্রমাণিত করেছে আলোচনা করুন।

....

....

(৫) গোবিন্দদাসের পদাবলির মূল বৈশিষ্ট্য কী?

....

....

১.৪.২ গোবিন্দদাসের পদাবলির বিচার ও বিশ্লেষণ

নিষ্ঠাবান ভক্ত কবি ও সাধক গোবিন্দদাস বৈষ্ণব ধর্ম-সম্প্রদায়ের অনুর্ভুক্ত এবং প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্যের প্রত্যক্ষ শিষ্য। কাব্য তত্ত্ব ও রসতত্ত্বের সঙ্গে তিনি কেবল যে পরিচিত তাই নয়, তত্ত্বজ্ঞানেও তিনি প্রাজ্ঞ।

সৌন্দর্য সাধনার সজ্ঞান অনুশীলন করেছিলেন গোবিন্দদাস। তাঁর সৃষ্ট রাধা তাঁর কল্পনালোকের তিল তিল সৌন্দর্যের সমাহারে গঠিতা। অথচ এই রাধা লৌকিক জীবনের কোনো মানবী নয়, সে অপূর্বসুন্দর অনুপম এক অধরামাধুরী যাতে কবি ধরেছেন ছন্দোবন্ধনে।

সৌন্দর্য সাধনা কবিকে স্থপতি ভাস্করের সাফল্য এনে দিয়েছে। এবারে আমরা তাঁর রচিত পদাবলি সাহিত্য অবলম্বনে তাঁর সাফল্য আলোচনা করব। গোবিন্দদাস শ্রীচৈতন্যকে প্রত্যক্ষ করেননি। কিন্তু কবি মানস দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্যের ভাব মূর্তি অঙ্কন করেছেন, তা কল্পনার ঐশ্বর্যে, ভাবের গাঢ়পিনদ্ধতায়, ছন্দের ঝঙ্কারে ও আলঙ্কারিক ঘটন শৈলীতে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনার থেকেও চৈতন্যস্বরূপের অতি উচ্চাঙ্গ ব্যাখ্যা। দিব্য ভাবচঞ্চল মহাপ্রভুর অন্তর্জীবনের নিখুঁত লীলাচিত্র কবি দক্ষ সচেতন শিল্পীর মতো ধীর স্থির তুলির টানে অতীব বর্ণাঢ্য ও সুস্পষ্ট করে তুলেছেন—

"নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব।।"

মহাপ্রভুর শান্তপুণ্য করুণাঘন দিব্য জীবন ও তাঁর প্রেমাদর্শ রূপে রসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এই কবিতায়।

"কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধনী তীরে উজোর।।"

শ্রীচৈতন্যর মানবিক ও দিব্য রূপ, শ্রীচৈতন্য সম্পর্কিত বৈষ্ণবীয় ধারণার তত্ত্বাদর্শ গোবিন্দদাসের লেখনীতে অনুপম কবিত্বমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। মহাপ্রভুর দেহলাবণ্য, ব্যক্তিত্ব, অন্তরের সমস্ত করুণার পুঞ্জীভূত প্রতীক জলভরা দুটি চোখ আর প্রেমোপলব্ধির আত্মবিস্মৃত বিহ্বলতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রের সংযোগে একটি পরিপূর্ণ মূর্তি ধারণ করেছে গোবিন্দদাসের পদে। শ্রীগৌরাঙ্গ পদে গোবিন্দদাসের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন জাগে না। শ্রীচৈতন্য রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ, এটিই তাঁর অন্তরঙ্গ মূর্তি ও অবতারী স্বভাব-আত্মভাবাস্বাদনে একান্ত বিলাস-সুখময় এই চৈতন্যমূর্তি অঙ্কনে গোবিন্দদাসের সাফল্য প্রশ্নের অতীত। অপরদিকে রয়েছে শ্রীচৈতন্যের ভুবনমঙ্গল অবতাররূপ— যিনি পতিতোদ্ধারক, কলিকলুষনাশী, নাম গঙ্গাধর পুরুষ-তাঁর সম্পর্কে গোবিন্দদাসের পদে আছে—

> "গৌরাঙ্গ করুণাসিন্ধু অবতার।
> নিজগুনে গাঁথিয়া নাম চিন্তামণি
> জগজনে পরাইল হার।।"

গোবিন্দদাস গৌরাঙ্গরূপের সবচেয়ে মোহন ও কোমল প্রতিক্রিয়া ক্ষেত্রটি বেছে নিয়েছেন- নারীর হৃদয়— সে হৃদয় লুণ্ঠন করে অতঃপর সোনার গৌরাঙ্গ অনিবার্যভাবে নদীয়া-নাগরে পরিণত হন।

দেবতার মূর্তি যে শ্রদ্ধা নিয়ে ভক্তশিল্পী তিল তিল করে গড়ে তোলেন, সেই শ্রদ্ধার দ্বারাই গোবিন্দদাস তাঁর রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ রচনা করেছেন।

রাধাকৃষ্ণের লীলার ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, গোবিন্দদাসের রাধা এবং কৃষ্ণ পরস্পর সাক্ষাতের পর উভয়ে উভয়ের রূপে বিভোর। রাধার অঙ্গে অঙ্গে বিদ্যুতের জ্যোতি আর প্রতি পদক্ষেপে প্রফুল্ল পদ্মের বিকাশ দেখেন গোবিন্দদাসের কৃষ্ণ।

> "যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনুজ্যোতি।
> তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোতি।।
> যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই।
> তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই।।"

রূপানুরাগের পদে গোবিন্দদাসের প্রতিভা অতুলনীয়। কবির বর্ণনা নৈপুণ্যে শ্রীরাধিকা সৌন্দর্যের ভাবপ্রতিমা; কবির সমগ্র কাব্য সাধনার মূলে রয়েছে এই তীব্র রূপাসক্তি। রূপকে তিনি কোথাও ত্যাগ করতে পারেননি। বৈষ্ণবের মূল কথা— "রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর"। তাঁদের সাধনা বৈরাগ্যের সাধনা নয়— রাগের, জ্ঞানের নয়— রসের। বৈষ্ণবদের সম্পূর্ণ অহংলয়ের সমান্তরালে থাকে রূপমুগ্ধতা। গোবিন্দদাস ভক্ত এবং বিদগ্ধ কবি, বৈষ্ণবদর্শনের অন্যতম বোদ্ধা। তাঁর ভক্তি যতই বেড়েছে 'যতই তিনি সাধনস্তরে উন্নীত হয়েছেন' ততই ওই রূপমুগ্ধতা এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা প্রবল হয়ে তাঁর রূপসাধনাকে সম্পূর্ণতার পথে এগিয়ে দিয়েছে।

কবির অলঙ্কার প্রিয়তার মূলে রয়েছে তাঁর আভিজাত্য এবং ঐশ্বর্যবোধ। এ ভক্তিরই আর একটি দিক। অপ্রাকৃত মিলন লোক এবং প্রাকৃত মনোলোকের ব্যবধান বিস্তৃত করতে তিনি কেবলই অলঙ্কারের পর অলঙ্কারের সজ্জা করেছেন। তাঁর ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কারের বিশেষ প্রকৃতির সহায়তায় কবি রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত মিলনলীলায় প্রাকৃতজনকে দৃষ্টি মেলবার অবসরটুকু দিয়েছেন।

বৈষ্ণব পদাবলি আনন্দলোকের সাহিত্য। ভালোবাসা রহস্যের এরূপ গূঢ়ভেদ আর কোন দেশের সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ। আসল কথা, "বৈষ্ণব ধর্ম্ম যুগব্যাপী জাতীয় তপস্যার ফল"। প্রেমের নানা লীলা হতেই অলঙ্কারশাস্ত্রের সূত্র রচিত হয়েছে। বঙ্গীয় পদসমূহে এই লীলাময় ভাব ভক্তি বিধৌত হয়ে স্বর্গীয় ভালোবাসার উপাদান হয়েছে, তাদের উর্দ্ধোন্মুখ গতি ও নিষ্কাম আবেগ বিলাসকলা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

গোবিন্দদাসের পদে প্রেমের সঙ্গে ভক্তি মিশ্রিত হয়েছে। সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলিতে তাই তপস্যা এবং আত্মসমর্পণই ভক্তের অবলম্বন। গোবিন্দদাসের পদে তাই পূজা মূর্তি ধরে প্রেম দেখা দিয়েছে কঠিন তপস্যার দুঃসহ দুঃখের হোমানলের উজ্জ্বল আলোয়।

ভাষা ভাবের বাহন। চিত্র এবং সঙ্গীত সেই ভাবকে গতি দান করে। ভক্ত কবি গোবিন্দদাসও এই তিনের সহায়তায় তাঁর পদাবলিতে তপস্যার পথে অগ্রসর হয়েছেন।

গোবিন্দদাসের কবি প্রাণের মূলে রয়েছে তাঁর স্বাভাবিক ভক্তি প্রাণতার একটি দিক— রূপানুরাগ। পদাবলির সমস্ত পর্যায়ের তাঁর এই রূপের প্রতি পরমাসক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়।

মহাপ্রভুর যে ভাবমূর্তি গোবিন্দদাস তাঁর গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে অঙ্কন করেছেন তাতেও আমরা পাই এই রূপানুরাগের দর্শন।—

"পুলক বলিত অতি ললিত হেম-তনু
অনুখন নটন বিভোর।
কত অনুভাব অবধি না পাইয়ে
প্রেমসিন্ধু বহ নয়নহি লোর।।"

শ্রীচৈতন্যের ভাবাবস্থার পূর্ণাঙ্গ বর্ণন এবং তাত্ত্বিক উপস্থাপনে সর্বাপেক্ষা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন গোবিন্দদাস।—

"জয় নন্দ-নন্দন গোপী-জন-বল্লভ
রাধানায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন নদীয়া পুরন্দর
সুরমুনি গণ মন মোহন ধাম।।"

সমালোচকের ভাষায়—

"বৈষ্ণব রূপতান্ত্রিক ও দেহতান্ত্রিক। সে গান গাহিয়াছে কণ্ঠে, রূপ দেখিয়াছে নয়নে, এবং দেহ সাঁপিয়াছে নৃত্যে।.....দৈহিকতাকে সে যে দেহারতি করিতে পারিয়াছে, সে কেবল দেহদানের পিছনকার প্রেমের ঐকান্তিকতার দ্বারাই নয়, —ঐ দেহকে সুন্দররূপে অর্চনা এবং পবিত্র অর্ঘ্যরূপে অর্পণ করার সুষমাতেও বটে। .....'আমার এই দেহখানি তুলে ধর, তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর'— বৈষ্ণব তাহার ধর্মে ও সাধনায় এ কথাটি প্রমাণের নেশায় মাতিয়াছিল।" তাই গৌরাঙ্গ সুন্দরের প্রেমঘন ভাবতরঙ্গ সিন্ধু দর্শন করে অথবা রাধার দুঃসহ প্রেম তপস্যা অবলোকন করে পদকর্তাগণ নিজের অজান্তেই সেই ভাবের অন্তরঙ্গ হয়ে বলে উঠেছেন— "মোর ফাটি যায় হিয়া।"

তবে পদাবলি সাহিত্য পর্যালোচনা করলে শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পদকর্তাদের পদে প্রেমের একাত্মতা আর ভক্তির একনিষ্ঠতার পার্থক্যটি সহজেই ধরা পড়ে। এই ভক্তির একনিষ্ঠ রূপ আমরা দেখি গোবিন্দদাসের মধ্যে।

পদাবলি সাহিত্যে গোবিন্দদাস রাধার রূপমুগ্ধতা এমন অপরূপ ভাষায় প্রকাশ করেছেন যে তা মন মুগ্ধ করে।

গোবিন্দদাসের পদে রাধা-কৃষ্ণের পূর্বরাগও রূপানুরাগের পর্যায়েই পড়ে। রাধা এবং কৃষ্ণ পরস্পর সাক্ষাতের পর থেকেই উভয়ে উভয়ের রূপে বিভোর। তবে এই বিভোরতা গোবিন্দদাসের রাধাকে যোগিনী করেনি, বরং—

"লোচনহি শ্যামর বচনহি শ্যামর
শ্যামর চারু নিচোল।
শ্যামর হার হৃদয়ে মণি-শ্যামর
শ্যামর সখী করু কোর।।"

যৌবন ধর্মানুযায়ী শ্রীরাধা শ্যামের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যতই আকুল হন না কেন, প্রথম মিলনকালে তিনি ভীতা শঙ্কিতা।—

"ধরি সখী আঁচরে ভই উপচঙ্ক।
বৈঠে না বৈঠয়ে হরি-পরিযঙ্ক।।
চলইতে আলি চলই পুন চাহ।
রস অভিলাষে আগোরল নাহ।।"

প্রথম মিলনের সঙ্কোচ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে রাধার আর মিলনপথে কোনো প্রতিবন্ধকতা রইল না। তাঁর মিলন-বাসনা এরূপ দুর্বার হয়ে উঠল যে, ঝড় বৃষ্টি, বজ্রানল, অন্ধকার, বিরুদ্ধ প্রকৃতি— কিছুই রাধা আর গ্রাহ্য করেন না। এই পর্যায় অভিসারের। এই অভিসারের পদ রচনায় গোবিন্দদাস শুধু শ্রেষ্ঠ নন, তিনি রাজাধিরাজ। এর কারণ কবির স্বকীয় প্রতিভাধর্ম— তাঁর চলিষ্ণুতা ও চিত্ররস-রসিকতা এবং পরোক্ষ অভিজ্ঞতা রস।

অভিসারের কল্পনা মৌলিক নয়। সৃষ্টির আদি মুহূর্ত থেকে বিবর্তনের পথে মানবজীবনের অগ্রগতির সঙ্গে অভিসারের পরিকল্পনার এত ঘনিষ্ঠতা যে, যা কিছু দীর্ঘ কৃচ্ছ্র সাধনায়, লভ্য, সংগ্রামে অঙ্গীকার্য তাকেই আমরা অভিসার তথা জীবনাভিসার বলি।

অভিসারের মধ্যে আছে এক অনিবার্য প্রাণাবেগ, সুদুর্জয় আত্মবিশ্বাস, অতন্দ্র সাধন-দীপ্তি, অপরিসীম উৎকণ্ঠার যন্ত্রণাময় আকুতি; তা কেবল প্রেম-লীলা বৈচিত্র্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, অনন্তের জন্য অন্তহীন পদক্ষেপ অভিসারের রূপ ধরেছে।

বৈষ্ণব লীলাবাদী, সে কোথাও থামেনি, চলতে চলতে সে তার কৃষ্ণ সন্ধান করে। পথও তার, পরমও তার।

গোবিন্দদাসের অভিসার পদে অলঙ্কার শাস্ত্র-সম্মত নানা অভিসারিকা ভেদের চিত্র আছে। কিন্তু কেবল এই বৈচিত্র্য সৃষ্টিই নয়, কবি তাদের করে তুলেছেন কাব্য। এই পদে গোবিন্দদাস-সিদ্ধ চিত্রধর্ম ও নাটকীয়তা এবং সঙ্গীত হিল্লোল আমরা প্রত্যক্ষ করি।

অভিসারের সাধনা বাস্তবের সাধনা। তার কষ্ট মানস-সৃজিত নয়, তা অনেকাংশেই লৌকিক কষ্ট। সেই কষ্ট কাব্যরূপে যখন ধরা দেয়, তখন তাতে নাটকীয়তা থাকাই স্বাভাবিক। গোবিন্দদাসের অভিসারের পদে আমরা এক ধারাবাহিতা দেখতে পাই। রাধার অভিসার যাত্রার প্রস্তুতি থেকে শুরু করে সারা বছরে ঋতুচক্র-ভেদে বিচিত্র রূপিণী রাধার বিচিত্র অভিসার এবং অভিসার-শেষে দয়িত কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত মিলন-ধন্যা রাধার কষ্ট ও বেদন-বর্ণনা। গোবিন্দদাস রচিত অভিসার পর্যায় যেন এক স্বয়ং সম্পূর্ণ কাব্য হয়ে উঠেছে। এই পর্যায়ে রাধার অভিসারকে কেন্দ্র করে আমাদের পদরসাস্বাদন অনুসন্ধানের পথ ধরে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, —একটি পথ যায় সাধনমার্গে, যেখানে দুর্লভ শ্রেয়কে পাবার আকুলতায় ইন্দ্রিয়গত সুখ ছেড়ে মন চলে যেতে চায় পরমার্থের সন্ধানে— যেখানে "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং" পথে শুধু দুঃখ-বাধা-কষ্ট-বিপত্তিকে লঙ্ঘন করবার প্রয়াস; আর একটি পথ টেনে আনে আমাদের ঘরের সীমানার মধ্যে যেখানে শুধু বন্ধন— পরিবারের, সমাজের, বিরুদ্ধ প্রকৃতির। তাই অভিসারের তাৎপর্যে আমরা খুঁজে পাই "একাধারে তুমি আকাশ, তুমিই নীড়"— এর সন্ধান।

অভিসারের বিচিত্র পর্যায় আছে— অভিসারের উৎকণ্ঠা, অভিসারের প্রস্তুতি ও বিভিন্ন সময়ে অভিসারের বর্ণনা।

বৈষ্ণব পদাবলিতে শ্রীরাধার অভিসারের প্রাধান্য বেশি। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য গাঢ় অনুরাগিণী রাধার অন্তরে জেগেছে অন্তহীন ব্যাকুলতা। দুর্লভ প্রেম হয়ে ওঠে দুরন্ত প্রেম।—

"এ সখি রসময় অন্তর যার।
শ্যাম সুনাগর গুণাগুণ-সাগর
কো ধনী বিছুরই পার।।"

তাই সব বাধাকে অগ্রাহ্য করে সমস্ত বন্ধন কাটিয়ে অভিসারের পথে নামার প্রস্তুতি নিয়েছেন রাধা—

"কণ্টক গাড়ি কমলসম-পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।"

এই প্রস্তুতির শেষে রাধার যাত্রা শুরু অভিসারে। দিবসের বিচিত্র ভাগে, বিভিন্ন ঋতুতে অভিসারিণী রাধার বৈচিত্র্যময় সজ্জা। রূপের পূজারী গোবিন্দদাস "যতনে, কুসুম-রতনে" চন্দনে-কুমকুমে-কেয়ূরে-কঙ্কণে-প্রাণভরে সাজিয়েছেন রাধাকে। তেমনি বিরুদ্ধ প্রকৃতিকেও করে তুলেছেন প্রাণময়। এই প্রকৃতি যেন সজীব প্রতিবন্ধকতা। রাধার বর্ষাভিসারে গোবিন্দদাসের গভীর আবেগ বর্ষাধারার মতো নেমে এসেছে— কারণ দুর্যোগের রাতের শঙ্কাকে উপেক্ষা করে প্রেমের পথে শ্রেয়ের জন্য যাত্রায় যেমন আছে গভীরতা, তেমনি আছে বৈচিত্র্য। সর্বাধিক ভীতি ও সর্বাধিক প্রীতি— এই উভয়কে জয় করলে তবেই-না চরম প্রাপ্তি। পথ কত দুর্গম, সিদ্ধি কত কঠিন, বিঘ্নবিপদ বাধা-বন্ধ কত সুদুস্তর, কবি তা স্মরণ না করিয়ে পারেন না। বিরূপ বিশ্ব প্রকৃতি, বর্ষা এসেছে ঝেঁপে—

মেঘের গুরুগুরু গরজনে উতলা ধরণী— উতলা মন— আশঙ্কায় দোলে আর আশায় ভোলে, আশ্বাসে কাঁপে আর নৈরাশ্যে ভাঙে। এর মধ্যেই গোবিন্দদাস এক সুন্দর নাটকীয় অবকাশ তৈরি করেছেন শঙ্কিতা সখি ও অশঙ্কিনী রাধার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। এ যেন নাটকের সংলাপ। ঘোরতর দুর্দিনে ভীতা শ্রীমতীর সখি—

"মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।
তহিঁ অতি দূরতর বাদল দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল।।
সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।"

কিন্তু প্রেম তো সামান্য গতিবেগময় নয়। তাই শঙ্কিতা সখিকে প্রবোধ দিয়ে রাধার সুদৃঢ় আত্মঘোষণা।—

"কুল মরিয়াদ কপাট উদ্‌ঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিয়াদ সিন্ধু-সঞে পঙারলুঁ
তাহে কি তটিনি অগাধা।।"

শুধু শব্দ বন্ধনের মধ্যে এই দুর্জয় পথ-চলা গোবিন্দদাস যেভাবে তুলে ধরেছেন তা তুলনাহীন। শুধু-তাই নয়, প্রকৃতির এত নিবিড় বর্ণনা, বিশেষত বর্ষা ঋতুর মেঘে মেঘে জল ছলোছলো আঁখি মেলে প্রকৃতির ও হৃদয়ের অশ্রুভরা বেদনাকে এত নিবিড় গভীর ভাবে কেবল শব্দের মধ্যে ধরে রাখা গোবিন্দদাসের মতো প্রথম শ্রেণির কবির পক্ষেই সম্ভব।

অলঙ্কার মাঝে পরে মিলনে আড়াল আনতে পারেনি গোবিন্দদাসের কাব্যে। তাঁর পদাবলির দ্যুতিময় অলঙ্কারের মাঝখানে উঁকি দেয় হৃদয়-কৌস্তুভমনি। এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

বিঘ্নজয়ী অভিসার-পথ-চলার তপস্যার শেষে প্রিয়-মিলন-ধন্যা রাধা পথাতিক্রমণ বর্ণনা করছেন কৃষ্ণের কাছে। ভাবগৌরব, শব্দচিত্র, নাটকীয় গতিবেগ, অনুভূতির আলোকে মেশা সেই বর্ণনা—

"মাধব কি কহব দৈব বিপাক।

....

একে কুলকামিনী তাহে কুহুযামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝরঝর
হাম যাওব কোন পুর।।"

বলা বাহুল্য, গোবিন্দদাস ব্যতীত অভিসারিকার পথ-চলা এমন করে এত অল্পে এত অব্যর্থভাবে আর কেউ ফোটাতে পারেননি। এ পথ যেন আমাদের স্বচক্ষে দেখতে পাওয়ার অনুভূতি নিয়ে আসে। কত যুগের কত পথচলার স্মৃতিতে মন ভরে ওঠে।

ভক্ত কবি গোবিন্দদাস সমস্ত সম্ভাব্য বাধার কথা রাধার অভিসার পথে এনে তার বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। তাঁর চিত্রের মধ্যে সংহত হয়েছে ভক্তির আবেগ-আকুলতা।

গোবিন্দদাসের যে কয়েকটি রাসলীলার পদ আছে, বৈষ্ণব সাহিত্যে তা অনুপম। আনন্দ নয়, সুখ নয়, তৃপ্তি বা সন্তোষ নয়— এর মধ্যে রয়েছে উদ্দাম উল্লাস।—

"শরদ চন্দ্র পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ
ফুল্ল মল্লী মালতী যুথী
মত্ত মধুপ ভোরণী।"

এহেন সময়ে—

"হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলী-গান পঞ্চম তান
কুলবতী চিত চোরণী।।"

বিশ্ব প্রকৃতির উদার পটভূমিকায় কবির আলঙ্কারিক কৃতিত্ব এবং এফুরন্ত প্রাণশক্তি কবিচিত্তকে আপন বিশাল বিস্তারের ভেতর নাচিয়ে ছুটিয়ে ফিরিয়েছে। তাই এখানেও আছে সেই উদ্দাম গতিবেগ।

গোবিন্দদাস বিরহের কবি নন, তিনি "মিলনের পুর্ব-পৃথিবীর কবি-গায়ক"। মিলনের অসহনীয় রসাবেশ তাঁর কাব্যে আছে। ইন্দ্রিয়জ শিহরণকে ভাষায় শিহরিত করে তুলতে পেরেছেন কবি—

"কানু বদন হেরি উছলিত অন্তর
লাজে বসনে মুখ ঝাঁপ।
ঈষদবলোকনে ছল ছল লোচন
কেলিক সমাগমে কাঁপ।।"

এর পর প্রেমের চরম বাণী রাধা-কণ্ঠে কবি শুনিয়েছেন, যা আত্মোদঘাটনের উদাত্ততায় অভিষিক্ত অনুপম প্রেমগীতি—

"হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম প্রহরী রহু জাগি।"

এই মিলন-লীলার পারিপার্শ্বিক এবং প্রেমের বাধাক্ষুব্ধ কুটিলাবর্ত গতির বর্ণনাও কবি করেছেন একাধিক পদে। কবি বিস্তারিত ভাবে বাসকসজ্জার বর্ণনা করেছেন, মানিনী রাধাকে দিয়ে 'প্রেমরীতি'র প্রশ্ন তুলেছেন। গোবিন্দদাস অসামান্য শক্তিতে খণ্ডিতার গতানুগতিক অন্তর্জ্বালাকে কাব্যসম্পদ করেছেন। আপন বক্ষ-বিদীর্ণ করে বেদনার শোণিত ধারায় ডুবিয়ে খণ্ডিতা রাধা-কৃষ্ণের প্রতি বিদ্রূপের শরনিক্ষেপ করেছেন—

"নখ পদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জ্বলত হামারি।।
অধরহি কাজর তোর।
বদন মলিন ভেল মোর।।"

পদাবলি সাহিত্যে কলহান্তরিতার শ্রেষ্ঠ কবি বলতে গোবিন্দদাসকেই ধরা হয়। এখানে রাধার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র বেদনায় ভেঙে-পড়া কণ্ঠের আক্ষেপোক্তির মধ্য দিয়ে গোবিন্দদাসের কবি-কৃতিত্ব আমারা অনুভব করতে পারি।—

"সজনি, জানলুঁ বিহি মোহে বাম।
দুহুঁ লোচন করি যো হরি হেরই
তছুপায়ে মঝু পরনাম।।

....

প্রেমবতী প্রেম লাগি জিউ তেজত
চপল জীবন মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে
রসবতী-রস মরিযাদ।।"

প্রতিদ্বন্দ্বিনী কোনো অনামিকা নারীকে নিয়ে কৃষ্ণ চরিত্রের প্রতি বক্র কটাক্ষ, প্রেম গরবিনী রাধার সন্দেহ, ঈর্ষা এখানে লক্ষণীয়। সর্বোপরি রসতনু-রাধা একটি লাবণ্য-লীলায়িত অবহেলার নমস্কারে যখন আত্মপরাজয়কে স্বীকার করেন, তখন সেই স্বীকৃতি চূড়ান্ত জয়ের অভিজ্ঞান হয়ে ওঠে এবং গোবিন্দদাসের কবি-প্রতিভা সেই জয়ের গৌরবে আপন পথ খুঁজে পায়। প্রেমের জন্য আত্মদানের মাহাত্ম্য রাধা চান না, তিনি বাঁচতে চান। অপরের অসাধারণ ত্যাগ স্বীকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন রাধা— কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে তিনি চেয়েছেন— "চপল জীবন মঝু সাধ।"

রসানন্দে ও রসজ্বালায়, রঙ্গে ও ব্যঙ্গে, কোপন দংশনে ও গোপন মাধুরিমায় এত সজীবতা গোবিন্দদাসের পদেই মেলে। ভক্ত বৈষ্ণব রূপেই তিনি রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। রাধা ও কৃষ্ণের বৈষ্ণব তত্ত্ব নির্দিষ্ট রূপটি তাঁর কাছে যত স্পষ্ট চৈতন্যোত্তর অন্য কোনো কবির কাব্যে তা নয়। কাব্যের দিক থেকে, কোনো বিশিষ্ট প্রেমানুভূতির রূপ রচনায় নয়, কতগুলি চিত্রকে ধরে রাখাই তাঁর কৃতিত্ব। এই চিত্রগুলি ভাবগর্ভ, সে ভাব সাধারণত বৈষ্ণবীয় প্রেমচেতনার অনুসারী। কোথাও নিসর্গের বিশিষ্ট ছবি, কোথাও বস্তুর অলঙ্কৃত রূপ কবি তাঁর নিপুণ ভাষায় ও ছন্দে বাণীবদ্ধ করেছেন। ভাবাকুলতায় নয়, চরিত্র জিজ্ঞাসায় নয়,-রূপরচনায়, সৌন্দর্যসম্ভোগে, চিত্র নির্মাণেই গোবিন্দদাসের কবি কৃতিত্ব।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ ঃ

(ক) গোবিন্দদাস ভক্ত বৈষ্ণব এবং সৌন্দর্য সাধনার তিনি সজ্ঞান অনুশীলন করেছিলেন।

(খ) গোবিন্দদাসের রাধা কবির কল্পলোকের সৌন্দর্যের তিলোত্তমা মূর্তি।

(গ) গোবিন্দদাস শ্রীচৈতন্যকে দর্শন না করলেও মানস-দৃষ্টিতে মহাপ্রভুর যে ভাবমূর্তি তিনি অঙ্কন করেছেন তা কল্পনার ঐশ্বর্যে, ভাবের গাঢ়পিণ্ডতায়, ছন্দের ঝঙ্কারে, আলঙ্কারিক গঠনশিল্পে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা থেকেও উচ্চস্তরের ব্যাখ্যা।

(ঘ) মহাপ্রভুর শান্ত পুণ্য করুণাঘন দিব্যজীবন ও তাঁর প্রেমাদর্শ রূপে রসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে গোবিন্দদাসের কবিতায়।

(ঙ) শ্রীচৈতন্যের মানবিক ও দিব্য রূপ এবং মহাপ্রভু-সম্পর্কিত বৈষ্ণবীয় ধারণার তত্ত্বাদর্শ গোবিন্দদাসের পদে অনুপম কবিত্বমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

(চ) যে শ্রদ্ধা নিয়ে ভক্তশিল্পী তিল তিল করে দেবমূর্তি গড়ে তোলেন, সেই শ্রদ্ধার দ্বারাই গোবিন্দদাস রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ রচনা করেছেন।

(ছ) গোবিন্দদাসের পদে রাধা-কৃষ্ণের পূর্বরাগও রূপানুরাগের পর্যায়ে পড়ে।

(জ) রাধার রূপমুগ্ধতা কবি এমন অপরূপ ভাষায় প্রকাশ করেছেন যে তা মন মুগ্ধ করে।

(ঝ) রূপানুরাগের পদে গোবিন্দদাসের প্রতিভা অতুলনীয়।

(ঞ) গোবিন্দদাসের সমগ্র কাব্য সাধনার মূলে রয়েছে তীব্র রূপাসক্তি।

(ট) গোবিন্দদাসের অলঙ্কার প্রিয়তার মূলে রয়েছে তাঁর আভিজাত্য এবং ঐশ্বর্যবোধ— যা ভক্তিরই অপর দিক।

(ঠ) ভাব, ভাষা, চিত্র এবং সঙ্গীতের সহায়তায় গোবিন্দদাস তাঁর পদাবলিকে তপস্যার পথে নিয়ে গেছেন।

(ড) তীব্র রূপানুরাগ কেবল রাধা-কৃষ্ণের লীলারূপে নয়, মহাপ্রভুর ভাবমূর্তি নির্মাণেও গোবিন্দদাসকে সহায়তা করেছে।

(ঢ) যৌবন ধর্মানুযায়ী গোবিন্দদাসের রাধা শ্যামের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আকুলা, কিন্তু প্রথম মিলন কালে ভীতা শঙ্কিতা।

(ণ) প্রথম মিলনের সঙ্কোচ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে রাধা আর মিলন পথে প্রতিবন্ধকতাকে গ্রাহ্য করেন না, তখনই শুরু হয় অশঙ্কিনী দৃঢ়চেতা রাধার অভিসার যাত্রা।

(ত) অভিসার পর্যায়ে গোবিন্দদাস রাজাধিরাজ। এর কারণ কবির স্বকীয় প্রতিভা ধর্ম— তাঁর চলিষ্ণুতা ও চিত্র-রস-রসিকতা এবং পরোক্ষ অভিজ্ঞতা রস।

(থ) গোবিন্দদাসের অভিসার পদে অলঙ্কার-শাস্ত্র-সম্মত নানা অভিসারিকা ভেদের চিত্র আছে, কবি তাকে করে তুলেছেন কাব্যিক মহিমা মণ্ডিত।

(দ) অভিসার পর্যায়েই আমরা গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব যাতে— সেই চিত্রধর্মিতা, নাটকীয়তা ও সঙ্গীত হিল্লোল প্রত্যক্ষ করি।

(ধ) গোবিন্দদাসের অভিসার পদে আছে এক ধারাবাহিকতা। রাধার অভিসারের প্রস্তুতি, দিবসের নানা ভাগে ও বিচিত্র ঋতুতে রাধার অভিসার যাত্রা, বিরুদ্ধ প্রকৃতির বাধা, সখীদের শঙ্কা, রাধার সখীদের প্রবোধ এবং সুদৃঢ় আত্মঘোষণা, অভিসার গমনে রাধার পথ কষ্ট, অভিসারে-শেষে প্রিয়-মিলন-ধন্যা রাধার কৃষ্ণের কাছে পথ কষ্ট ও বেদনার বর্ণনা— এই সকল মিলিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এই ধারাবাহিকতা।

(ন) শুধু শব্দ বন্ধনের মধ্যে দিয়ে এই দুর্জয় পথ-চলা গোবিন্দদাস যে ভাবে তুলে ধরেছেন তা তুলনাহীন।

(প) প্রকৃতির নিবিড় বর্ণনা বিশেষতঃ বর্ষা ঋতুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাই প্রমাণ করে গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব।

(ফ) গোবিন্দদাস অলঙ্কার প্রিয় কবি, কিন্তু তাঁর সৃষ্ট অলঙ্কারের মাঝে উঁকি দেয় হৃদয়-কৌস্তুভ-মণি।

(ব) গোবিন্দদাসের কয়েকটি রাসলীলার পদ আছে, বৈষ্ণব সাহিত্যে তা অনুপম। এর মধ্যে রয়েছে উদ্দাম উল্লাস।

(ভ) গোবিন্দদাস বিরহের কবি নন, তিনি "মিলনের পূর্ব-পৃথিবীর কবি-গায়ক"। মিলনের অসহনীয় রসাবেশ তাঁর কাব্যে রয়েছে।

(ম) বাসকসজ্জা, মান, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা-ইত্যাদি পর্যায়েও গোবিন্দদাস কৃতিত্বের অধিকারী।

(য) ভক্ত বৈষ্ণব তত্ব নির্দিষ্ট রূপটি কাব্যাকারে ফুটিয়ে তুলেছেন।

(র) রূপ রচনায়, সৌন্দর্য সম্ভোগে, চিত্র নির্মাণে গোবিন্দদাস দক্ষ এবং শ্রেষ্ঠ কবি।

আত্ম সমীক্ষামূলক প্রশ্ন ঃ

(১) গোবিন্দদাস বৈষ্ণব পদাবলির কোন্ কোন্ পর্যায়ের পদ রচনা করেছেন?

....

....

(২) পদাবলি সাহিত্যে গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব কোন্ পর্যায়ে এবং কেন?

....

....

(৩) গৌরাঙ্গলীলা বর্ণনায় গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব কোথায়?

....

....

(৪) অভিসার পর্যায়ে গোবিন্দদাসের বিশেষত্ব কী?

....

....

১.৫ জ্ঞানদাস ঃ কবি পরিচিতি

জ্ঞানদাস চৈতন্যোত্তর যুগের একজন প্রসিদ্ধ পদকর্তা। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর শাখায় আবির্ভূত এবং শ্রীজাহ্নবা দেবীর শিষ্য।

জ্ঞানদাস সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তথাপি অনুমান করা হয় কবি বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী কাঁদড়া গ্রামে ১৪৫৩ শকে এক রাঢ়ীশ্রেণির ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোরেই তিনি বৈরাগ্য গ্রহণ করেন। প্রভুপাদ নিত্যানন্দ আচার্যের তিরোধানের পর তাঁর পত্নী, জ্ঞানদাসের দীক্ষা গুরুমাতা জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে জ্ঞানদাস বৃন্দাবনে তীর্থ করতে যান এবং সেখানে শ্রীজীব, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্যদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। নরোত্তম দাসের আয়োজিত বিখ্যাত খেতুরীর কবি সম্মেলনে কবি যোগদান-কালে গোবিন্দদাস ও বলরামদাসের সঙ্গে পরিচিত হন। জানা যায় যে, বাবা আউল মনোহর দাস জ্ঞানদাসের চির সহচর ছিলেন। কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের মঠ আছে। এই বৈষ্ণব পদকর্তার তিরোধান হয়েছিল কবে তা জানা যায় না। তবে জানা যায়, তিনি অতীব সুকণ্ঠ সুগায়ক ছিলেন; তিনি 'মনোহরসাহী' ঢঙের কীর্তন প্রবর্তন করেন।

জ্ঞানদাস বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় পদাবলি রচনা করেছেন। পদাবলি সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ের কবিতা লিখলেও— বিশেষ করে রূপানুরাগের পর্যায়ের পদরচনাতেই জ্ঞানদাস সিদ্ধহস্ত।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ ঃ

(ক) চৈতন্যদেবের পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদসাহিত্যের বিখ্যাত পদকর্তা জ্ঞানদাস।

(খ) জ্ঞানদাসের জীবন-কাহিনি অনুমানভিত্তিক, নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে এই বিখ্যাত কবির জীবনের কাহিনি মোটামুটি অজ্ঞাত থেকে গেছে।

(গ) সুকণ্ঠ জ্ঞানদাস কীর্তনে 'মনোহরসাহী ঢঙে'র প্রবর্তন করেন।

(ঘ) পদাবলি সৃষ্টির ক্ষেত্রে জ্ঞানদাস বাংলা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাকেই গ্রহণ করেছেন।

আত্ম সমীক্ষামূলক প্রশ্ন ঃ

(১) জ্ঞানদাসের জীবন কাহিনি সংক্ষেপে লিখুন।

....

....

(২) বৃন্দাবনে তীর্থযাত্রাকালে জ্ঞানদাসের সঙ্গী কে ছিলেন?

....

....

(৩) জ্ঞানদাস কোথায় কোন্ কোন্ বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন?

....

....

(৪) জ্ঞানদাসের মঠ কোথায় আছে?

....

....

(৫) জ্ঞানদাস পদাবলি সাহিত্যে ও কীর্তনে কী কারণে বিখ্যাত হয়েছিলেন?

....

....

১.৫.১ জ্ঞানদাসের কবি-আত্মা ও কাব্য-শিল্পের পরিচয়

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাস অন্যতম। চৈতন্যোত্তর যুগের ভক্ত ভাবুক কবি তিনি। ভাবের গভীরতা, রসানুভূতির তীব্রতা ও প্রকাশ ভঙ্গির মাধুর্যে তাঁর রচিত পদাবলি রসিক-জন-চিত্ত-মুগ্ধকারী—

"প্রাণ সই না জানি কি জানি হইল।
রাতি দিন নাই সদাই ধেয়াই
মরমে সমাধি রইল।।"

জ্ঞানদাসের গাঢ় গভীর অনুভূতির আকূতি ছিল, সেই অনুভূতিকে সংহত অথচ তীব্র করে প্রকাশ করবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল—

"অতি সুমধুর মুরতি শ্যাম
কুটিল কেশ কুন্দদাস
মোর পন্থ শোহনি।
ভাল উপরে চন্দনাবিন্দু
অমল শরদ পূর্ণিম ইন্দু
ভুবনমরমমোহনি।।"

রূপ ও রসের সমন্বয়ে কাব্যমূর্তি গঠনের দুর্লভ প্রতিভা ছিল জ্ঞানদাসের। কাব্যের ক্ষেত্রে তাই জ্ঞানদাস তড়িৎলতার চপল চমক নয়— দেখিয়েছেন সেই তড়িতালোকের রূপরাশি, নাম জপতে জপতে তাঁর দেহ অবশ হয়ে যায়নি, বরং প্রতি অঙ্গের স্পর্শের জন্য প্রতি অঙ্গের ক্রন্দনকে অনুভব করেছেন হৃদয়ে। তাই তাঁকে লিরিক কবি বলা বোধ করি অসংগত হয় না—

"কি কহব রে সখি কানুক নেহা।
ও সুখে মুগধী মুগধ মঝু দেহা।।
প্রেমপরশরস কয়ল অপার।
কত পরথাপল পিরীতিপসার।।"

যদিও বৈষ্ণব কবিতার গীতিসুরের মূর্চ্ছনা বহু সমালোচনার অপেক্ষা রাখে এবং বিশেষত ভক্ত কবি প্রাণ থেকে উৎসারিত ভক্তির সুর ঠিক তথাকথিত গীতিকাব্যের সুর হয়ে উঠতে পারে না তত্ত্বের বাঁধনের জন্য— কিন্তু জ্ঞানদাসকে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম না বলে উপায় নেই। যে কবি কৃচ্ছসাধনার কথা বলতে গিয়ে গেয়ে ওঠেন— "ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।" তখন তাঁর কথা বিশেষ থেকে নির্বিশেষ হতে বাধ্য হয়।

লিরিক কবিতা মন্ময়, কবির আত্মভাবই যেখানে প্রধান। সেই মন্ময় দৃষ্টির আলোকে বস্তুর সাধারণ প্রকৃতিও পাল্টে যায় কবির আপন মনের মাধুরীর মিশ্রণে। বিশ্বকে অবলোকন করবার দৃষ্টিভঙ্গি, আপনাকে প্রকাশের রীতি-সকলই স্রষ্টার "বিজন জীবন বিহারী" হয়ে ওঠে। লিরিক কবিতায় তাই কবি-প্রাণ সামান্যকে বিশেষ করে তোলে তাঁর "সাধের সাধনা"য়। নির্দিষ্ট কবি-রীতি, প্রথাগত বস্তু ও দৃশ্য সংস্থানের মর্যাদা সেখানে নেই। এই অর্থে বৈষ্ণব কবিতা লিরিক কবিতা নয়। এখানে যে ভাব ব্যক্ত তা রাধা এবং কৃষ্ণের হৃদয় ভাব— কবির কাজ কেবল দূর হতে তাকে প্রত্যক্ষ করে তার লীলার মাধুর্য ব্যক্ত করা—

"কপোলে পুলক বেকত দেখি।
প্রেমকলেবর ততহিঁ সাখী।।
জ্ঞানদাস রস ভাবিয়া গায়।
রথের বেভার লুকা না যায়।।"

জ্ঞানদাস চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব সাধক ও পদকর্তা। বৃন্দাবনের গোস্বামী কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব কবির সম্পূর্ণ আয়ত্তে ছিল এবং বলা বাহুল্য যে বৈষ্ণব ধর্ম সাধনা ও ভক্তিমার্গে অবিচল নিষ্ঠা নিয়েই তাঁর পদ রচিত। কিন্তু তবুও জ্ঞানদাস কোনো অপার্থিব ব্যঞ্জনা সচেতনভাবে আরোপ করেননি তাঁর কাব্যে। তাঁর মর্মলোকই নিত্য বৃন্দাবন ভূমি। আর সেই ভূমিতেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর পদাবলিকে। হৃদয় দিয়ে কবি অনুভব করেছেন—

"কানুর পীরিতি মরণ অধিক শেল"-

তাই তাঁর কাব্যে ব্যক্তিগত আবেগ ও অনুরাগের সুর বেজে ওঠা অবশ্যম্ভাবী। এক রোমান্টিক রহস্যময়তা তাঁর কাব্যে প্রাণস্পন্দন জাগিয়েছে, কিন্তু কবি মিষ্টিক নন। তাঁর কাব্যে আধ্যাত্মিকতা নয়, একটি আভাস স্পন্দিত হয়ে অসীমকে স্পর্শ করেছে। এই ধ্বনিস্পন্দন জ্ঞানদাসের মতো অন্য কোন বৈষ্ণব পদকর্তার মধ্যে পাওয়া যায় না। তাঁর কাব্যে আছে সঙ্গীত, আছে কারণহীন আবেগ। আর সেই আবেগই তাঁর কাব্যে এনে দিয়েছে অন্তহীন পথের প্রেম। এই না-বলার আবেগ, না-পাওয়ার অতৃপ্তি, না থামার আনন্দ— যুগ-যুগান্তরের গীতি কবির চিত্তের এই আনন্দ-বেদনা-উল্লাস— জ্ঞানদাসের বিশিষ্ট কবি-মনের সম্পদ এটাই—

"অলপ বয়সে মোর রস পরকাশ।
না পুরে অলপ ধনে দারিদ আশ।।
হামারি পরশরস কৃপণক দান।
অমিয়া ভরমে কেহ করু বিষপান।।"

জ্ঞানদাসের সঙ্গীত অসীম গগন বিহারী— কিন্তু তাঁর সঙ্গীত মূর্চ্ছনা 'লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মের' সৌন্দর্যে মাধুর্যে পরিপূরিত। প্রেমের অনন্ত রহস্য, মিলনের ব্যাকুলতা, চিরন্তন অতৃপ্তি বোধ, বিরহের মর্মান্তিক দহন-জ্বালা, এবং স্বপ্নলোকে মিলনের রসঘন আনন্দ ও নিবিড় প্রশান্তি— প্রেমের এই বিচিত্র আলো-আঁধারের লীলা জ্ঞানদাসের কাব্যে অপূর্ব শিল্পরূপ লাভ করেছে। তাঁর কবি প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা ভাবের রূপ নির্মাণে। তাঁর মতো শিল্পীর যাদুর কাঠির স্পর্শে এরূপ রূপনির্মাণ সম্ভবপর হয়েছে। অন্তরের ভাবের মুকুলরাজিকে তিনি সৌন্দর্য রসে ভরিয়ে পরিপূর্ণতা দিয়েছেন। শুধু

তাই নয়, তাকে শিল্পশ্রীমণ্ডিত করে তুলেছেন। এর জন্য তাঁর পাণ্ডিত্য নয়, কোনো অলঙ্কার শাস্ত্রের কাছে তিনি ঋণী নন; এ তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত কবিকল্পনার অন্তর্নিহিত আবেগজাত— একান্ত সজীব সুন্দর ও অকৃত্রিম—

"কি মোহন নন্দ কিশোর।
হেরইতে রূপ মদনমন ভোর।।
অঙ্গহি অঙ্গ অঙ্গ বিথার।
জলদপটল বরিখত রসধার।।"

মিলন ব্যাকুলতা, অতৃপ্ত প্রণয়ের জ্বালা, বিরহের মর্মস্পর্শী সকাতর আর্তনাদের মধ্য দিয়ে জ্ঞানদাস দুর্বোধ্য প্রেমের জটিল প্রকৃতির চিরন্তন রহস্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর পদাবলিতে নিখিল মানবের দেশকালাতীত বেদনা, চিরন্তন মুক্ত প্রেমের রোমান্টিক ব্যঞ্জনা প্রসারিত হয়েছে। প্রেমানুভূতির নিবিড় মনস্তত্ত্বকে রোমান্টিক কল্পনার রসে জারিত করে তুলেছেন কবি। আর এরই সঙ্গে মিশে গেছে প্রকৃতির নিগূঢ় সম্পর্ক। পদাবলিতে কবি যখন বলেন—

"রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।"

তখন ঝরঝর মুখর বাদল রাত্রি অপরূপ ধ্বনন ক্রিয়ায় আরো নিবিড় গভীর ভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

বিরহের পদ সৃষ্টিতে জ্ঞানদাস চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। কবির দুঃখবোধ আছে কিন্তু সেই বোধের গভীরে বেদনার আঁধার নয়, আছে আনন্দময় আলোক রশ্মি। জীবন রহস্যের অতলস্পর্শ গভীর গহন বোধে তাঁর কাব্য তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। জনৈক সমালোচকের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য-

"জ্ঞানদাস ধূলির আসনে বসে ঊর্ধ্ব নীলাকাশে দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন। অরূপ অসীমের অনন্ত বিস্ময় সৌন্দর্য মাধুর্যকে তিনি সীমার রূপবৈচিত্র্যে মাটির বন্ধনে আবদ্ধ করতে প্রয়াসী। জ্ঞানদাস মহাশূন্যে উধাও হয়ে যাননি— মহাশূন্যকে ধরিত্রীর ধূলার মধ্যে টেনে আনতে সচেষ্ট। ধর্মকে দর্শনকে জ্ঞানদাস প্রেমের মধ্যে সৌন্দর্যের মধ্যে স্থাপন করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন অনুপম কল্পনালোক, স্বপ্নের জগৎ। সেই জগতের নাম বৃন্দাবন। ....আনন্দ বেদনায় অধীর জ্ঞানদাস তাঁর ভক্তি ভাবুকতাকে কাব্যের স্বপ্নপুরীর সৌন্দর্যলোকে বিচিত্রভাবে লীলায়িত করে দিয়েছেন। কবি জ্ঞানদাস ভক্ত ও সাধকরূপে বৃন্দাবনে রাধা কৃষ্ণের মধ্যে চিরন্তন মানব-মানবীর ব্যর্থ প্রেমের হতাশা বেদনাকে প্রত্যক্ষ করে বিরহ যন্ত্রণা দগ্ধ প্রেমের অলকাপুরী নির্মাণ করেছেন। সেদিক থেকে জ্ঞানদাস একই সঙ্গে বৈষ্ণবসাধক ও চিরায়ত মানবরসের কবি। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের দিক থেকে গ্রহণ করলেও সৌন্দর্যরসিক জীবনপ্রেমিক জ্ঞানদাস সেই অলৌকিক প্রেমভাবনাকে লোকায়ত জীবনের রহস্যে ছন্দিত করে তুলেছেন। তাই জ্ঞানদাসের কবিতা সর্বকালরে রসমর্যাদায় উন্নীত।.........জ্ঞানদাস চিরকালের রসিক পাঠকের প্রিয়তম কবি।"

(ড. শ্রীমন্তকুমার জানা— "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস")

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ ঃ

(ক) চৈতন্যোত্তর যুগের ভক্ত ভাবুক কবি হলেও জ্ঞানদাস মূলত রোমান্টিক কবি। বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ বৈষ্ণবধর্মের যে দার্শনিক ও তাত্ত্বিক রূপ উদঘাটন করেছিলেন, তাতে জ্ঞানদাসের পূর্ণ অধিকার ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তের অবিচল নিষ্ঠা নিয়েই তিনি পদ রচনা করেছিলেন। তাঁর কাব্যকৃতি এক ভক্ত বৈষ্ণবের সাধনা। কবি যেন গোপকিশোরীর মূর্তিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা দর্শন করেছেন এবং যুগলমূর্তির আনুগত্যময়ী সেবা করেছেন এবং স্বাভাবিক কবি-প্রতিভা বশে সেই প্রেমলীলার রসমাধুর্য তিনি ভাবে ভাষায় রূপবদ্ধ করেছেন।

তবে জ্ঞানদাসের ক্ষেত্রে এই ভক্তি সাধন পন্থার অতিরিক্ত এক ধাপ আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব কবিগণ বৃন্দাবনের ধর্মদর্শনে ও ভক্তিমার্গে দীক্ষিত হলেও সত্যকার প্রতিভাসম্পন্ন কবির সৃষ্টিতে এই ভক্তি-বিশ্বাস কোথাও বাধাস্বরূপ হয়নি। জ্ঞানদাসের ছিল সেই সত্যকার কবিপ্রতিভা। তাই ধর্মের তত্ত্ব-দর্শনের গণ্ডি অতিক্রম করে তাঁর কবিতা পরবর্তীকালের সাহিত্যরুচির কাছে আপন আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছে।

(খ) জ্ঞানদাস মিস্টিক নন, রোমান্টিক রহস্যময়তা তাঁর কাব্যের প্রাণ। তাঁর কাব্য সংগীতময়, কারণহীন আবেগে থরথর কম্পিত।

(গ) তাঁর আবেগ তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত কবি-কল্পনার অন্তর্নিহিত ভাব। তা সজীব এবং অকৃত্রিম।

(ঘ) ভক্তবৈষ্ণবের সমস্ত নিয়ম মেনেও তিনি বাঁধন হারা আনন্দ-বেদনার সন্ধানী পথিক। কিন্তু যেখানেই বাঁধন সেখানেই তিনি সহজ প্রাণের আবেগ-বঞ্চিত। তাই আশ্চর্যভাবে আমরা লক্ষ্য করি, চৈতন্য-পরবর্তী কবিরা পদাবলি সাহিত্যে যে নতুন ধারা সংযোজন করে বৃন্দাবন ও নদীয়ার মধ্যে স্থান-কালের যোজন পার্থক্যকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন, সেই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ বা গৌরচন্দ্রিকা রচনায় জ্ঞানদাস অতিরিক্ত আড়ষ্ট।

(ঙ) রূপের পূজারী কবি জ্ঞানদাস রূপানুরাগের শ্রেষ্ঠ কবি। আবার বিরহের পদ সৃষ্টিতেও চৈতন্য-পরবর্তীকালে তিনি অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ।

(চ) জ্ঞানদাস সৌন্দর্যরসিক ও জীবন-প্রেমিক পদকর্তা।

আত্ম সমীক্ষামূলক প্রশ্ন ঃ

(১) জ্ঞানদাসের কাব্য-সৃষ্টিতে এক দ্বৈধ সত্তার পরিচয় রয়েছে। —অতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

....

....

....

(২) জ্ঞানদাসের রচনার বৈশিষ্ট্য কী?

....

....

(৩) জ্ঞানদাসের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়?

....

....

(৪) বৈষ্ণব কবিরূপে জ্ঞানদাসের বৈশিষ্ট্য কী?

....

....

১.৫.২ জ্ঞানদাসের পদাবলির বিশ্লেষণ

জ্ঞানদাস ভক্ত বৈষ্ণব কবি হলেও ভক্তির আবেগে ভেসে গিয়ে ভজনাস্পদের লীলা সবিস্তারে কীর্তন করেননি। কবির 'বাহির দুয়ারে' বৈষ্ণব ধর্মের কপাট দেওয়া থাকলেও 'ভিতর দুয়ার' তাঁর খোলা ছিল। তাই ঘটনা অপেক্ষা ভাবের অভিব্যক্তি ও রসসৃষ্টি করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। আর সে জন্যই রাধা-কৃষ্ণের জীবন ও প্রণয় লীলার ধারাবাহিক পদাবলি রচনা না করে পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, মিলন, অভিসার, বিরহ ইত্যাদি ভাবগত বিষয় অবলম্বনে তিনি পদ রচনা করেছেন। তাঁর রচনায় ভাব ও রূপের যুগলবন্দী সাধিত হয়েছে।

চৈতন্য-পরবর্তী কবিদের মধ্যে মহাপ্রভুর দিব্য জীবনের লীলা এমন গভীর প্রভাব ফেলেছিল যে, সেই আবেগে তাঁরা শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে একাধারে রাধা এবং কৃষ্ণের লীলাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। জ্ঞানদাসও শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদে কৃষ্ণ-বিরহিণী রাধার ভাবকে অপরূপ ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন—

"সহচর অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া।
চলিতে না পারে খেনে পড়ে মুরছিয়া।।
অতি দূরবল দেহ ধরণে না যায়।
ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর মুখ চায়।।
কোথায় পরাণ নাথ বলি খেনে কান্দে।
পূরব বিরহ জ্বরে থির নাহি বান্ধে।।"

শ্রীগৌরাঙ্গের এই ঈশ্বর-বিরহ বিরহিণী রাধার ভাবমূর্তিতে অপরূপ ভাবে ফুটে উঠেছে।

রাধা কৃষ্ণের লীলা রূপের বর্ণনাতেই জ্ঞানদাসের পদ অধিকতর শিল্পোৎকর্ষ লাভ করেছে। তিনি ভক্ত বৈষ্ণব— কিন্তু তাঁর চেয়েও তাঁর বড়ো পরিচয় কবি ও শিল্পী রূপে। তাই সমস্ত দার্শনিকতার উর্ধ্বে, বৈষ্ণব সংস্কারের বাইরে, ভক্তি ধর্মের দাসত্বকে ভেঙে তিনি সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন, প্রাণ ভরে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন সেই সৌন্দর্যানুভূতি এবং রূপানুরাগকে। এমনি করেই বর্ণনা করেছেন শ্রীকৃষ্ণের রূপ—

"চূড়াটি বান্ধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ূর পুচ্ছ
ভালে সে রমণী-মনোলোভা।
আকাশ চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুক খানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা।।
মল্লিকা মলতী মাঝে গাঁথানি গাঁথিয়া ভালে
কেবা দিল চূড়াটি বেড়িয়া।
হেন মনে অনুমানি বহিতেছে সুরধনী
নীলগিরি শিখর বাহিয়া।।
কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকিমিকি
কেবা দিল ফাগুয়া রাঙিয়া।
রজতের পাতে কেবা কালিন্দী পূজিয়াছে
জবা কুসুম তাহে দিয়া।।
হিঙ্গুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়েছে
কালিন্দী পূজিল করবীরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন রয়
শ্যাম রূপ দেখি ধীরে ধীরে।।"

আপন প্রেমাস্পদের - পূজাস্পদের প্রতি অপরের পূজা নিবেদন দেখে মুগ্ধ শিল্পী মন সমস্ত বিশ্ব মন্থন করে সৌন্দর্যের অলঙ্কার রাশি চয়ন করে সাজিয়েছেন এবং ধীরে ধীরে রসালোকে সেই অরূপ রূপরাজিকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

অন্যান্য বৈষ্ণব-কর্তারা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার বহু বিবরণ দিয়েছেন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বল নীলমণি'র আলোকে তাতে বৈষ্ণবীয় পঞ্চরসও প্রস্ফুটিত হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানদাসের পদাবলিতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা স্বল্প। যেটুকু রচনা করেছেন কবি, তার মধ্যে নাটকীয় ভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যশোদার বাৎসল্য প্রেম, উৎকণ্ঠা, শাসন, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বাঙালি গৃহের জননীর স্নেহ-শঙ্কা-শাসন-কারুণ্য ফুটে উঠেছে এবং সখ্য প্রেমের মাধুর্য, অগ্রজ বলরামের স্নেহ-শাসন প্রস্ফুটিত। জ্ঞানদাস এই পর্যায়ে মাটির পৃথিবীর ছবি এঁকেছেন। একটি পদে তার প্রমাণ মিলবে। দুরন্ত কৃষ্ণের দামালপনাকে নিবৃত্ত করতে যশোদা কৃষ্ণকে ভয় দেখান—

"গোকুলের মাঝে এক হল্য মহাভয়।
আস্যাছে দারুণ হাঁউ লোকে জনে কয়।।"

যশোদার অপ্রাকৃত বাৎসল্য প্রেমকে বর্ণনা করতে গিয়ে বাংলার কবি জ্ঞানদাস কিন্তু "বাংলার বধূ, বুক-ভরা মধু"কেই তুলে এনেছেন গভীর ভালোবাসায়।

এছাড়াও জ্ঞানদাস দানলীলা, নৌকাবিলাস ইত্যাদি বিষয়ে কবিতা লিখেছেন, কিন্তু 'রূপের পূজারী' কবির প্রকৃত আত্মপ্রকাশ ঘটেছে রাধা কৃষ্ণের রূপ-সমৃদ্ধ লীলায়। আর সেই লীলার শুরু রাধার স্বপ্ন দর্শনে পূর্বরাগের জাগরণে—

"মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে হেথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নাই।"

সেই স্বপ্ন দেখার পটভূমিটিও কবি তৈরি করেছেন তেমনই করে—

"রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।।
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝি ঝি ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিনু হেন কালে।।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "শেষের কবিতা" উপন্যাসে এক জায়গায় বলেছেন— "আজ সমস্ত আকাশ যে মরিয়া হয়ে উঠল, হু হু করে কী-যে হেঁকে উঠছে তার ঠিক নেই, তারই ভাষায় আজ বন-বনান্তর ভাষা পেয়েছে, বৃষ্টি ধারায় আবিষ্ট গিরিশৃঙ্গগুলো আকাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। ....বৎসরের পর বৎসর নীরবে চলে যায়, তার মধ্যে বাণী একদিন বিশেষ প্রহরে হঠাৎ মানুষের দ্বারে এসে আঘাত করে। সেই সময়ে দ্বার খোলবার চাবিটি যদি না পাওয়া গেল তবে কোনোদিনই ঠিক কথাটি অকুণ্ঠিত স্বরে বলবার দৈবশক্তি আর জোটে না। যেদিন সেই বাণী আসে সেদিন সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে খবর দিতে ইচ্ছে করে— শোনো তোমরা, আমি ভালোবাসি। আমি ভালোবাসি, এই কথাটি অপরিচিত-সিন্ধুপার-গামী পাখির মতো কত দিন থেকে, কত দূর থেকে আসছে। সেই কথাটির জন্যেই আমার প্রাণে আমার ইষ্টদেবতা এতদিন অপেক্ষা করছিলেন। স্পর্শ করল আজ সেই কথাটি— আমার সমস্ত জীবন, আমার সমস্ত জগৎ সত্য হয়ে উঠল।"

ঠিক এমনি করেই যেন জ্ঞানদাসের রাধার জীবনে ঠিক সময়ে ঠিক বাণীটি এসে আঘাত করেছে। তাই রাধা অকুণ্ঠিত স্বরে সেই মুহূর্তেই সখিকে জানিয়েছেন- "তাহা বিনু আর কারো নই।"

এই রোমান্টিক কল্পনার দীপ্তিতে বিভাসিত হয়ে উঠেছে বিমুগ্ধা রাধার কৃষ্ণ-অনুরাগ—

"শিশুকাল হইতে বঁধুর সহিতে
পরাণে পরাণে নেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি দেহা।।"

এই বিচ্ছেদের বেদনা তো আছেই, কিন্তু তার থেকেও বড়ো কথা, এই বিচ্ছেদের জন্যই জ্ঞানদাসের রাধা প্রাণ- ভরে রূপ দর্শন করতে পেরেছেন। এই রূপের প্রতিই তাঁর আকুলতা—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।"

এই রূপানুরাগের আবেশে কুলভ্রষ্টা, পথভ্রষ্টা হয়েছেন রাধা, সেই ভ্রষ্টতার জন্য হাহাকারের মাঝেও মুগ্ধা রাধার রূপানুরাগের বিভোরতা প্রকাশিত—

"আলো মুঞি জানো না -
জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিলে দুলিয়া নাগর ছলে।।
রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি কি করে প্রাণ।।"

এই রূপে মজে রাধা জাতি- কুলশীল, মান-মর্যাদা সবই হারিয়ে ফেলেছেন, আর তার জন্য দায়ি করেছেন শ্যামকেই—

"এ সখি হাম সে কুলবতী রামা।
অনেক যতন করি প্রেম ছাপায়লুঁ
বেকত কয়ল ঐ শ্যামা।।"

কৃষ্ণ স্বয়ং রাধার এ দুর্দশার জন্য দায়ী বটে, কিন্তু সংসারে লাঞ্ছনা গঞ্জনা রাধার ভূষণ—

"সই বল মোরে করিব কি।
পরাণ পিরীতির নিছনি দি।।
গুরু গরবিত যতেক গঞ্জে।
মণি জ্বলে যেন তিমির পুঞ্জে।।"

বিড়ম্বনা, প্রতিবন্ধকতা রাধার প্রেমের অনুভূতিকে আরো গাঢ় গভীর করে তুলেছে। তাই পূর্বরাগের রূপদর্শনের বিস্ময়ের ঘোর অনুরাগে বেদনার উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়েছে--

"কাঁদিতে না পাই বঁধু, কাঁদিতে না পাই।
নিশ্চয় মরিব তোমার চাঁদমুখ চাই।।
শাশুড়ী ননদী কথা সহিতে না পারি।"

রাধার এই বেদনায় অপার্থিব প্রেমের লেশমাত্র নেই, আছে বাস্তব পৃথিবীর মাটির যোগ।

জ্ঞানদাস রাধার চোখ দিয়ে কৃষ্ণের রূপ দর্শন করেছেন। অন্যান্য বৈষ্ণব কবিরা যেখানে প্রেমময়ী রাধার বিচিত্র অবস্থা বর্ণনাতেই বিভোর, জ্ঞানদাস সেখানে প্রেমময়ী রাধার এই অবস্থা ভেদের কারণ স্বরূপ একটি ব্যাপারেই জোর দিয়েছেন, তা হল রাধার কৃষ্ণের প্রতি রূপানুরাগ—

"সই লো কি আর বলিব।
যে পণ কর্যাছি মনে সেই সে করিব।।
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে।।
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা।।"

—এ যেন রাধার দর্শন আর স্পর্শ সুখ নয়, দর্শনের স্পর্শ-সুখ হয়ে ফুটে ওঠে।

কৃষ্ণের রূপের এই নিবিড় আকর্ষণই রাধাকে বারবার নিয়ে যায় যমুনার তীরে, এবং—

"যে রূপ দেখিলুঁ সই স্বরূপে তোমারে কই
জল ভরিতে বিসরিলুঁ।।"

কারণ এই রূপের যেমন-তেমন আকর্ষণ নয়, এ আকর্ষণ—

"একে সে মুরতি তার রসে নিরমিল গো
আর তাহে বয়স বিশেষ।
ও রূপ লাবণ্যলীলা হিলোলে পড়িয়া গো
পুন কে আসিবে নিজ দেশ।।"

তাই সে রূপ দর্শনে রাধার উল্লাস—

"দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে।।"

এই রূপের আকর্ষণ রাধাকে সব কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে—

"গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে।।
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার।।
ঘরের যতেক যবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে ভেজাই আগুনি।।"

লজ্জার ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাধার তাই অভিসার—

"মেঘ যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনী করু অভিসার।।
ঝলকত দামিনী দশ দিশ কাঁপি।
নীল বসনে ধনী সব তনু ঝাঁপি।।"

জ্ঞানদাসের অভিসারের পদ মুষ্টিমেয়। আসল কথা, তাঁর রাধা ধ্যানময়ী, আপন উপলব্ধির গভীরে প্রবেশ করে যে আত্মহারা, অবস্থানগত দূরত্বের সমস্যা তাঁর কাছে তত নয়। রাধার সমস্যা একটিই—

"যত রূপ তত বেশ
ভাবিতে পঞ্জর শেষ।"

জ্ঞানদাস রূপসিদ্ধ কবি, রূপবিদ্ধও বটে। তাই অভিসারের পদে তাঁর রাধা—"চলে বা না চলে রাই রসের তরঙ্গে।" কিন্তু রূপের সুর কবির দ্বিধাগ্রস্থ নয়, তাই তাঁর লেখনী অভিসারের পদে রূপের মূর্তি আঁকে প্রকৃতির।

জ্ঞানদাস হৃদয়ার্তিকে রূপচিত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত করেন, ভাবের বর্ণে আঁকা তাঁর বস্তুর ছবি, সে ছবির রেখা ধীরে ধীরে অরূপের প্রতি আকুল তৃষ্ণায় অস্পষ্টতায় রহস্যালোকে বিলীন হয়ে যায়।

তাই জ্ঞানদাসের মিলনের পদ সামান্যই। কারণ, জ্ঞানদাস কোনো আবেগেই ভেসে যান না। সর্বক্ষেত্রেই তাঁর অপূর্ব আত্মসংযম। এই সংযমই তাঁর রাধাকে বিরহের বুকফাটা ক্রন্দনে আর্ত করে তোলে না। তীব্র দীর্ঘ বিরহের মধ্যেও তাই জ্ঞানদাসের রাধার আশ্চর্য সংযম। তাঁর চিরন্তন বেদনা তাই সশব্দে ফেটে পড়ে না, বরং অন্তরের অন্তঃস্থলে ফল্গুর মতো নিঃশব্দে বয়ে যায়। কৃষ্ণের মিলন প্রত্যাশায় রাধা দীর্ঘ দিবস রজনী অতিবাহিত করেন—

"দিবস গণিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি।।"

এই দীর্ঘ বিরহের শেষে মিলন কালেও রাধা উত্তাল নন—

"বাহু পসারিয়া ধনী বঁধু নিল কোরে।
অনিমিখ লোচনে বদন নেহারে।।"

শুধু এই নয়, দুজনের অভেদাত্মা কল্পনা করে জ্ঞানদাসের রাধা বলেন—

"তোমায় আমায় একই পরাণ
ভাল সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া
কিরূপে আছিলা তুমি।।"

মিলন ধন্যা রাধা স্থির হতে পারেন না। কৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদন করে তিনি শান্ত হন বটে, কিন্তু দীর্ঘ বিরহ যাতনার শেষে মিলনে যদি আবার বিচ্ছেদ আসে— তাই রাধা বলেন—

"বঁধু হে আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ সেখানে তোমারে থোব।।
....
কেবা নিতে পারে কাহার শকতি পাঁজরে কাটিয়া সিন্দ।।"

শেষ পর্যন্ত এই প্রেমলীলা আধ্যাত্মিকতার স্তরে গিয়ে পৌঁছায়।

"সই কি না সে বন্ধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নহে পরতীত
যেন দরিদ্রের হেম।।
হিয়ায় হিয়ায় লাগিব লাগিয়া
চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া বায়ের দোসর
সদাই ফিরয়ে সঙ্গে।।
তিলে কত বেরি মুখানি হেরয়ে
আঁচরে মোছয়ে ঘাম।
কোরে রাখি কত দূর হেন মানে
তেজ্ঞি সদা লয়ে নাম।।
জাগিতে ঘুমাতে আন নাহি চিতে
রসের পসার কাছে।

জ্ঞানদাস কহে এমন পিরিতি
আর কি জগতে আছে।।"

এই আধ্যাত্মিকতার দ্বারাই জ্ঞানদাসের রোমান্টিকতা এক অপরূপ সমাপ্তি পেয়েছে।

জনৈক সমালোচকের উদ্ধৃতি-অংশ তুলে ধরে আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলির বিশ্লেষণ শেষ করব।—

"বিস্ময়কর হইলেও একটি কথা সত্য— বৈষ্ণব কবি, কাব্যও ধর্মের বিরোধ মিটাইয়াছেন। প্রেমকাব্যে - ধর্মীয় চরিত্র প্রবেশ করাইয়া ইহা করিয়াছেন তাহা নয়, তাঁহারা আরো নিগূঢ় অথচ ব্যাপকভাবে ইহা সম্পন্ন করিয়াছেন। অন্য সকল কবির মতই বৈষ্ণব কবিও অতৃপ্ত তৃষ্ণার অধীন, যে-তৃষ্ণার একমাত্র শান্তি আছে কোনো কল্পিত সৌন্দর্য লোকে। ......

আধ্যাত্মিক কবিরূপে এইখানে বৈষ্ণবের জয়। তাহার বৃন্দাবন শুধু কল্পনার নয়, হয়ত ধ্যানের নিত্যের ও বটে। নিত্য বৃন্দাবনে নিত্য রাধা ও নিত্যকৃষ্ণ। সে বৃন্দাবনের পথ বড় দীর্ঘ, অমলিন আত্মপ্রদীপে পথ চিনিয়া সেখানে পৌঁছিতে হয়, তবু- সে-বৃন্দাবন আছে। এই বিশ্বাসের জোর আছে বলিয়া বৈষ্ণব আধ্যাত্মিক, তাহার সমস্ত ধর্ম জীবনের ভিত্তি ঐ বিশ্বাসের উপর।

......কাব্য ও ধর্মের কী অসামান্য সম্মিলন বৈষ্ণব ঘটাইয়াছেন। সৌন্দর্য কামনায় বৈষ্ণব কবি প্রাকৃত। সৌন্দর্যের নিত্যরূপের বিশ্বাসে— যে নিত্যরূপ কৃষ্ণ-রাধার দেহ ছাড়া সম্ভব নয়— সে অপ্রাকৃত সাধক। সিদ্ধিও বটে।

কিন্তু বৈষ্ণব কবি কবিই, গীতিকবি। যে অসমাপ্তির ব্যঞ্জনাকে কোনো লিরিক কবির পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব নয়, বৈষ্ণব-কবি তাহাকে এড়াইবেন কি ভাবে? .....তবে নিজের অতৃপ্তি যিনি সকল তৃপ্তি-অতৃপ্তির উৎস, তাঁহার উপর চাপাইয়া কাব্য-সাধনাকে ভক্তির সাধনার সাবলীল সুখে রূপান্তরিত করিয়াছেন। নৈরাশ্য, হাহাকার, হারাই-হারাই ভাব— সকলই রাধা ও কৃষ্ণের, - কারণ রাধাকৃষ্ণ দেবতা হইয়াও প্রেম দেবতা এবং প্রেমের মধ্যে বেদনার শিহরণ আছে। মানুষের প্রেম স্বভাব যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, বৈষ্ণব বিশ্বাস করেন, তিনি স্বয়ং ঐ প্রেম স্বভাবের অধীন। বৈষ্ণব কবি তাই ভক্ত ও সাধকরূপে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া, ঐ বৃন্দাবনের বেষ্টনীর মধ্যে লীলারত রাধাকৃষ্ণের হৃদয়ে নিজের অতৃপ্তিময় প্রেমস্বভাবকে দর্শন করিয়া কবি যাতনার উপশম চাহিয়াছেন।

সকল বৈষ্ণব কবির মধ্যে জ্ঞানদাস সর্বাপেক্ষা সেই কবি। (শঙ্করীপ্রসাদ বসু- "মধ্যযুগের কবি ও কাব্য")

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ ঃ

(ক) জ্ঞানদাস রাধা ও কৃষ্ণের জীবনলীলা ও প্রণয়লীলার ধারাবাহিকতাকে অনুসরণ করেননি। ভাবগত বিষয় অবলম্বনেই তিনি পদাবলি রচনা করেছেন।

(খ) জ্ঞানদাস চৈতন্যোত্তর ভক্ত বৈষ্ণব— কিন্তু তাঁর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি কবি ও শিল্পী। ভক্ত যে অনুশাসনের বশবর্তী হয়ে নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করতে পারেন না, কবির শিল্পীসত্তা তাঁর হাত ধরে অনায়াসেই এই অনুশাসনের গণ্ডী অতিক্রম করে গিয়েছেন।

(গ) জ্ঞানদাস রূপের কবি— রূপানুরাগের কবি। অনন্ত সৌন্দর্যকে তিনি প্রাণ ভরে দেখেন এবং দেখান।

(ঘ) ভক্ত হয়েও যিনি রোমান্টিক কবিশিল্পী হতে পারেন, তাঁর স্বভাবেই রয়েছে সেই দ্বৈধতা। "একাধারে তুমি আকাশ, তুমিই নীড়"— এর ব্যাপারটি রয়েছে জ্ঞানদাসের কবিতায়। তাই রোমান্টিক কবির হাতে বিরহিনী রাধা ভুবন ভরে সেই বেদনার ধনকে খুঁজতে গিয়ে "অলপ বয়সে পীরিতি করিয়া" "যেমত যোগিনী পারা" হতে পারেননি— তাঁর চোখ পড়েছে এই মাটির পৃথিবীর ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে, চোখ পড়েছে এই পার্থিব সংসারের অন্তঃপুরের ভ্রূকুটি কুটিল চোখে।

আত্ম সমীক্ষামূলক প্রশ্ন :

(১) ভক্ত বৈষ্ণব হয়েও জ্ঞানদাস রোমান্টিক কবিপ্রতিভার অধিকারী। —সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

....

....

(২) জ্ঞানদাস রূপানুরাগের কবি। —উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করুন।

....

....

(৩) জ্ঞানদাসের রাধার মধ্যে এক তরল চলার ছন্দ আছে। —অতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

....

....

১.৫.৩ জ্ঞানদাসের পদাবলির ভাষা, অলঙ্কার, ছন্দ

জ্ঞানদাসের কবি প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা ভাবের রূপ শিল্প সৃষ্টিতে। রূপনির্মাণের শক্তি জ্ঞানদাসের অসামান্য। তিনি একই সঙ্গে কবি ও শিল্পী। তাঁর সৃষ্টি তাঁর অন্তরের আবেগ মন্থন করা ধন, তাই তা অকৃত্রিম, সজীব ও সুন্দর। এর জন্য কবিকে কোনো আয়াস-লব্ধ অলঙ্কার শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়নি। অন্তরের ভাবরাশিকে তিনি সৌন্দর্য রসের তুলিকায় ডুবিয়ে পরিবেশন করেছেন এবং শিল্পী জনোচিত সূক্ষ্ম কারুকর্মে তাকে রূপ দিয়েছেন। তাই তাঁর হাতে ভাব ও রূপের অপরূপ যুগল মূর্তি রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই ভক্ত বৈষ্ণব কবির ভাবনায় তন্ময়তা ও মন্ময়তা, ভক্তি ভাবুকতা ও

কল্পনা প্রবণতা মিশে একাকার হয়ে তাঁর কবি প্রতিভার চূড়ান্ত শিল্পোৎকর্ষ ঘটিয়েছে। তাঁর কাব্যে তাই একদিকে আধ্যাত্মিক ভাবানুভূতি অপরদিকে মানবিক চেতনার অপূর্ব ও আশ্চর্য সমন্বয় সাধিত হয়েছে। তাই তাঁর সৃষ্ট রাধা অনেকখানি তাঁর আন্তরসত্তারই প্রতিফলিত রূপ। রাধার সঙ্গে রাধার সৃজনকর্তা প্রায় একাকার হয়ে গিয়েছেন বলেই রাধার বেদনা-বিষাদে কবিরও হৃদয়-বীণার সমস্ত তারগুলি ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। এই সৃষ্টির মধ্য দিয়েই কবি নিজের দেখাকে দেখেছেন এবং রাধার ভালোবাসায় কবি আপন মনের মাধুরী মিশিয়েছেন।

"জ্ঞানদাসের রাধা ধ্যানময়ী। আপন উপলব্ধির গভীরে প্রবেশ করে সে আত্মহারা"। তাই রাজকীয় প্রসাধন কলা বা গভীর সাধনবেগ জ্ঞানদাসের রাধায় নেই। তার মধ্যে আছে কেবল পরিপূর্ণ ভাবাকুলতা—

"আলো মুঞি জানো না জানো না
জানিলে যাইতাম না কাদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিল ছলিয়া নাগর ছলে।।
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কিবা করে প্রাণ।।"

এই সহজ সরল ভাষা, অথচ কী তীব্র তার অনুভূতি। রূপের পাথারে ডুবে থাকা চোখ, যৌবনের বনে হারিয়ে যাওয়া মন নিয়ে চলতে গিয়েই রাধা অনুভব করেছেন সেই অফুরন্ত পথকে, অন্তরের অন্তস্থলে ডুব দিয়ে শুনেছেন রক্তাক্ত হৃদয়ের ধকধক শব্দ— সেই শব্দ তার হৃদয় বিদীর্ণ করতে চায় অথচ তাকে ভাষা দেবার ক্ষমতা রাধার বা জ্ঞানদাসের নেই বলেই তাঁদের বলতে হয়েছে- "কিবা করে প্রাণ"। — এই বাণী কেবল অনুভূতির— পঞ্চেন্দ্রিয় একে ধরতে পারে না। দিব্য আবেশের মুহূর্তে কবির অন্তর থেকে এই অপূর্ব কাব্যোৎসারণ হয়েছে।

জ্ঞানদাস নিঃসংশয়ে প্রথম শ্রেণির পদকর্তা, কিন্তু হয়তো তিনি সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিভা সচেতন নন; যদিও তাঁর পদাবলিতে ভাষার পরিপাট্য, সংযত সুমিত ভাষণ-কৌশল, খুব কম শব্দের দ্বারা ভাবের মর্মভেদ ও মর্মোদ্‌ঘাটন করবার যথেষ্ট শক্তি রয়েছে, কিন্তু তবুও তাঁর মধ্যে ছিল একটি দ্বিধাগ্রস্ত মন। এই দ্বিধার কারণ সমসাময়িক যুগপ্রভাব এবং আপন প্রতিভা-সম্পর্কে কবির অসেচতনতা। তাঁর রচিত বাংলা ভাষায় লেখা পদ নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। কিন্তু আমরা জানি যে, তিনি ব্রজবুলি ভাষাতেও পদ রচনা করেছেন। বাংলা ভাষার অবলম্বন তাঁর প্রতিভার যতখানি উৎকর্ষ সাধন করেছে, পাশাপাশি ব্রজবুলি ভাষা তাঁর প্রতিভার অপকর্ষ ঘটিয়েছে ক্ষেত্র বিশেষে। এর কারণ, বাংলায় রচিত পদে সহজ ভাষা, ভাবের সরলতা ও অনুভূতির গভীরতা অনবদ্য শিল্পশ্রীমণ্ডিত হয়ে তাঁর কবি প্রতিভার স্বকীয়তাকে দীপ্ত করে তুলেছে। কিন্তু অতি সচেতনভাবে হিসেব করে লেখা ব্রজবুলি পদে কোথাও কোথাও তাঁর কবিকল্পনার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ প্রকাশ পেলেও, ক্ষেত্র বিশেষে তাঁর সচেতন অনুকরণ নীরস ও কৃত্রিম এক রূপের জন্ম দিয়েছে। আসল কথা, "ব্রজবুলি তাঁর কবিভাষা, প্রাণের ধাত্রী নয়"। স্বয়ংক্রিয় প্রতিভা, প্রবল রোমান্টিক ভাবাবেগ, ভাবানুষঙ্গ সৃজনের নিজস্ব ক্ষমতার সঙ্গে

প্রচলিত অলঙ্কারিক ভাষা ও ভঙ্গির আমন্ত্রণে যে কবিআত্মা সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মেতে উঠতে পারে— জ্ঞানদাসের মধ্যে সেই প্রচলিত অলঙ্কারিক ভাষা ও ভঙ্গি সম্পর্কে একটি দ্বিধাগ্রস্ত মন ছিল। তাই ব্রজবুলির পদে জ্ঞানদাসের ব্যর্থতা। অপরূপ কবি কল্পনাকে ভাষার দুর্বলতা এসে কীভাবে খণ্ডিত করেছে তার একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে—

"হাম কুলবতী কুল কণ্টক ভেল।
কাতিয় রাতি দীপ জনু দেল।। ......"

রাধা নিজের কলঙ্ককে কার্তিকের আকাশ প্রদীপের মতো তুলে ধরেছেন। প্রেম-প্রদীপ জ্বেলে যেন অনন্ত নিশাকাশতুল্য কৃষ্ণের প্রকাশ্য আরতি করেছেন রাধা। এমন অসাধারণ ভাবকল্পনা, পৃথিবীর আলোকে আকাশের পূজার এক আশ্চর্য কাব্য রচিত হয়েছে এখানে। সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে এই ভাবকল্পনা বিরল। কিন্তু কাব্যরূপ গঠনে কৃত্রিম ভাষা এর সকল শ্রী বিনষ্ট করেছে। এই গভীর ভাবকে নষ্ট করার মূলে রয়েছে এর ভাষা। আসলে জ্ঞানদাস ব্রজবুলির মূল সৌন্দর্যকে ধরতে পারেননি বলেই কেবল অনুসরণ ও অনুকরণে এই ভাষা বিভ্রাট ঘটেছে তাঁর পদে।

জ্ঞানদাস রূপ দর্শন করেছেন— কিন্তু তিনি আত্মবিস্মৃত কবি নন, তাঁর রূপদর্শন এক হিসেবে তাই স্বরূপ দর্শন। তাঁর দেখায় ও রচনায় প্রভেদ রয়েছে। তাই বস্তুর যথাযথ ছবি নয়, তাঁর কাব্যে আছে কবির দর্শনজাত আত্মস্ফূর্তি। ফলে যেখানে রূপ ও স্বরূপ, মন্ময়তা ও তন্ময়তা একাকার হয়ে গেছে, সেখানে কবির অন্তরাত্মা থেকে ধ্বনিত হয় তাঁর নিজস্ব উপমাদি—

"গিরির উপরে এই দুই তমাল
চারি শাখা আছে ধরি।।
তাহে আছে সখি একটি তমাল
নব ঘন সম দেখি।।
একটি তমাল সোনার বরণ
শুনলো মরম সখি।।
তাহে ফলিয়াছে অরুণ বরণ
এ চারি উত্তম ফল।
ফলের উপর ফুল ফুটিয়াছে
নাহি তার শাখা দল।।"

রাধা কৃষ্ণের যুগল রূপের বর্ণনায় সুদূর প্রসারী কবিকল্পনার এই যে অর্থঘন অভিব্যক্তি তা ভাস্কর শিল্পের গম্ভীর ভাস্বরতা লাভ করেছে।

কল্পনার বিস্তার ও অর্থের গভীরতায়, উপমা অলঙ্কার প্রয়োগের অভিনবত্বে, বাক্‌সংযম ও ছন্দোরীতির বৈশিষ্ট্যে জ্ঞানদাস অদ্বিতীয়। "ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ", "এ ঘর বসতি অনলের খনি" "যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল" ইত্যাদি অলঙ্কারের অভিনব প্রয়োগে জ্ঞানদাসের সমকক্ষ মধ্যযুগের কবির দেখা পাওয়া ভার।

তাঁর কাব্যে রূপের বস্তুবিদ্ধ ছবিও মাঝে মধ্যে কিছু কিছু রয়েছে। কিন্তু একান্ত লৌকিক, কিছু গ্রাম্য শব্দের ব্যবহারে, রূপদর্শন-জাত মানস-হিল্লোল ব্যক্ত করায়, বিস্ময়রসে ডুবে যাওয়ার ব্যঞ্জনায় তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্যই অভিব্যক্ত। যেমন—

"আলো মুক্তি জানো না" অথবা "দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা"— এই জাতীয় লৌকিক, গ্রাম্য মেয়েলি ভাষা যে বৈষ্ণব পদাবলির রাধার ভাষা হয়ে ফুটে উঠে তাতে কাব্যরস সিঞ্চিত করতে পারে তা জ্ঞানদাসই দেখিয়েছেন।

ছন্দের ব্যবহারে জ্ঞানদাস আপন কল্পনার খেয়ালে পরিচালিত হয়েছেন। কোথাও কোথাও ছন্দের ক্ষেত্রে কবি আপন সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ ঃ

(ক) জ্ঞানদাসের মধ্যে অসামান্য রূপনির্মাণের শক্তি ছিল।

(খ) জ্ঞানদাসের ভাষা সহজ সরল, অথচ তীব্র এবং গভীর তাঁর অনুভূতি।

(গ) জ্ঞানদাস বাংলা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাই ব্যবহার করেছেন পদাবলি রচনার ক্ষেত্রে, কিন্তু যখন তিনি বাংলা ভাষায় রচনা করেছেন তখন তাঁর কাব্য সহজ ভাষায়, সরল ভাবে, অনুভূতির গভীরতায় অভূতপূর্ব শিল্পশ্রীমণ্ডিত হয়েছে যা তাঁর প্রতিভার স্বকীয়তাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। কিন্তু তাঁর কাব্যে অতি সচেতন ভাবে তিনি যখন ব্রজবুলি ভাষা ব্যবহার করেছেন, তখন তা কখনো স্বতঃস্ফূর্ততা আনলেও ক্ষেত্র বিশেষে তা তাঁকে আড়ষ্ট ও কৃত্রিম করে তুলেছে।

(ঘ) জ্ঞানদাস রূপের পূজারী। কিন্তু তাঁর দেখায় ও লেখায় আছে পার্থক্য। তাঁর কাব্যে তাই আমরা বস্তুর যথাযথ ছবি পাই না, পাই তাঁর দর্শনজাত আত্মস্ফূর্তির গভীর রূপটিকে। সেই গভীর অনুধ্যান থেকেই উঠে এসেছে তাঁর অলঙ্কার। আর ছন্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে জ্ঞানদাস আপন কল্পনার খেয়ালে পরিচালিত হয়েছেন।

আত্ম সমীক্ষামূলক প্রশ্ন ঃ

(১) রূপনির্মাণের শক্তি জ্ঞানদাসের অসামান্য। —একটি উদাহরণ দিয়ে তা বিশ্লেষণ করে বোঝান।

....

....

(২) জ্ঞানদাসের মধ্যে ছিল এক দ্বিধাগ্রস্থ মন। —সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

....

....

(৩) ব্রজবুলিতে কাব্য রচনার ক্ষেত্রে জ্ঞানদাস যে কৃত্রিম ও আড়ষ্ট— একটি উদাহরণ দিয়ে বিশ্লেষণ করুন।

....

....

(৪) জ্ঞানদাস চিরকালের রসিক পাঠকের চিত্তহরণকারী। —কেন, আলোচনা করুন।

....

....

১.৬ সংযোজন

বৈষ্ণব পদাবলি অবলম্বনে আমরা যে চারজন পদকর্তা ও তাঁদের কাব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, সেখানে প্রাসঙ্গিক হলেও কিছু জিনিস আমাদের বাদ দিতে হয়েছে। এই বাদ দেবার স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ছিল। পদাবলি সাহিত্যে চারজন মহাজন পদকর্তা সম্পর্কে গভীর ভাবে জানার জন্য, তাঁদের পদাবলির বৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে জানার জন্য এই বাদ-দেওয়া বিষয়গুলিই সর্বাপেক্ষা জরুরী। স্বতন্ত্রভাবে কবিবিশেষের আলোচনার ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত বিষয়গুলি যদি সাধারণভাবে নজরে পড়ে তবে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলিই থেকে যাবে জানার অন্তরালে। তাই সেই অতিরিক্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিশেষভাবে উপস্থাপনা করাই এই অধ্যায়ে আমাদের উদ্দেশ্য।

আলোচ্য অধ্যায়ে আপনারা জানতে পারবেন—

- কবি চণ্ডীদাস সম্পর্কে উত্থাপিত সমস্যা ও তার সমাধানের প্রচেষ্টা।
- বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবি প্রতিভা এবং পদাবলির তুলনামূলক আলোচনা।
- বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের কবি প্রতিভা এবং পদাবলির সাধর্ম্য ও পার্থক্য।
- চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের তুলনামূলক আলোচনা।

১.৬.১ চণ্ডীদাস সমস্যা

বাংলা ১৩২৩ সালে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য প্রকাশিত হয়। এর পূর্বেই বাঙালি রসিক পাঠক ও বৈষ্ণব সমাজ কবি চণ্ডীদাসের মধুস্বাদী পদাবলির সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিল। চণ্ডীদাসের পদাবলি সব পাঠকের চিত্ত একান্তভাবে হরণ করেছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য চণ্ডীদাসের পদাবলির রসাস্বাদন করে যে অপার আনন্দ লাভ করেছিলেন, তার ঐতিহাসিক সত্য আমরা পাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে। ১৩০৫ সালে নীলরতন মুখোপাধ্যায় ও ১৩২১ সালে ব্যোমকেশ মুস্তাফী চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত কিছু কিছু অপকৃষ্ট পদ প্রকাশ করেন। তখন থেকেই কবি চণ্ডীদাস সম্পর্কে অনেকের সংশয় জাগে। সেই সংশয় ঘনীভূত রূপ ধরে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি প্রকাশের পর। একাব্য ভোগ বাসনা সংরক্ত ও গ্রাম্যতা দুষ্ট রাধাকৃষ্ণের স্থূল প্রণয় কাব্য। একাব্যের কাহিনি ও বিষয়বস্তু চণ্ডীদাসের পদাবলি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ফলে এই ধারণা দৃঢ় হল যে, বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলির চণ্ডীদাস অভিন্ন নন। আর সবথেকে বড় কথা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' মতো এত স্থূল রুচির কাব্য মহাপ্রভুর মতো প্রেমিকের পক্ষে আস্বাদন করা সহজ কথা নয়।

চণ্ডীদাস-সম্পর্কিত এই সমস্যা আরো প্রবল হয়ে ওঠে অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু কর্তৃক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি শাখা থেকে দীন চণ্ডীদাসের পুঁথি আবিষ্কারের পর। এই পুঁথিতে চণ্ডীদাসের একাধিক রূপান্তরিত নাম আছে। কাব্যের বিষয়বস্তু চৈতন্য পরবর্তী ধর্ম ও রসশাস্ত্রানুসারী। ফলে বলা হল চণ্ডীদাস দুইজন— চৈতন্য-পূর্ববর্তী শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা চণ্ডীদাস এবং চৈতন্য পরবর্তী দীন চণ্ডীদাস। কিন্তু সমস্যা হল অন্যত্র। অধ্যাপক বসুর আবিষ্কৃত গ্রন্থে প্রথম শ্রেণির কোনো কবিতা নেই। দীর্ঘকাল ধরে রসিক বাঙালি পাঠক সমাজে যে চণ্ডীদাস পরিচিত, তিনি অপর কেউ হতে পারেন এমন ধারণা শুরু হল।

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বর্ধমান জেলার বনপাশ গ্রাম থেকে চণ্ডীদাস পদাবলির একটি বড় পুঁথি আবিষ্কার করেন যা অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসুর দীনচণ্ডীদাসের পদাবলির বিস্তৃত সংস্করণ।

ড. শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থে চণ্ডীদাস সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করতে প্রয়াসী হন। তাঁর মতে বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্যপূর্ব-যুগের কবি এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে অপর একজন চণ্ডীদাস ছিলেন যিনি পদাবলিতে একাধিক ভণিতা ব্যবহার করেছেন।

ড. বিমান বিহারী মজুমদার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলি গ্রন্থের ভূমিকায় শুধু চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত ১২টি পদের কবিকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি বলেছেন। তিনি চৈতন্য-পরবর্তী দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে দেহাতীত প্রেমলীলার সূক্ষ্ম-ভাবের প্রকাশ লক্ষ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে চৈতন্য-পরবর্তী যুগে দীন চণ্ডীদাস ছাড়া দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে অপর একজন কবি ছিলেন। আসল কথা চণ্ডীদাস ভণিতা যুক্ত কতগুলি পদে বৈষ্ণবীয় তত্ত্বাদর্শ সুন্দর ভাবে অনুসৃত হবার জন্যই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় চণ্ডীদাসের পদাবলির ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে কতগুলি পদকে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলে অভিমত প্রকাশ করেন যদিও, কিন্তু এই সিদ্ধান্তের কোনো সূত্রের উল্লেখ করেননি।

অধ্যাপক মনীন্দ্র মোহন বসুর মতে প্রকৃতপক্ষে দীন চণ্ডীদাসই পদাবলির চণ্ডীদাস। তাঁর মতে দীন চণ্ডীদাস অনেক উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেন। কিন্তু অধ্যাপক বসু আপন সিদ্ধান্তের সপক্ষে কোনো বলিষ্ঠ প্রমাণ উপস্থাপিত করতে পারেননি।

তবে, একথা সত্য যে চণ্ডীদাস একজন হতে পারেন না। অন্তত দুইজন, কয়েকজন চণ্ডীদাস কল্পনা করাও অসম্ভব নয়। তবে সবই কল্পনামাত্র। এঁদের মধ্যে দুজনের অস্তিত্ব সুনিশ্চিত— চৈতন্য-পূর্ববর্তী বড়ু চণ্ডীদাস এবং চৈতন্য-পরবর্তী দীন চণ্ডীদাস। অপর একজন চণ্ডীদাসকে অনেকে বলেছেন যে তিনি বড়ু চণ্ডীদাসই, কোনো এক অলৌকিক রূপান্তরে পদাবলির কবি। আর পদাবলির চণ্ডীদাস পৃথক অস্তিত্বহীন— কিছুটা বড়ু চণ্ডীদাসের, বহুলাংশে দীন চণ্ডীদাসের এবং কিছু অন্যের পদের সমাহারে এই কবির কাব্যদেহ গঠিত হয়েছে। বলা যায়, এই কবি 'তিলোত্তমা'কে গঠনের মূলে রয়েছেন অশিক্ষিত লিপিকর, ভাবোন্মত্ত কীর্তনীয়াগণ।

এই কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চণ্ডীদাসের নামে বিপুল সংখ্যক পদ যুক্ত হয়েছে। সেই পদগুলি সব সমমানের নয়, হয়তো তা একই কবির রচনাও নয়। চণ্ডীদাসের এমন এক মনমাতানো সুর ছিল, যে-সুরে মজে গিয়ে অনেক সাধারণ বাঙালিও নিজেদের রচনা চণ্ডীদাসের নামে যুক্ত করে কৃতার্থ হয়েছেন। যেখানে তাঁরা পশ্চাৎপদ হয়েছেন, সেখানে এগিয়ে গেছেন কীর্তনীয়াগণ। কীর্তনীয়ারা কখনো ত্রুটি সংশোধন করেন; ফলে অন্যের পদ চণ্ডীদাসের নামেও ব্যবহৃত হয়েছে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন ভক্তির আবদার নিয়ে বলেছেন যে, তিনি চণ্ডীদাসের পদ চিনতে পারেন; চণ্ডীদাসের আলোচনায় তিনি বলেছেন— "চণ্ডীদাসের কবিতা আমার আশৈশব সুখদুঃখ ও বহু অশ্রুর উৎস স্বরূপ, হৃদয়ের প্রগাঢ় উচ্ছ্বাসে তাঁহার কবিতার আলোচনা সম্ভবপর হইবে কিনা বুঝিতে পারি না।" —আমরা দীনেশচন্দ্রের এই আকুল ভক্তি-আবেগকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে বলি, তিনি চণ্ডীদাসের পদ প্রাণভরে আস্বাদন করেছেন, কিন্তু তার সবকটি পদ হয়তো একই কবির রচনা নয়। আসলে পদগুলি এত অধিক পরিমাণে চণ্ডীদাসের ভাবানুপ্রাণিত পদ যে, আসল-নকল একাকার হয়ে গেছে। বড়ু চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত অন্য কবির পদ মূল চণ্ডীদাসের পদের মধ্যে এমন ভাবে বিলীন হয়ে গিয়েছিল যে— কোনো ভাব-বিভাজন রেখা তাদের বিযুক্ত করতে পারেনি। আত্মদানের এখানেই পরম ও চরম রূপ, বিদ্যাপতির ভাষায়—

"অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মধাঈ।"

তবে বলা যায়, পদাবলির চণ্ডীদাস একজন ছিলেনই, যিনি নিজের জীবনে ও সাধনায় বাঙালিকে তার পবিত্রতম কাব্যাধিকার দিয়েছেন। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলির শ্রেষ্ঠ অংশটুকু সাধারণভাবে তাঁরই রচনা।

এর পরেও একটি বৃহত্তর সমস্যা থেকে যায়— যা বাঙালির ভাব জীবনের গঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চণ্ডীদাস চৈতন্য-পরবর্তী কবি হলে এই দায়িত্ব প্রায় সম্পূর্ণভাবে মহাপ্রভুর উপর অর্পিত হয়। তবে কি মহাপ্রভু পদাবলির চণ্ডীদাসকেও নির্মাণ করেছিলেন? সেই মুহূর্তেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে 'চৈতন্য চরিতামৃতে'র সেই ঐতিহাসিক তথ্যের উপর। যে-চণ্ডীদাস স্বয়ং মহাপ্রভুকে রসাবিষ্ট করতেন তিনি নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী কবি নন, অতএব মহাপ্রভুর হাতে তৈরি সে-চণ্ডীদাস নন। তিনি যদি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র বড়ু চণ্ডীদাসও হন, তবে এক্ষেত্রে তাঁর কাব্য-কৃতিত্বকে মেনে নিয়েও বলা যায় যে, বাঙালির মনোজীবনে তাঁর অবদান সামান্যই। কিন্তু পদাবলির চণ্ডীদাসের সর্বাঙ্গে এত বেশি চৈতন্য-দ্যুতি যে বলতে ইচ্ছে হয় তিনি চৈতন্যের পরেই এসেছেন। যেমন—

"অকথন বেয়াধি সই কহনে ন যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়।।
পায়ে ধরি কাঁদে তার চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতুলি যেন ধূলায় লুটায়।।"

এই চণ্ডীদাসের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পদের সঙ্গে 'উজ্জ্বলনীলমণির' অংশবিশেষের গভীর ঐক্য আছে। এর থেকে একথা ভাবা যায় যে, হয় 'উজ্জ্বলনীলমণি'-কার চণ্ডীদাসের পদের প্রেরণা গ্রহণ করেছেন অথবা চণ্ডীদাস চৈতন্য-পরিকরের নিকট ঋণী।

আরো একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় এবং লক্ষণীয় যে, চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যের যতখানি নিকটে— চৈতন্য-তত্ত্বের ঠিক ততখানি দূরে। শ্রীচৈতন্যের ভাব-মহিমায় আলোকিত চণ্ডীদাসের কাছে চৈতন্য-শাস্ত্র কী ভাবেই-না অস্বীকৃত হয়েছে। এইজন্যই চণ্ডীদাসকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি বলে মনে হওয়া কোনোমতেই অসংগত নয়। চৈতন্যের প্রেমকে জীবন-সর্বস্ব করে তাঁর প্রেমের দার্শনিক ভিত্তিকে এমন করে আর কেউ অতিক্রম করেননি। শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী কালে বৈষ্ণব-পরিমণ্ডলীতে আবির্ভূত হয়ে আর কোনো কবি এতখানি বিজয়ী ব্যক্তিত্বকে ঘোষণা করতে পারেননি। এই ব্যক্তিত্বের অন্যতম প্রমাণ রয়েছে কাব্য গঠন ব্যাপারে চণ্ডীদাসের স্বাধীনাচারে, বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্র-বহির্ভূত লোকজীবন থেকে উপমাদি সংগ্রহে। চৈতন্য-পরবর্তী কবিরা প্রাকৃত জীবন-পাত্রের উচ্ছ্বলিত সুরাকে দিব্যরূপে রূপান্তরিত করতে গিয়ে কাব্য শাস্ত্রের বন্ধনীবদ্ধ বৃন্দাবন রচনা করেছেন। জীবন রসের কাব্য যে কতখানি জীবনমৃত্তিকা বর্জিত হতে পারে, চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবকাব্যই তার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু চণ্ডীদাসের যদি কোনো স্বর্গ থাকে তবে তা পৃথিবীতেই আছে। চণ্ডীদাসের ছিল পবিত্র পার্থিবতা, অন্যান্য কবিদের ক্ষেত্রে তা অপার্থিব পবিত্রতা।

অন্যান্য কবিদের ক্ষেত্রে যেহেতু গোস্বামীকৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুশাসন স্বীকৃত, তাই সেখানে জীব তটস্থা শক্তির— এবং সেই অতীন্দ্রিয় লোকে তার প্রবেশের অধিকার নেই, কেবল দূর হতে তা সে আস্বাদন করতে পারে মাত্র। কিন্তু চণ্ডীদাসের কাব্যে সকলের অবাধ অধিকার। নশ্বর জীবন তাঁর কাব্যে জীবনের চিরন্তনতায় উন্নীত হয়ে মানুষের অধিকারলোককে বিস্তৃত করেছে স্বর্গ-সীমার ও-প্রান্তে। তাঁর কাব্য তাঁর রাধা একাধারে বচনীয় ও অনির্বচনীয়ের।

চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধান করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। তবুও পণ্ডিতমণ্ডলীর বিচার বিতর্ক ও সিদ্ধান্তের অনুসরণে আমরা যে-সমাধানে এসে পৌঁছাই তাতে দেখি, চণ্ডীদাস চারজন— চৈতন্য-পূর্ববর্তী দুইজন এবং চৈতন্য-পরবর্তী দুইজন। প্রথম দুইজন যথাক্রমে বড়ু চণ্ডীদাস ও পদকর্তা চণ্ডীদাস। এই পদকর্তা চণ্ডীদাসেরই কোনো অজ্ঞাত পদ মহাপ্রভু আস্বাদন করে থাকবেন হয়তো। সম্ভবত তিনিই পদাবলির অনেক পদ রচনা করেন। চৈতন্যোত্তর একজন হলেন দীন চণ্ডীদাস— তিনি দ্বিতীয় শ্রেণির নীরস পদাবলির রচয়িতা; অপরজন দ্বিজ চণ্ডীদাস। এছাড়া সহজিয়া ভাবের সাধক একাধিক চণ্ডীদাস হয়তো ছিলেন।

পদাবলির চণ্ডীদাস সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তীও আছে। তাছাড়া চণ্ডীদাসের বাসস্থান নিয়েও মত-বৈষম্য আছে। তবে কোনো চণ্ডীদাসই কবিতায় তাঁদের ব্যক্তি পরিচয় দেননি বলে এসম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

বলা যায় বড়ু চণ্ডীদাস ভিন্ন অন্য সকল চণ্ডীদাসই পদাবলি-মহাসমুদ্রে তাঁদের আপন অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা তিন বা ততোধিক হতে পারেন। পদাবলির ভাব ভাষা ও রচনারীতিকে আশ্রয় করে কিছু যুক্তি, তথ্য ও অনুমানের সাপেক্ষে মোটামুটি এই সমস্যার এক ঐতিহাসিক সমাধানে আসার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু তাতে শেষ কথা বলা হয় না।

১.৬.২ তুলনামূলক আলোচনা

বর্তমানে আমরা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস— এই চারজন কবির তুলনামূলক আলোচনা করব। এঁদের মধ্যে কিছুটা সাধর্ম্য এবং প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস— এঁরা চৈতন্য-পূর্ববর্তী বৈষ্ণব পদকর্তা। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস চৈতন্য-পরবর্তী পদকর্তা। পদাবলি আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে গোবিন্দদাসকে বলা হয়েছে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'। যদিও বিদ্যাপতির ভাষা এবং কাব্যের সঙ্গে গোবিন্দদাসের ভাষা এবং কাব্যের প্রচুর মিল আছে, তথাপিও চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব ভক্তকবি গোবিন্দদাসের কবি প্রতিভার নিজস্ব বিশিষ্টতা রয়েছে। আবার জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হলেও যুগ-ধর্ম বৈশিষ্ট্যে এঁদের পার্থক্য রয়েছে। শুধু তাই নয়, একই যুগের হয়েও চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কবি-ভাবনা এবং পদাবলির মধ্যে এক সুদুর পার্থক্য বর্তমান। আলোচ্য পর্যায়ে এই সকল সাধর্ম্য-পার্থক্যের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.৬.২.১ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস

বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের সাধর্ম্য একটিই, তা হলো উভয়েই চৈতন্য-পূর্ববর্তী বৈষ্ণব পদকর্তা। পদাবলি সাহিত্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস রাধা-কৃষ্ণ-লীলার পাদপ্রদীপের আলোয় যেন দুটি ধারাই সৃষ্টি করেছেন। তাই সমকালীন যুগের এই দুই মহাজন পদকর্তার স্বাতন্ত্র্য আমাদের বর্তমান বক্তব্যের বিষয় বস্তু।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে প্রাচ্য খণ্ডের দুই শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবি— চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। দুজনেই যুগ-সহচর ও যুগ-সহোদর। কবি নবীনচন্দ্র সেন বলেছেন যে, দুজনেই 'কালের সাক্ষী'। বৈষ্ণব পদাবলি রচনায় দুজনেই বাংলা সাহিত্যে কবিপ্রতিভার মৌলিক স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কিন্তু জীবনবোধের ভিন্নতায় দুজনের রচনাই স্বতন্ত্র স্বর্ণলেখায় সুচিহ্নিত।

বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস জন্মসূত্রে ভারতের দুই ভিন্ন প্রদেশের বাসিন্দা। বিদ্যাপতির জন্ম মিথিলায় এবং চণ্ডীদাসের জন্ম বাংলাদেশে। পারিবারিক সূত্রে বিদ্যাপতি মিথিলার রাজ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত। তিনি নিজেও মিথিলার রাজসভায় রজাসভাকবির পদ অলংকৃত করেছিলেন। চণ্ডীদাসের পারিবারিক কাহিনি কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি যে নান্নুর গ্রামে অর্থাৎ গ্রাম বাংলার শ্যামল মাটির বক্ষ জুড়ে বিরাজ করেছেন, তার প্রমাণ রয়েছে। নান্নুর গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বাশুলির সেবক ছিলেন তিনি। বিদ্যাপতি ছিলেন পঞ্চদেবতার উপাসক এবং বিশেষভাবে শৈব। মৈথিলি ভাষায় তিনি বহু শৈব পদ রচনা করেছেন, এবং সৌন্দর্যের উপাসক কবি হিসেবেই তিনি অন্যান্য পদের মতো রাধা-কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদও রচনা করেছেন। চণ্ডীদাস প্রথম জীবনে ছিলেন শাক্তদেবী বাশুলির ভক্ত সেবক এবং পরবর্তীকালে তিনি সহজিয়া সাধক। এই সহজিয়া সাধনার রহস্য অনুধাবণ করার জন্য তাঁর রাধা-কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদাবলি সাহিত্যেও এক অভিনব সুর সংযোজিত হয়েছে।

চণ্ডীদাস এক না একাধিক— তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে এক ঐতিহাসিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু বিদ্যাপতির কোনো কোনো কবিতা সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ থাকলেও

তাঁকে নিয়ে এ-জাতীয় সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। চণ্ডীদাসকে কেন্দ্র করে তাই বহু কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছে।

বিদ্যাপতি স্মার্ত পৌরাণিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'কীর্তিলতার ভূমিকা'য় বিদ্যাপতি সম্পর্কে যে-তথ্য দিয়েছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— "তিনি মিথিলা, বাঙলা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের ব্রাহ্মণের ন্যায় স্মার্ত ও পঞ্চোপাসক ছিলেন।" তাই বলা যায় যে বিদ্যাপতির কাব্য প্রেরণার উৎসে বৈষ্ণব ভাবনা আদৌ সক্রিয় ছিল না। কারণ দীর্ঘজীবী বিদ্যাপতির চিত্ত বিচিত্র বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং নানা বিষয়ের গ্রন্থ রচনায় তিনি বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাই বলা যায়, বৈষ্ণব বিষয় তাঁর সমগ্র সৃষ্টির একটি অংশ মাত্র। এছাড়াও রাজপরিবারের সঙ্গে কর্মসূত্রে ঘনিষ্ঠ হবার ফলে রাজসভাসুলভ বিশেষ মানস তাঁর অন্তরের সামগ্রী হয়েছিল। প্রচলিত জ্ঞানকর্মের চর্চা, রসের আলোচনা, রাজসভার পরিবেশ— সব মিলিয়ে সেকালের নাগর বৈদগ্ধ্য তথা সভ্যতার অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন তিনি। এরই ফলে তিনি ছিলেন অতি সচেতন শিল্প-প্রবুদ্ধ চিত্তের অধিকারী। তাই খাঁটি রসকাব্য রচনাকালে রাধাকৃষ্ণের মুক্ত প্রেমের লীলাবিচিত্র মাধুর্যকেই তিনি উপকরণ হিসেবে সবচেয়ে যোগ্য বলে মেনে নিয়েছিলেন।

অপরদিকে চণ্ডীদাস ছিলেন সহজিয়া ধর্মমতাবলম্বী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মতো সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনাতেও মানবমহিমা স্বীকৃত হয়েছে, তবে তা ব্যাপকতর, গভীরতর অর্থে। এখানে মানুষের ভেতরেই ঈশ্বরের লীলাকে প্রত্যক্ষ করা হয়।

রাধাকৃষ্ণের লীলাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলেন, 'মহাভাব স্বরূপ', সহজিয়া বৈষ্ণবের কাছে তা 'প্রেম' যার প্রতিশব্দ 'পিরীতি'। এই সহজিয়া সাধনার অঙ্গরূপে রয়েছে পিরীতি-তত্ত্বের বন্দনা ও কিশোরী ভজনা। এই কিশোরী হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীরাধা। চণ্ডীদাসের পদে অজস্রবার পিরীতিতত্ত্ব ও কিশোরীতত্ত্ব বিশ্লেষিত ও বন্দিত হয়েছে। সহজিয়াগণ রাই-কিশোরীর ভাবারোপে নিজ কিশোরীর সেবা করেন। চণ্ডীদাসও তাঁর কিশোরী রজকিনী রামীর স্তুতিতে বলেছেন—

"শুন রজকিনী রামী।
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি।।......
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।"

—এ কেবল নিছক প্রেমোচ্ছ্বাস নয়, এর পেছনে রয়েছে চণ্ডীদাসের ধর্মদর্শন। তাঁর ধর্মমতের রূপটিই এই— দেহ থেকে দেহোত্তরতায় উন্নয়ন। তাই চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা এবং চণ্ডীদাস-রামীর অবৈধ পরকীয়া প্রেম একাকার হয়ে গিয়েছে; শুধু তাই নয়, চণ্ডীদাসের নিজের প্রাণ-যন্ত্রণার সৃষ্টি-প্রতিমাও রাধিকা। তবে তাঁর পদাবলির সবটুকু অংশেই হয়তো রামী নেই, কিন্তু তাঁর পরকীয়া প্রেমের বিশেষ রূপটির যথেষ্ট প্রভাব ছিল রাধার প্রেম স্বভাবের উপর।

সহজিয়ারা সহজ পথের পথিক। তাঁদের প্রেম অন্তরের অতি গভীর লোকে বাস করে। কিন্তু তার সহজ সরল প্রাণময় মূর্তি কেবল অনুভববেদ্য, বুদ্ধিগম্য নয়। বাইরের

বস্তুরূপে নয়, অন্তরের একাকীত্বে এই প্রেম বহমান। চণ্ডীদাস মূলত কবি প্রাণের অধিকারী ছিলেন বলেই সহজিয়া তত্ত্ব বিবৃত না করে সেই সাধন তত্ত্বের মধ্য থেকে এক সুগভীর প্রেমদৃষ্টি আয়ত্ত করার প্রেরণা লাভ করেছেন। রাধার ভাবানুভূতিকে দূর থেকে নিরাসক্ত দর্শক বা আর্টিস্টের মতো দেখে তার ছবি তিনি আঁকতে পারেননি। তাঁর রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক পদাবলি তাই বিদ্যাপতির মতো শিল্পচর্চার সৌন্দর্যের ফসল নয়, তাঁর পদাবলিতে তাই কবির ব্যক্তি-অনুভূতি ও প্রেমবোধের আর্তি ঝঙ্কার তোলে।

চণ্ডীদাস খাঁটি বাঙালি কবি। বাঙালির প্রাণরস সর্বাধিক উৎসারিত চণ্ডীদাসের অশ্রুসজল কাব্যে। মধ্যযুগে তিনিই প্রথম বাঙালিকে আত্মদর্শন ও আত্মনিবেদনের বাণী সৌভাগ্য দান করেছিলেন। তাঁর কোনো কোনো পদাংশ প্রেম-প্রবাদে পরিণত হয়েছে। যেমন— "তোমারি লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ", "আপন করম লেখা, দোষ কারে দিব", "কলঙ্ক কলসী লৈয়া ভাসিব পাথারে", "শাশুড়ী ক্ষুরের ধার, ননদিনী জ্বালা", "জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে" ইত্যাদি। অতি গভীর ভাবসত্যকে চণ্ডীদাসের মতো সাধারণীকৃত করার ক্ষমতা আর কারো নেই, তিনি গণপ্রাণের মর্মলোকের কবি।

বিদ্যাপতি প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি। আঞ্চলিকতার দিক থেকে তিনি মৈথিল কবি। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় প্রেম-কবিতার স্বাভাবিক সার্থক পরিণতি তাঁর মধ্যে ঘটেছে। বিদ্যাপতিকে ভারতবর্ষের কাব্যধারার মধ্যেই স্থাপন করে বলা যায়, ভারতবর্ষীয় প্রেম-কবিতাধারার আধুনিক-পূর্ব যুগের শ্রেষ্ঠ কবি তিনি। ভারতবর্ষের শৃঙ্গাররসমূলক কাব্যধারাকেই তিনি আত্মসাৎ করেছেন, অথচ তার মধ্যে নতুন সংযোজনও ঘটিয়েছেন। তাঁর পদে প্রেমের দেহ-মন-আত্মার ত্রিবিধ মহিমাই পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি মূলত দেহধর্মী কবি। আদর্শবাদী ও ভোগরাগময়— উভয় শ্রেণির প্রেমকেই তিনি এঁকেছেন। রাজসভার কবি তিনি, স্মার্ত পণ্ডিত। সংস্কৃত, অবহট্‌ঠ প্রভৃতি ভাষায় যেমন তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল, তেমনি শৃঙ্গার শাস্ত্র, অলঙ্কার শাস্ত্র প্রভৃতিতেও তাঁর অসামান্য দখল ছিল। এই জ্ঞান, পাণ্ডিত্য তাঁর রচনাকে অভিজাত, বৈদগ্ধ্যপূর্ণ, রসময় করে তুলেছে। তাঁর কাব্যের আবেদন তাই মূলত শিক্ষিত, বিদগ্ধ রসিক মনের কাছে। আবার সামাজিক পরিবেশের অনুকূল করে বহু সময় তাঁকে সংস্কৃত কাব্যরস লৌকিক ভঙ্গিতে ঢেলে সাজাতে হয়েছে, গ্রাম্য উপমা ও লৌকিক বচন যুক্ত করতে হয়েছে তাঁর কাব্যে। তবুও তাঁকে অভিজাত নাগরিক জীবনের কবিই বলা যায়।

বৈষ্ণব পদাবলিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে নানা পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, সেগুলি মূলত মানব-জীবনেরই প্রেম পর্যায়। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের বিশেষত্ব হল— তাঁরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে এই পর্যায়ের মধ্যে রেখেও অনন্ত প্রেমের শুদ্ধ স্বরূপে তাকে চিরমুক্ত চিরনির্মল করে তুলেছেন।

বৈষ্ণব কবিকুলের মধ্যে এক্ষেত্রে চণ্ডীদাস অনন্য। তিনি সহজের কবি, সারল্যের কবি। সত্যের সরলতায়, উপলব্ধির জ্যোতির্ময়তায় তাঁর কাব্য উদ্ভাসিত। ভাষার সৌন্দর্য, অলঙ্কারের নৈপুণ্য, ভাবের চারুত্বের সাহায্য না নিয়েও সহজ সত্যের পথে চণ্ডীদাস আমাদের নিয়ে গেছেন প্রেমের স্বর্গোদ্যানে। তাঁর পদাবলিতে রূপের ঐশ্বর্য তরঙ্গভঙ্গ, শব্দের চূর্ণ ঝঙ্কার, বর্ণের বাসন্তী উচ্ছ্বাস কিংবা রসকৌতুকের নর্মলীলা প্রত্যাশা মতো পাওয়া যায় না। আসলে তিনি 'মরম' ও 'ধরমের' কবি।

অপরদিকে বিদ্যাপতির কাব্যে সহজ সারল্য নেই। তিনি নাগরিক নিপুণ বিদগ্ধ কবি। তাঁর শাণিত পদ কেবল রসিক চিত্তকে মন্ত্র মুগ্ধ করে রাখে না— তা অলঙ্কারের চাকচিক্যে চোখ ধাঁধায়, শৃঙ্গার কলার অসাধারণ নৈপুণ্যে অনুভাবিত করে, পাণ্ডিত্যের সুচারু প্রকাশে বুদ্ধিকে জাগ্রত করে, মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণে বিস্ময়াভিভূত করে। তাঁর কাব্যে প্রেমের মণ্ডনকলা আছে-কেবল বিভোর হয়ে সেই প্রেম আস্বাদন করা যায় না।

চণ্ডীদাসের পদাবলির প্রধান পাঁচটি পর্যায়— শ্রীরাধার পূর্বরাগ, রসোদ্গার, আক্ষেপানুরাগ, বিরহ ও আত্মনিবেদন।

বিদ্যাপতির প্রেমপদাবলিকে মূলত তিনটি ভাবে ভাগ করা যায়। —লৌকিক প্রেম, নাগরিক প্রেম এবং আধ্যাত্মিক প্রেম। বয়ঃসন্ধি, অভিসার, মিলন, মান, মাথুর, ভাবসম্মিলন, প্রার্থনা ইত্যাদি নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে বিদ্যাপতির পদাবলি।

চণ্ডীদাসের রাধা ধ্যানময়ী যোগিনী। এই ব্যাকুলা রাধার মধ্যে বাহ্যরূপেই রয়েছে আধ্যাত্মিকতা। চণ্ডীদাসের রাধা পূর্বরাগ পর্যায় হতেই মহাযোগিনীরূপে বিশেষভাবেই চণ্ডীদাসের হাতে সৃষ্ট প্রতিমা। তাঁর সেই বিশেষ উপলব্ধি প্রকাশিত পদাবলি-সাহিত্যের 'ঊষা-রাগিনী স্বরূপ' পূর্বরাগের পদটিতে—

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।"

চণ্ডীদাস পূর্বরাগের সমস্ত নীতি নিয়ম ভেঙে, পরিচিত সমস্ত প্রকরণ— অর্থাৎ বয়ঃসন্ধির মুকুল বিকাশ, দেহে মনে অনির্দেশ্য অস্থিরতার শিহরণ, জীবনে নবোপলব্ধ অভিজ্ঞতার থরোথরো আমন্ত্রণকে অস্বীকার করে প্রথমেই রাধাকে যৌবনে যোগিনী করেন, নাম শুনেই যার চোখে জল আসে, আহারে বিরত এবং সত্তায় উন্নীত সেই পরিণত রাধাকেই চণ্ডীদাসের পূর্বরাগে আমরা পাই। প্রেমের জগতে চণ্ডীদাসের এই নতুন দর্শন যা বিস্ময়কর।

বিদ্যাপতির প্রেম মূলত কলারস-রসিত ইন্দ্রিয়জ প্রেম। পদাবলি সাহিত্যে বিদ্যাপতি এই প্রেমের মূল আশ্রয় করেছেন রাধা ও কৃষ্ণকে। প্রণয় যে কলা, তা যে শিক্ষা করতে হয়, কেবল দেহতত্ত্ব নয়- মনস্তত্ত্বও যে তার আবেদন— মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রের পথে না গিয়ে বিদ্যাপতি কাব্যেই তা দেখিয়েছেন। আর এরই অলোক সামান্য পটভূমিকায় ফুটে উঠেছে তাঁর পদাবলি।

- বিদ্যাপতির পদাবলির যথার্থ সূচনা বয়ঃসন্ধিতে। নাগরিক প্রেমের প্রথমেই বয়ঃসন্ধির কথা আসে। বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি পদে রূপাকাঙ্ক্ষী, সহাস্য, উৎফুল্ল, আনন্দচকিত মনের রূপ ফুটেছে।

"খনে খন নয়ন কোন অনুসরই।
খনে খন বসন-ধূলি তনু ভরই।।
খনে খন দশনক ছটাছট হাঁসি।
খনে খন অধর আগে করু বাস।।"

উদ্ভিন্ন দেহকে পরমাগ্রহে খুঁটে খুঁটে দেখেছেন কবি—

"পহিলে বদরি কুচ, পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে বাড়য়ে পীড়য়ে অনঙ্গ।।"

—কিন্তু এই পদগুলি লোলুপতায় মলিন নয়। কারণ তিনি ইন্দ্রিয়রাগের কবি হলেও তাঁর পূর্ণ রূপনিরীক্ষণের সেই নিরপেক্ষ সৌন্দর্য দৃষ্টি ছিল। শিল্পীর অবিচলিত রসক্ষুধায় বৈষ্ণবকাব্যে বিদ্যাপতি অদ্বিতীয়। বিশেষত বয়ঃসন্ধির পদে তিনি দেহ ও মন এই উভয় রাজ্যকেই স্পর্শ করেছেন। দৈহিক পরিবর্তনের কিছু অবস্থাকে তিনি যথার্থ রসচিত্রে রূপান্তরিত করতে পেরেছেন— এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। বিদ্যাপতি প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি। বয়ঃসন্ধির রূপ-দর্শনের পেছনে রয়েছে কবির অভিনব পিপাসা। আছে স্বাধীন দৃষ্টির বিস্তার। রাধার সহসাগত যৌবন-সৌন্দর্য বর্ণনায় কবির কৃতিত্ব সর্বজন স্বীকৃত। তাঁর আরো কৃতিত্ব যে, তিনি শরীর ও মনের ক্রমবিকাশের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখেছেন। বয়ঃসন্ধি বিষয়ক পদের উপজীব্য যেখানে মূলত দেহ, সেখানে বিদ্যাপতি তারই মধ্যে মনের সঞ্চার করে গভীরতা এনেছেন, কিন্তু দেহের প্রাধান্যকেও ক্ষুণ্ণ করেননি। এই যৌবন-ধন্যা রাধাকে প্রেমলোকে স্থাপন করেছেন কবি। প্রথম প্রেম— পূর্বরাগ এর সূচনাতেই অপূর্ব রহস্য। কিন্তু বিদ্যাপতির পদে অন্তত রাধার পূর্বরাগের পদ প্রায় নেই বললেও চলে। কিন্তু রূপদৃষ্টিতে সচেতন, রুচিবোধে মার্জিত বৈদগ্ধ এবং মননশীল কবির অন্তরলোকের সত্য পরিচয়কে বহন করে এনেছে রাধার রূপচিত্রণে বিদ্যাপতি তথা কৃষ্ণের তীব্র সম্ভোগকামনা। দেহভাবনার সঙ্গে অতি তীক্ষ্ণ তীব্র রূপ চেতনা কৃষ্ণের দৃষ্টিতে প্রকাশিত—

"যব গোধূলি সময় বেলি।
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধরে বিজুরী রেহা
দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি।।"

লৌকিক কামনা বাসনা নয়— কামনা বাসনাজাত বিশিষ্ট রসরূপই কবি উপভোগ ও ভাষাবদ্ধ করতে চেয়েছেন।

চণ্ডীদাসের রাধার মধ্যে পূর্বরাগের নায়িকার লজ্জা ও সঙ্কোচমিশ্রিত যে তৃষ্ণা, নব-পরিচয়ের আকস্মিক চিত্তচাঞ্চল্য ধরা পড়েছে—

"ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়।।"

কিন্তু এই চাঞ্চল্যে আছে এক আত্মহারা ভাব। বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির কবিতার চাতুর্য এখানে মেলে না। কারণ লক্ষণীয় যে, চণ্ডীদাসের রাধা পূর্বরাগ পর্যায়েও কিশোরী বালিকা নয়, সে পরিপূর্ণা যুবতী। বস্তুরূপ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত এক গভীর রহস্যলোকে তাঁর রাধা চিত্তের নিত্য পরিক্রমা। তাঁর যৌবনধর্ম দেহধর্ম বিদ্যাপতির মতো ইন্দ্রিয়বোধের মধ্যে নয়, তার গভীরতম প্রেম প্রত্যয়ে আত্মহারা। তাই যৌবনেই সে যোগিনী হতে চায়—

"বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমত যোগিনী পারা।"

কিন্তু এ যোগিনীর বেশ ত্যাগধূসর গৈরিক নয়, প্রেমরক্তিম রাঙাবাস। চণ্ডীদাসের রাধার প্রণয় অনুভূতিতে হৃদয়প্রাধান্য এতই বেশি যে, বস্তুর ইন্দ্রিয়গম্য রূপের প্রতি তার আকর্ষণ নেই, বস্তুর ইঙ্গিতই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। তাই তাঁর কৃষ্ণ রূপ নয়, কেবল এক নাম হয়ে রাধার হৃদয়কে আকুল করে তোলে। কিন্তু চণ্ডীদাসসৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগে যৌবনের চাঞ্চল্য আছে। এই পর্যায়ে নিঃসন্দেহে বিদ্যাপতিই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যে চণ্ডীদাস নারীর চোখ ও মন দিয়ে সব দেখেন, সেই চণ্ডীদাস কেবল একটি ক্ষেত্রে পুরুষের দৃষ্টির সাহায্য গ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণের তৃষ্ণাকুল নয়নে রাধার লাবণ্যতরল দেহটি এক অপরূপ রসের খনি।—

"চলে নীলশাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিতে মোর।"

যে কৃষ্ণের মুখে চণ্ডীদাস এমন আকুল বাণী দান করেছেন, সেই কৃষ্ণ যখন বলেন—

"অঙ্গের বসন ঘুচায় কখন
কখন ঝাঁপয়ে তাই।"

—তখন আমরা বুঝি, এই কিশোরীকে অসংবৃতা দেখার সুযোগ কৃষ্ণ পেয়েছেন। এই রূপের বন্যা তাঁকে বিপর্যস্ত করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চণ্ডীদাস বিশুদ্ধ দেহবাদী নন। আসল কথা, ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করে চণ্ডীদাসের অতীন্দ্রিয়তা নয়। এর মধ্যে আছে অকপট সারল্য, কামনার পবিত্রতা।

বিদ্যাপতি কৃষ্ণকে দেখে শৃঙ্গার-অনভিজ্ঞা রাধার শঙ্কাতুর অবস্থাকে নিষ্ঠার সঙ্গে এঁকেছেন। মিলনের পদে বিদ্যাপতি শৃঙ্গারশাস্ত্রের, কামশাস্ত্রের কবি-চিত্রকর। অনুরাগের সূচনায় রাধার দেহ-চেতনার জাগরণ, মিলন-ভীতির মধ্যে লালসা, লজ্জা ও সুখের উদয়— অর্থাৎ এক বিকাশময় মনের বিমিশ্র মনোভাবের চিত্র এঁকেছেন কবি। অনুরাগও বিদ্যাপতির প্রেমের বিশেষ অনুভূতি।—

"সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিএ
তিলে তিলে নূতন হোয়।"

মিলনের নির্লজ্জতম অবস্থাটিকেও অকুণ্ঠে লিপিবদ্ধ করেছেন কবি, কিন্তু আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে। ভোগের কত বিচিত্র রূপ, ভোগমুখী মনের কত বিভিন্ন অবস্থা সম্ভবপর, বিদ্যাপতি তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে তা দেখিয়েছেন।

কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলিতে মিলনের পদ প্রায় নেই বললেই চলে। কারণ তাঁর পক্ষে মিলনমত্ততাকে প্রত্যক্ষে ছন্দায়িত করা সম্ভব ছিল না। ইন্দ্রিয়জ জীবনকে কবি কোনোকালেই মেনে নিতে পারেননি। তবু জীবনে মিলন আছে, চণ্ডীদাসের কাব্যেও আছে। প্রত্যক্ষ মিলন বর্ণনা তাঁর পক্ষে কঠিন বলেই তিনি মিলন-স্মৃতিকে কাব্যোপজীব্য করে তুলেছেন রসোদ্গারের পদে। চণ্ডীদাসে সুখ ক্ষণস্থায়ী, তাই তার স্মৃতিমাখা অধ্যায় রসোদ্গার— এখানেই প্রাপ্তি সুখের পূর্ণতা, আনন্দমোহের চরম। রসোদ্গারে রাধাকণ্ঠের আনন্দঘনতায় চণ্ডীদাসের রসহর্ষ। বেদনার কবি চণ্ডীদাস— তাই রসোদ্গারের রোমন্থনে

রাধা-কণ্ঠে মধুর ঔদাস্য ভরা। বর্তমান মিলনের কলকথায় জন্মান্তরীণ সৌহৃদ্যের দূরস্মৃতি মিশে রহস্যের গোধূলিমায়ায় সেই কণ্ঠ সমাচ্ছন্ন—

"শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে লেহা।"

চণ্ডীদাস জানতেন, জীবনের সবচেয়ে গভীর অংশ মিলনের ক্ষণকে ভাষায় ধরা যায় না— সে অধরা মাধুরী, যা কেবল অনুভবের। কবি তাই মিলনচ্ছন্দের মর্মস্পর্শ না করে সেই মিলন বৃত্তের চারপাশে এক ব্যঞ্জনার রেখা টেনে দিয়েছেন।—

"এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি।।"

রসোদ্‌গারের পদে চণ্ডীদাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, যেখানে বিষয়-বক্তব্যে রয়েছে অস্থির উৎকণ্ঠার কথা, সেখানেও অন্তরের গাঢ়তার ভার কবির ভাষাকে অতিরিক্ত চঞ্চল হতে দেয়নি। যেমন—

"সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই।
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।।
দেহ ছাড়ি মোর প্রাণ যেন চলি যায়।।
সেকথা বলিতে সই বিদরে পরাণ।"

প্রেম দীপ্ত, অশান্ত, আতঙ্কিত। চণ্ডীদাসের মতো স্নিগ্ধ কবিও আতঙ্কিত আত্মার বাণীরূপকে জেনেছেন, জেনেছেন প্রেম যত জ্বলে তত বেশি জ্বলবার কামনায় আর্তনাদ করে। তাই তিনি সন্তারসে ডুবিয়ে একটির পর একটি রসঘন শব্দ চয়ন করে সৃষ্টি করেছেন তাঁর রাধার রসোদ্‌গারের পদ। প্রেমের অনন্যত্ব জ্ঞাপন করাই চণ্ডীদাসের উদ্দেশ্য। প্রেম সম্পর্কে তাঁর মূল বক্তব্য— "ত্রিভুবনে হেন নাহি।" অন্তরের মধ্যে একেই তিনি একমাত্র সত্য বলে জানেন। আর রাধাকৃষ্ণের প্রেম-সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—

"মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে।" এই প্রেমের তুলনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন—

"এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি।।
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ-না দেখিলে যায় যে মরিয়া।।"

এমন সাবলীল ভাবে কবি তাঁর গভীরতম কথাটি প্রকাশ করেন যে, তাতে তত্ত্ব-গ্রন্থন থাকে না, অথচ সর্বতত্ত্বের প্রাণলোক বিচ্ছুরিত হয়। ভাবের এত গভীরতা অথচ ভাষায় কী নিদারুণ উদাসীনতা। যে উপমার মণিসম্পদ বিদ্যাপতির হাতে অলঙ্কারের শিঞ্জনে নিক্কণে ঝঙ্কার তুলত, চণ্ডীদাস সেগুলিকে উপেক্ষার মন্থর কণ্ঠে বর্ণনা করেছেন, কারণ তাঁর মূল প্রাণ ধ্বনিত হয়েছে সেই চরম বাণীতে—

"নিগূঢ় পিয়ার প্রেম আরতি রহ বহ।
চণ্ডীদাস কহে প্রেম হিয়ার মাঝে রহ।।"

রসোদ্‌গারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরূপে চণ্ডীদাসের আসন অবিচল।

মিলন চিরকালের নয়— মিলন রসের রসিক কবি বিদ্যাপতি সেকথা ভাল ভাবেই জানেন। দ্বিধা, সন্দেহ, সংশয়, প্রেমের কুটিলতা ও বাম্য-রূপের মধ্যে মিলন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মান, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা ইত্যাদি পদের মধ্য দিয়ে বিদ্যাপতি মিলনের বৈচিত্র্যকে এনেছেন।

তবে বিদ্যাপতির মানিনী রাধা অভিমানিনী নন; প্রবঞ্চিত, বিড়ম্বিত, বিক্ষুব্ধ রাধা হৃদয়ের গরলকে গঞ্জনার সূচীভাষামুখে প্রকাশ করেছে— মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিদ্যাপতির মান পর্যায়ের পদগুলি উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু চণ্ডীদাসে মানের পদ প্রায় মেলে না। বলা যায়, মান করার অক্ষমতা চণ্ডীদাসের রাধার বিশেষ ক্ষমতা। তবে চণ্ডীদাসের বাসকসজ্জা বা বিপ্রলব্ধার কিছু উল্লেখযোগ্য অংশ আছে।—

"পাতায় পাতায় পড়িছে শিশির
সখিরে কহিছে ধনী।
বাহির হইয়া দেখ লো সজনী
বঁধুর শবদ শুনি।।"

চণ্ডীদাসের রাধার প্রেম সর্বজয়ী, তিনি মহাভাবময়ী রাধা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির তুচ্ছ হিসাব-নিকাশের ঊর্ধে তিনি। এমনকি অভিসারের ক্ষেত্রেও চণ্ডীদাসের রাধাকে দেখা যায় বজ্রবারি মাথায় নিয়ে তাকে সঙ্কেত কুঞ্জে আসতে হয়েছে, কিন্তু সে-বিষয়ে তাঁর বিকারমাত্র নেই। অথচ ঘন দুর্যোগপূর্ণ নিশীথে আঙিনার পথে প্রিয়তমকে দেখে তাঁর চিন্তা—

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙিনার মাঝে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।।"

চণ্ডীদাসের কাব্যে রাধার অভিসারে বৈচিত্র্য কম, এমনকি চণ্ডীদাসের অভিসারের পদ প্রায় নেই বললেই চলে।

কিন্তু বিদ্যাপতির পদে অভিসারের সৌন্দর্য-মাদকতা আছে। সংস্কৃত কাব্যের রসঘনত্ব এবং লৌকিক কাব্যের প্রাণতারল্য— উভয়ই বিদ্যাপতির অভিসার পদে সম্মিলিত হয়েছে। পদসাহিত্যে বিদ্যাপতির অভিসারের বিশেষ মর্যাদা আছে। তাঁর অভিসার পদে আছে বৈচিত্র্যের রূপ। গৃহ, পথ এবং কুঞ্জকে তিনি সম্মিলিত করেছেন অভিসার পদে। সর্বশ্রেণির অভিসারই তাঁর কাব্যে রয়েছে। অভিসার পদে বিদ্যাপতির রাধা সৌন্দর্যময়ী। তাঁর পদে অভিসারিকার মানসিক অবস্থার বিভিন্ন স্তর দেখা যায়। তিনি গৌড়ীয় ভাবনার অধীন কবি নন। জীবনের সত্যকে স্বীকার করার মতো বড় কবি। অভিসারের প্রাণশক্তি কোথায় আছে তা তিনি জানতেন। সে শক্তি আছে প্রথমত লালসাতুরা নারীর কামাগ্নিতে, দ্বিতীয়ত, অধ্যাত্ম প্রবর্তনার প্রেম গতিতে। বিদ্যাপতির কাব্যে রাধার অভিসারের এই দুই অবস্থার কথাই পাওয়া যায়। এই কাম ও প্রেম একত্র হয়ে কোন গতিবেগ দান করে বিদ্যাপতি তাঁর পদে তা দেখিয়েছেন। অভিসারে রাধার বর্ণনায় একদিকে তিনি এঁকেছেন বাধাপ্রাপ্ত নারীর যন্ত্রণা, অন্যদিকে পথবর্তী নারীর বাসনাতাড়িত গতি। আবার প্রেমের

পরিবেশগত বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যই বিদ্যাপতি অভিসারের পটভূমিকায় ঋতুবৈচিত্র্যকে এনেছেন বর্ণন-শক্তির গুণে যা অসাধারণ। তাঁর কিছু কিছু পদে অভিসার ও বিরহ মিশে গিয়েছে।

বিদ্যাপতি তীব্র ইন্দ্রিয়রাগের কবি। লৌকিক প্রেমের কবিরূপেই তাঁর মাহাত্ম্য। কিন্তু সেই লৌকিক প্রেম তাঁর কাব্যে কাব্যোৎকর্ষে ভূষিত। তাঁর কাব্যে আধ্যাত্মিকতা এনে দিয়েছে তাঁর উৎকৃষ্ট বিরহ পদগুলি। সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলিতে বিদ্যাপতি- তুল্য মাথুর বিরহের কবি নাই। এই পদগুলি ভাবের গভীরতা, সুরের উদাত্ততা শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম প্রেমোৎকণ্ঠার প্রকাশক হয়ে উঠেছে। বিদ্যাপতির বিরহের পদ কেবল প্রকাশ্য গৌরবানুভূতিতেই সমাপ্ত নয়, তার নিভৃততম রূপও আছে।—

"শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশি শূন ভেল সগরী।।"

পদাবলি সাহিত্যে একই কালে বিদ্যাপতি মিলন ও বিরহের শ্রেষ্ঠ কবি।

পদাবলি অশ্রুর মন্দাকিনী, বেদনার বেদধ্বনি, আনন্দদগ্ধ হৃদয়ে শিখা। এই পদাবলির শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি। তাঁর রাধা বিরহ বাইরে বর্ণহীন, কিন্তু ভিতরে তার প্রচণ্ড বেগ— তা অগ্নিময়—

"বিরহ অনল মনে অনুভব
পরকে কহ এ ন জাঈ।
দিবসে দিবসে খিনি বাণী
চাঁদ অবথা এ জাঈ।।"

চণ্ডীদাসের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, বিরহ চেতনাই তাঁর একমাত্র চেতনা। তাঁর রাধা সূর্যহারা অশ্রুসাগরের শ্বেতকমল, সদামূর্ছিত। শুদ্ধতম বেদনায়, অতিসত্ত্ব অনুভূতিতে, গভীরের গানে গানে চণ্ডীদাসের রাধা-বিরহ বেদনা বেজেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিরহের চরমরূপ মাথুরে। এই পর্যায়ে বিদ্যাপতি রাজাধিরাজ। কিন্তু চণ্ডীদাস ঠিক এই বিরহের কবি নন। চণ্ডীদাসে মাথুর বিরহের পদ প্রায় নাই।

কাব্যে অধরা মাধুরী ধরা হয় ছন্দোবন্ধনে। বেদনা যে রূপময় হয়ে উঠতে পারে, অশ্রু যে হয় অশ্রুপ্রতিমা— পদাবলি সাহিত্যে এই কারুণ্যের শ্রেষ্ঠ রূপকবি বিদ্যাপতি। কিন্তু চণ্ডীদাসের রূপ কাঠিন্য অপেক্ষা ভাবতরঙ্গের প্রতি বেশি আসক্তি। প্রেম যে দ্রবীভূত হৃদয়, কান্না যে বিগলিত নয়ন এবং হাসি সে ছলোছলো আত্মা— চণ্ডীদাস তা দেখিয়েছেন পদাবলিতে। তাই তাঁর সৃষ্ট রাধা চরিত্রে পূর্বরাগ পর্যায় থেকেই চিরবিরহিনী নারীর শাশ্বত ক্রন্দন শোনা যায়। কবি রূপান্ধ নন, বস্তুরূপের অন্তরে সূক্ষ্ম ও গভীর ভাবানুভূতির ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে তিনি সার্থক। তাই তাঁর রাধা কালো রঙের মধ্যেই কৃষ্ণের রূপ খুঁজে পান—

"কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে।।
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পরি।।"

বেদনার স্বর্গীয় সঙ্গীত রচয়িতা রূপে বিদ্যাপতি সুধন্য কবি। তবে তাঁর উন্নততম প্রেমও পার্থিব প্রেমের পরিণতি, তাঁর বিরহ পদে তার প্রমাণ রয়েছে।—

"পিয়া যদি তেজল কি কাজ সিঙ্গারে"—

জীবনবোধের এই গভীরতাতেই বিদ্যাপতির বিরহ পদের মর্যাদা।—

"সজনি কো কহ আওব মধাঈ।
বিরহ পয়োধি পার কিয়ে পাওব
মুঝু মনে নহি পতিআঈ।।"

—বিরহের এই উদার ঘোষণা বৈষ্ণব কাব্যে অদ্বিতীয়। অপরপক্ষে বৈষ্ণব পদকর্তার মধ্যে একমাত্র চণ্ডীদাসই মিষ্টিক। গভীরতম অর্থেই তিনি অধ্যাত্মিক। তিনি নৈঃশব্দ্যের মহাকবি। বেদনার কালিদহে সিত পদ্মের মতো এই কবির রাধা— শান্ত, সুস্থির, শিশিরবিন্দুর সুকুমারতায় স্নিগ্ধ। চণ্ডীদাসের পদে করুণ মরণের সন্ধ্যাছায়ায় অমর প্রেমের দীপশিখা জ্বলেছে।

চণ্ডীদাসের পদের সর্বস্ব আক্ষেপানুরাগে। এতে আছে চণ্ডীদাসের ব্যক্তিজীবনের প্রভাব, সমাজ সচেতনতা, স্বতন্ত্র রসদৃষ্টি ও ধর্মবোধ। চণ্ডীদাসে বাঙালির গৃহ সংস্কারের প্রাধান্য আছে। সংস্কারবশে সমাজভীতি ও সতীত্ববোধ তাঁর রাধার জীবনে দৃঢ়মূল। ঘর ও বাইরের তীব্র টানাপোড়েনে, মর্মান্তিক বিরোধের সংঘর্ষে রাধা-হৃদয়ে রক্ত ঝরেছে। ঘর ছাড়তে সে যত কেঁদেছে, কৃষ্ণের প্রবঞ্চনায় সে-ক্রন্দন দ্বিগুণতর হয়েছে। আক্ষেপানুরাগে রাধার প্রেমনৈরাশ্য বর্ণিত, সেই নৈরাশ্য অবশ্যই পারিপার্শ্বিকের নিবারণ করতে চেয়েছেন। নানা অনুযোগের পর রাধাপ্রেম আত্মপরিচয়কালে এমন এক দিব্যশক্তি লাভ করেছে যা চণ্ডীদাসের কবিতাকে উন্নীত করেছে নিখিল প্রেমের সাধনার অমৃতকাব্যে।—

"ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।।
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি।।"

—এ বেদনাম্লানতার মধ্য দিয়ে তপস্যাধন্য আত্মকথন চণ্ডীদাসের রাধার।

আক্ষেপানুরাগের সরল বেদনা ক্রোধ অভিমান ইত্যাদির পর চণ্ডীদাসের রাধা অশ্রুর অগ্নিকে শেষবারের মতো জ্বালিয়ে নিজেকে জাগ্রত করে অবশেষে নিষ্ঠুরের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়েছেন যার নাম আত্মনিবেদন।

বিদ্যাপতিও মাথুরের অন্তহীন বিরহ-সাগরে রাধাকে রেখে নিজে স্তব্ধ হয়ে থাকতে পারেননি। প্রেমের ধ্যানশক্তিতে বিচ্ছেদ সাগরের মাঝেও মিলনদ্বীপ রচনা করা যায়— বিদ্যাপতি এই ভাবসম্মিলনের প্রসিদ্ধ কবি। তাঁর বিরহিনী রাধার তীব্র ধ্যানের জগতে কৃষ্ণ প্রত্যক্ষ দেহরূপে উপস্থিত। প্রেমানুভূতির অপরূপতা এখানে। এই মিলন দেহের ভারে নয়, ভাবের ভরে কম্পিত। দীর্ঘ বিরহ ভিন্ন এই অনুভূতির গাঢ়তা আসে না। ভাবের বাণী নির্মাণ এবং তারই মাধ্যমে ভাবাতীতকে স্পর্শ করবার কবি-ক্ষমতা বিদ্যাপতির ছিল। তাই ভাবসম্মিলনের পদেও বিদ্যাপতি প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। বলা যায় কবি জীবন থেকে সুখকে বিসর্জন দেননি, কিন্তু পরম সত্য যে অনাদি দুঃখ— সেই-ই তাঁর কাব্যের ভূষণ। তাই ভাবসম্মিলনে বিদ্যাপতির রাধার ভাবোল্লাস এত গম্ভীর গভীর সুর বেজেছে—

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা।।"

দেহের কামনা, তার পূর্তি ও তৃপ্তি, পরিপূর্ণ আনন্দময় আত্মসমর্পণ— প্রেম এখানেই থামে না, জীবনের অসীমতা আরো অগ্রসর হয়ে এক বিস্ময়-গভীর প্রশ্নচিহ্নের মধ্যে সীমারূপ নেয়—

"তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।"

রাধা জীবন অতিক্রম করে আত্মায় অবগাহন করেছেন, প্রেম সেই অসীম আত্মার ব্যঞ্জনাকে ফুটিয়ে তুলেছে এই মুগ্ধ অসীম প্রশ্নে।

আজীবন বিদ্যাপতি শিল্পরীতির চর্চা করেছেন। তাঁর কাব্যের উপজীব্য আসলে রাধাকৃষ্ণকে উপলক্ষ করে মানব-হৃদয়। মানব জীবনের অনন্ত রহস্য, অনন্ত ট্র্যাজেডি ও আনন্দ রূপ ধরেছে তাঁর কাব্যে। শব্দ-অলঙ্কার-ছন্দ গেঁথে গেঁথে কাব্যক্ষেত্রে কবি এগিয়ে গেছেন এক অসূচিভেদ্য নিপুণতায়; কোনো তত্ত্বচিন্তা নয়, এ ভাবাবেগ এ আর্তি প্রত্যক্ষ, সরল এবং অকৃত্রিম। এর মধ্যে চাতুর্য বা মাধুর্য নয়, রয়েছে অতিরিক্ত একটি ঐশ্বর্যবোধ।

চরম প্রেমের মহান কবি হলেও চণ্ডীদাস বিরহের বাণীস্রষ্টা বিপ্রলম্ভের কবি। দুর্লভ প্রেমের পাওয়া না-পাওয়ায় তাঁর কাব্য অশ্রুসিক্ত। শুধুই অপরিসীম বেদনা ও আত্মহাহাকার বুকে নিয়ে পর্যায়ের পর পর্যায় পার করে গেছে চণ্ডীদাসের রাধা। সেই হাহাকার তীব্রতর অথচ মধুরতর। প্রেম সুখের প্রাপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়েও তাই চণ্ডীদাসের রাধার দেহকামনার উতরোল উল্লাস নেই, আছে মধুর সান্নিধ্যের এক অনাস্বাদিতপূর্ব সৌরভ— তা প্রেম তথা প্রেমাস্পদকে করে তোলে রহস্যময়—

"রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি।।"

প্রেমের অনাদ্যন্ত অতৃপ্তিকে চণ্ডীদাস সহজ সরল অনলঙ্কৃত ভাষায় ব্যঞ্জনাগর্ভ করে তুলেছেন।

বিদ্যাপতির পদে শিল্পপ্রকরণের অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য আছে, আর চণ্ডীদাসের পদে আছে বেদনা ব্যাকুলতা ও ব্যঞ্জনা। বিদ্যাপতি সৌন্দর্যরসিক ও বহুভাষী। চণ্ডীদাস ভাবসাধক ও স্বল্পভাষী।

বিরহপদে বিদ্যাপতি রাধার বেদনাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে কাব্য সৃষ্টি করেছেন। কারণ তার রাধা তাঁর আত্মপ্রতিফলন নয়, সে কেবল তাঁর শিল্পসৃষ্টি। আর চণ্ডীদাস রাধার বিরহে আপন হৃদয়ের বেদনাকে মিশিয়ে কাব্যরচনা করেছেন। কারণ চণ্ডীদাসের রাধা তাঁর আত্মস্বরূপ। বিদ্যাপতির কাব্য বিচিত্রতন্ত্রী বীণা কিন্তু চণ্ডীদাসের কাব্য একতারার একটি মাত্র সুর, পল্লীর মেঠো পথে রাখালিয়া বাঁশির একটি বিষণ্ণ উদাস সুর।

চণ্ডীদাসের পদে একটি সুদীর্ঘ প্রণাম, যুগ-যুগ, জীবন-জীবন দীর্ঘ। তাঁর 'নিবেদন' পর্যায়ের নতিতে সেই প্রণামেরই পরাকাষ্ঠা। বিদ্যাপতির 'প্রার্থনা' আর চণ্ডীদাসের 'নিবেদন'— উভয়ের কবি চরিত্রের স্বরূপ-প্রকাশক দুটি পর্যায়।

বিদ্যাপতির 'প্রার্থনা' তাঁরই প্রার্থনা, মাধবের কাছে কবি আপন মনের ভার লাঘব করেছেন। চণ্ডীদাসের 'নিবেদন' কিন্তু কবির নিজের নয়, তাঁর রাধিকার বিদ্যাপতি ও তাঁর সৃষ্ট রাধা যেহেতু এক নয়, তাই কবির নিজস্ব প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল। চণ্ডীদাস ও তাঁর সৃষ্ট রাধা বহু সময়ই একাত্ম, রাধার নিবেদন তাই চণ্ডীদাসেরও নিবেদন।

বিদ্যাপতি জীবনের ভার বহন করেছেন। দীর্ঘজীবন ধরে রাজৈশ্বর্য বহনের সেই সংঘাতময় অভিযাত্রা। বর্ণে বৈভবে কবির ছিল আভিজাত্য। বিদ্যাপতির কাব্য সূচনায় রাধা ও কৃষ্ণ সেই আভিজাত্যের সুন্দর পুত্তলিকা। তারপর জীবন যতই অগ্রসর হয়েছে জীবনের ভার ততই বেড়েছে, কাব্যেও এসেছে গাম্ভীর্য ও গভীরতা। মাথুর পর্যায়ে এসে কাম ও প্রেমের মিলিত রসোল্লাস ছেড়ে বিদ্যাপতির রাধা এসে দাঁড়িয়েছে জীবনের চূড়ান্ত ক্ষণে—

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।"

'প্রার্থনা'র পদে বিদ্যাপতির ভোগ-শ্রান্ত জীবনের আর্তনাদ নিশীথ-সিন্ধুর গর্জন ধ্বনিতে নতুন সুরের সংযোজন ঘটিয়েছে—

"যাবত জনম হম তুয়া পদ ন সেবলুঁ
যুবতী মতি সঞে মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পিয়লুঁ
সম্পদ বিপদহি ভেলি।।"

প্রার্থনা পদে অনুতাপকালে বিদ্যাপতি বিশেষভাবে নিজের দুর্বলতাগুলো দেখিয়েছেন। প্রথম জীবনের কাঞ্চনাসক্তি ও কামাসক্তি এবং শেষ জীবনের নিঃসঙ্গতা। প্রথম থেকে কবির জীবন যে-সূত্রে বাঁধা ছিল তাঁর জন্য এই-ই স্বাভাবিক। কবি-জীবনে দুই মনোভাবই সমভাবে সত্য— প্রাপ্তির হর্ষ এবং ব্যর্থতার গ্লানি। একটির জন্য অপরটিকে কবি আবৃত রাখেননি। সহজ সত্যের অলঙ্কৃত মহিমায় তা ধরা দিয়েছে। অর্জনে বিশাল বলে বর্জনে গম্ভীর এই কবির জীবন। তাঁর ব্যাপক জীবনবোধের প্রকাশ ও এই প্রার্থনার পদে পাওয়া যায়। যেখানে বর্জনের গৌরবে তিনি মহীয়ান। এখানে কবি ভক্ত, কিন্তু তাঁর ভক্তি সাধারণ ভক্তের মুহ্যমান দীনতাবুদ্ধির সমরূপ নয়, তাতে আছে আত্মদর্শনের মহিমা। অসীম শূন্যতাবোধে সে কাব্য গৌরবান্বিত, জীবনকে নিঃশেষে পান করার পরেও রসশূন্য তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের আর্তনাদ সেখানে শোনা যায়।—

"তাতল সৈকতে বারি বিন্দুসম
সুত-মিত-রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে।।"

এই পদগুলি আত্মনিবেদনের সুরে সুরে ঝঙ্কৃত, ভক্তি যেখানে বাহুল্যনাশ করে হৃদয়বিগলনে চরিতার্থ হয়, সেই ভক্তি এখানে।

চণ্ডীদাসের জীবনের রূপই আলাদা। চিন্ময় সূর্যকে তিনি প্রভাতেই দেখেছেন এবং তার বন্দনা শুরু করেছেন। দ্বিধা, সন্দেহ তাঁর ছিল না, ছিল শুধু বরণ এবং আত্মনিবেদন। চণ্ডীদাস এবং তাঁর রাধা বেদনার গান গেয়ে সূর্যসত্যকে বন্দনা করেছেন। তাই তাঁর আত্মনিবেদন 'ভক্তিস্তোত্র' কিন্তু বিদ্যাপতির প্রার্থনা 'সাধনসঙ্গীত'। চণ্ডীদাসের মতো পবিত্র আত্মসমর্পণ বৈষ্ণব সাহিত্যে আর কোথাও নেই। চণ্ডীদাসের পদাবলি যথার্থই মহাজন গীতি।—

"সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পূণ্য সম
তোমার চরণ-খানি।।"

ভক্তের নিষ্কাম আত্মনিবেদনই ভক্তির শ্রেষ্ঠ ও শুদ্ধরূপ। সাধনার আর্তক্ষত অধ্যায়ের শেষে সাধক একটি সঙ্গোপন চিরশান্ত শুভ্রবর্ণ মিলনলোককে লাভ করে। চণ্ডীদাস আত্মনিবেদনে রাধার সেই বিশেষ অবস্থাকে দেখিয়েছেন—

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।।
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
হৈনু তোমার দাসী।।"

তাত্ত্বিক বৈষ্ণবতার থেকে দূরে ছিলেন চণ্ডীদাস। তাই একদিকে কবি রাগাত্মিক প্রেমকে কেবল রাধাকৃষ্ণের মধ্যে নয়, নিজ-জীবনেও অঙ্গীকার করেছেন; অপরদিকে সাধারণ হিন্দু-দৃষ্টি সম্মত শুদ্ধা ভক্তির বিভিন্ন অবস্থাকে স্বীকার করেছেন কাব্যে। তাঁর রচনায় ভক্ত হৃদয়ের ব্যাকুল তরঙ্গের মতোই শান্তি পারাবার পাওয়া যায়। তাঁর মধুর রসও শান্ত-শরণ। তিনি শান্ত- রসাশ্রিত অধ্যাত্মকবি। এমন কবির মধ্যে রূপের প্রাধান্য ঘটে না। নিজস্ব দার্শনিকতা এবং ভাবতাত্ত্বিকতা তাঁর রূপকে ঘুচিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া কাব্যিক বৈদগ্ধ্যের অভাবে বর্ণনীয়কে বর্ণরঞ্জিত করতে তিনি অসমর্থ। তাঁর কবি-প্রতিভা একটি পরম বিস্ময়কে বাংলা সাহিত্যে সম্ভব করেছে যা কেবল চণ্ডীদাসেরই সাধ্য। একটি অনুভূতিকে একই ভূমিতে দাঁড়িয়ে যে এতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব তা চণ্ডীদাসই প্রমাণ করেছেন। এই তাপসকবির অন্তরাত্মা প্রেমের সপ্তমলোকে নিত্য অধিষ্ঠিত। তাই তাঁর সাধনা কঠিনের। তাই তাঁর কাব্যে রূপজীবী রূপ নয়— প্রাণের উৎকণ্ঠা যতখানি রূপকে আকর্ষণ করে ততটুকুরই আমন্ত্রণ। তাঁর অলঙ্কার প্রয়োগ পদ্ধতিই তার প্রমাণ। ভাবের অতলে ডুবেছেন বলে কল্পনার বিস্তার যথেষ্ট নয় চণ্ডীদাসের কাব্যে। তাঁর অলঙ্কার সন্ধানেও রূপের চমক থেকে প্রকাশ-ব্যাকুলতাই বেশি।

কবিদের উপমা ব্যবহারের অন্যতম কারণ— আত্মসম্ভোগ। তখন রূপে ও সমরূপে সৌন্দর্য বিনিময়— তাতে দ্রষ্টা ও স্রষ্টার উল্লাস।

চণ্ডীদাসের মতো ভাববিভোর কবি কিন্তু কেবল রূপসম্ভোগের জন্যই আলঙ্কারিক প্রতিরূপকে চাননি। অনুভূত ভাবকে প্রকাশ করাই তাঁর সাধনা। ফলে অলঙ্কার-

প্রয়োগে তিনি যথেষ্ট সচেতন শিল্পী নন। দৃষ্ট পৃথিবীকে পরিমার্জনা না করেই তিনি সহজ আবেগে কাব্যবদ্ধ করেছেন, অতি প্রবল অধ্যাত্ম-উপলব্ধিকে প্রেমানুভূতিতে স্নিগ্ধ করে ভাষায় ধরেছেন।

অপরদিকে সৌন্দর্য সাধনার কবি, আলঙ্কারিক কবিরূপেই বিদ্যাপতির মুখ্য পরিচয়। তিনি অলঙ্কারলুব্ধ কবি। কোথাও সে অলঙ্কার কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতো অচ্ছেদ্য, আবার কোথাও কেবল কাব্য বিলাস চর্চার জন্যই অলঙ্কৃত হয়েছে তাঁর কাব্য। ইন্দ্রিয়গত প্রেম বিদ্যাপতির কাব্যের মূল আশ্রয়। তাঁর পদাবলিতে দেহরূপের সম্বন্ধে অধিক বর্ণনা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কেবল দেহের মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ থাকেননি। দেহের রূপের সঙ্গে মনের রূপও তাঁর কাব্যে উপজীব্য। তাঁর প্রেম ভাবনা এক সময় ইন্দ্রিয়াতিক্রম করেছে। এই প্রেমের রূপ ও স্বরূপকে তিনি অলঙ্কারবদ্ধ করেছেন। প্রেমের নানামুখী বিকাশ, তার আলো, ছায়া ও মায়ার সংখ্যাতীত রূপের মধ্যে কামনার প্রবলতা প্রকাশ করাই তাঁর অন্যতম চেষ্টা। আবার আকুল বাসনাকে তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগে উন্মোচন করতে চেয়েছেন। এখানেই তাঁর কবিশক্তির বিশেষ সার্থকতা। সত্যই তিনি অলঙ্কারের বড়ো কবি— বৈষ্ণব পদাবলিতে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সংস্কৃত প্রাকৃত কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী।

এবারে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের কিছু অংশ তুলে ধরে আমরা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পার্থক্য-সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করব।

রবীন্দ্রনাথ 'সমালোচনা'-য় 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে বলেছেন— "চণ্ডিদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। .....তিনি এক ছত্র লেখেন ও দশ ছত্র পাঠকদের দিয়া লিখাইয়া লন। ....বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। ...বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ, কিন্তু চণ্ডীদাসের হৃদয় আরো গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরো অধিক জানেন। .....চণ্ডীদাসের কথা এই যে, প্রেমে দুঃখ আছে বলিয়া প্রেম ত্যাগ করিবার নহে। প্রেমের যা-কিছু সমস্ত দুঃখের যন্ত্রে নিংড়াইয়া বাহির করিতে হয়। চণ্ডীদাস কহেন প্রেম কঠোর সাধনা। ....বিদ্যাপতির ন্যায় কবিগণ যাঁহারা সুখের জন্য প্রেম চান, তাঁহারা প্রেমের জন্য এতটা কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম। কিন্তু চণ্ডীদাস জগতের চেয়ে প্রেমকে অধিক দেখেন। ......বিদ্যাপতির অনেক স্থলে ভাষার মাধুর্য, বর্ণনার সৌন্দর্য আছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের নূতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ত্ব আছে, আবেগের গভীরতা আছে।" আবার 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে "বিদ্যাপতির রাধিকা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— বিদ্যাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গি, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য; চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের দাহ, প্রেমের আলোক। এইজন্য ছন্দসঙ্গীত এবং বিচিত্র রঙে বিদ্যাপতির পদ এমন পরিপূর্ণ, এইজন্য তাহাতে সৌন্দর্য সুখসম্ভোগের এবং বিচিত্র রঙে বিদ্যাপতির পদ এমন পরিপূর্ণ, এইজন্য তাহাতে সৌন্দর্য সুখসম্ভোগের এমন তরঙ্গলীলা। ইহা কেবল যৌবনের প্রথম-আরম্ভের আনন্দোচ্ছ্বাস। কেবল অবিমিশ্র সুখ এবং অব্যাহত-সংগীত ধ্বনি। দুঃখ নাই যে তাহা নহে কিন্তু সুখ দুঃখের মাঝখানে একটা

অন্তরাল ব্যবধান আছে। ......চণ্ডীদাসের মতো সুখে দুঃখে বিরহে মিলনে জড়িত হইয়া যায় নাই। সেইজন্য বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং চণ্ডীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রাগঢ়তা আছে। .....বিদ্যাপতির রাধা নবীনা নবস্ফুটা। আপনাকে এবং পরকে ভালো করিয়া জানে না, দূরে সহাস্য সতৃষ্ণ লীলাময়ী নিকটে কম্পিত শঙ্কিত বিহ্বল। .....যৌবন, সেও সবে আরম্ভ হইতেছে, তখন সকলই রহস্য পরিপূর্ণ। ......এখন প্রেমে বেদনা অপেক্ষা বিলাস বেশি। ইহাতে গভীরতার অটল স্থৈর্য নাই, কেবল নবানুরাগের উদ্‌ভ্রান্ত লীলাচঞ্চল্য। ....এই নবীন চঞ্চল প্রেম হিল্লোলের উপর সৌন্দর্য যে কত ছন্দে কত ভঙ্গিতে বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে, বিদ্যাপতির গানে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের অন্তর্দেশে যে গভীরতা, নিস্তব্ধতা, যে বিশ্ববিস্মৃত ধ্যানলীনতা আছে তাহা বিদ্যাপতির গীতি-তরঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না। .....চণ্ডীদাস গভীর এবং ব্যাকুল, বিদ্যাপতি নবীন এবং মধুর।"

১.৬.২.২ বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস

বাংলা বৈষ্ণব পদাবলির ইতিহাসে ভাবে ও ভাষায় উচ্ছ্বলিত হয়ে দুটি মূল স্রোতোধারার সৃষ্টি হয়েছিল। একটি ধারার উৎসভূমি সুদূর মিথিলা, অপর ধারাটির উদ্ভব এই বাংলাদেশেই। প্রথমটির ধারক কবি বিদ্যাপতি এবং দ্বিতীয়টি বহন করেছেন কবি চণ্ডীদাস। একটি ধারা আমাদের নিয়ে যায় মর্ত্যের পথ বেয়ে সুরসভাতলে— সেখানে রাজৈশ্বর্য এবং ভোগাড়ম্বরের অমরাবতী; অপর ধারা আমাদের টেনে আনে এই শ্যামল মাটির ধরাতলে যেখানে 'বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে পূজামূর্তি ধরি প্রেম' দেখা দেয় দুঃখের আলোতে। এই দুটি ধারার রসে পুষ্ট হয়েছে কত কবি প্রাণ— বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তার সাক্ষী।

বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাসের পদাবলির তুলনাকালে এই কথাটি মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। চৈতন্য-পূর্ব যুগের পদাবলি সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি এবং চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস। উভয় কবির মধ্যে কালের দূরত্ব দীর্ঘ প্রসারিত হলেও উভয়ের মানসলোকের এত নিবিড় গভীর একাত্মতা যে গোবিন্দদাসকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'ই বলা হয়। তবে উভয় কবিই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, তাই গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির লিপিকর কবি নন। উভয় কবির এই স্বকীয়তা থাকা সত্ত্বেও কোন বিশেষ মহিমায় এঁরা একাত্ম হয়ে উঠেছেন, —তারই সন্ধানে এখানে আলোচ্য প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে।

বিদ্যাপতি মিথিলায় জন্ম গ্রহণ করেছেন, সেই সূত্রে তিনি মৈথিল কবি। কিন্তু গোবিন্দদাসের জন্ম বাংলাদেশে এবং সেই সূত্রে তিনি বাঙালি কবি। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি বাঙালির জীবন ও সাধনার সঙ্গে গভীর আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ, এমনকি তাঁর জন্মস্থানের কথা এবং তাঁর পদাবলির ভাষার কথা মনে রেখেও বাঙালি বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাঁকে মহাজন পদকর্তা রূপে গ্রহণ করেছেন। উত্তর সাধক গোবিন্দদাস— পদাবলির অপর অন্যতম পদকর্তা বিদ্যাপতির বাসভূমি হতে তাঁর সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ বহু পদ উদ্ধার করেন এবং অসম্পূর্ণ পদগুলিকে স্বয়ং সম্পূর্ণতা দান করেন। পদাবলি সাহিত্যে সে পদগুলিও অবহেলিত নয়, কারণ উভয় কবির স্থান-কাল-জাতির পার্থক্যের রেখা মুছে দিয়েছে এই পদগুলি।

বলা যায়, বাংলাদেশে বিদ্যাপতি ও তাঁর পদাবলির নবজন্ম ঘটেছে। মিথিলা তাঁর জন্মভূমি, কিন্তু তাঁর চিরন্তন লীলানিকেতন কাব্যরসিক বাঙালির হৃদয় রাজ্য। বাঙালির চিরকালের হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালোবাসা মিলন-বিরহের সঙ্গে তাঁর পদাবলি গভীর ভাবে সংযুক্ত। তাই ভিন্ন রাজ্যের কবি হয়েও তিনি ভালোবাসার রাখিবন্ধনে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত।

চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলি সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাসের জন্ম এই বাংলায়। বিদ্যাপতির সঙ্গে তাঁর পদাবলির ভাবসাদৃশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে সমসাময়িক শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য বল্লভদাস তাঁর সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্য করেছেন—

"ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হৈতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি।।"

এবারে আমরা পদাবলির আলোকে উভয় কবির জীবনবোধ, ভাব, শিল্পরীতি, কবিত্ব শক্তির সাধর্ম্য ও পার্থক্য আলোচনা করব।

বিদ্যাপতি পঞ্চদেবতার উপাসক এবং বিশেষভাবেই তিনি শৈব। কোনো ধর্ম-বিশেষত বৈষ্ণব ধর্ম তাঁর জীবনে জলবিভাজন রেখা টানতে পারেনি। কিন্তু পদাবলি সাহিত্যে আমরা দেখি তাঁর গভীর জীবনবোধ তাঁর রচনায় এমন এক প্রলম্বিত ছায়াপাত ঘটিয়েছে যে তারই স্পর্শে পদাবলি সাহিত্যে তাঁর সম্পূর্ণ জন্মান্তর ঘটিয়ে দিয়েছে।

প্রথম জীবনে গোবিন্দদাস মাতামহের আদর্শে শাক্ত ধর্মে দীক্ষিত হন। পরবর্তীকালে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত কবি শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন জীবনের এক সংকটময় মুহূর্তে। তার পরই তাঁর মুখে কৃষ্ণবন্দনার একটি পদ স্ফূরিত হয়— গোবিন্দদাসের নবজন্ম হয়।

অলঙ্কার ও বিভিন্ন শাস্ত্রে এবং দর্শনে সু-পণ্ডিত বিদ্যাপতির জন্ম মিথিলার এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশে। তাঁর পূর্বপুরুষেরা মিথিলার রাজসভার বিশিষ্ট পদের অধিকারী। বিদ্যাপতি স্বয়ং মিথিলা রাজসভার পণ্ডিত সভাকবি ছিলেন। রাজসভায় বিভিন্ন শাস্ত্র-দর্শন কাব্য-চর্চার একটি মাত্র অংশ তাঁর রচিত বৈষ্ণব পদাবলি। অতএব বৈষ্ণব পদাবলি তাঁর কাব্য জীবনের সর্বস্ব নয়, সম্পূর্ণতাও নয়।

গোবিন্দদাসের জন্ম এক সংস্কৃতিবান বৈদ্য পরিবারে। সংস্কৃত সাহিত্য এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। বিদ্যাপতি যেমন আজন্ম রাজ-লালিত, গোবিন্দদাসও তেমনি অনেক প্রভাব প্রতিপত্তিশালী। জমিদারের কাছে সম্বর্ধিত হন। বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ তাঁর জীবনে এক নতুন মোড়। সংস্কৃতে নাটক রচনা করলেও গোবিন্দদাসের প্রধান পরিচয় পদাবলি সাহিত্যের পদকর্তারূপে।

বিদ্যাপতি চৈতন্য-পূর্ব যুগের কবি, তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের অনুশাসনের মধ্যে তাঁর কবি-প্রতিভা বাধা পড়েনি। তবে রাজসভার চাহিদার অনুশাসন তাঁর ছিল। তাই স্বাধীনভাবে হলেও রাজসভার উপযোগী করে তাঁকে কাব্য নির্মাণ করতে হয়েছে। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র না হলেও অলঙ্কার শাস্ত্র, কামশাস্ত্রের অধীনেই তাঁকে কাব্য রচনা করতে হয়েছে। তাঁর কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "রাজকণ্ঠের মণিমালা।"

চৈতন্যোত্তর যুগের কবি গোবিন্দদাস বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়ে গভীর অভিনিবেশ-সহকারে বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তার আনুগত্যে তিনি রাধাকৃষ্ণ লীলার পদ রচনা করেন। বৃন্দাবনের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিল অবিচ্ছিন্ন। বৈষ্ণব গোস্বামীগণ তাঁর রচনায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ষড় গোস্বামীর প্রভাবেই তাঁর কাব্যসংস্কার গড়ে ওঠে।

মধ্যযুগের সার্বভৌম কবি বিদ্যাপতি। ভারত-ইতিহাসের সংকট ক্ষণের দ্রষ্টা পুরুষ তিনি। রক্ত, ক্লেদ, হিংসা ও শৌর্যের রাজপ্রাঙ্গণে দু'দণ্ডের শান্তির মতো তাঁর কাব্যে একদিকে উৎসারিত হয়েছে মদনমথন গীতি, সেই সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে চিরদিনের কোনো অমৃত অভয় আশ্রয় বাণী। শৈব হয়েও তিনি বৈষ্ণব ভাবাস্বাদনে পারঙ্গম ছিলেন। তিনি প্রেম কাব্যের মহৎ কবি। তাই তাঁর হৃদয়ের ভাষা বৈষ্ণবতাকে আশ্রয় করে প্রকাশিত। কিন্তু তাঁর কাব্যে রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদে তেমন ভক্তি-কাতরতা মেলে না। সে সকল পদে প্রেম-কলা-বিষয়ক নানা চটুল-মনোহর উক্তি আছে, প্রেম রহস্যের গভীর বাণীও আছে, কিন্তু তাতে কবির নিভৃত হৃদয় নেই। প্রেম সত্যরূপে যে-সকল গভীর বাণী তিনি উচ্চারণ করেছেন, প্রেমবাদী বিদ্যাপতির পক্ষে তাই-ই ভক্তি-ভাবনা বা আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন। বাঙালি বৈষ্ণব বিদ্যাপতির এই বৈষ্ণবাংশকেই গ্রহণ করেছেন, তাঁর সামগ্রিকতাকে নয়।

ষোড়শ শতাব্দী বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ। এই যুগকে স্বর্ণবিভায় মণ্ডিত করেছেন গোবিন্দদাস। তিনি বৈষ্ণব কাব্যধারাকে পরিণতি দান করেছেন। নিষ্ঠাবান ভক্ত কবি, সাধক, রূপদক্ষ শিল্পী। ভক্তিভাবের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা এবং কাবিাক মনন উৎকর্ষ তাঁকে কালজয়ী কবিত্বের স্বর্ণমুকুট পরিয়ে দিয়েছে। চৈতন্যোত্তর যুগের তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তা। একমাত্র বিদ্যাপতির সঙ্গেই তিনি তুলনীয়।

বিদ্যাপতির কবিতায় ভক্তের আকৃতি নেই— আছে মানবীয় চেতনার শিল্পকৃতি। তিনি প্রথমে জীবন রসিক কবি, তারপর সাধক। কোনো বিশিষ্ট ধর্মমতকে কেন্দ্র করে তিনি কবিতা লেখেননি। মানব-মানবীর চিরন্তন প্রেমের লীলারহস্য রাধাকৃষ্ণলীলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন আর বৈষ্ণব পদই তাঁর প্রেমচেতনার প্রকৃষ্টতম বাহন। বুদ্ধির দীপ্তি ও তির্যকতায়, অলঙ্কার-ছন্দের আভিজাত্যে তাঁর কবিতা রাজকীয় মহিমায় সমুন্নত। তবে জীবনের পদাবলি রচনা করতে গিয়ে তিনি কোথাও কোথাও ভক্তিমার্গে পা বাড়িয়েছেন।

পক্ষান্তরে, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির কাব্য-বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেও আপন প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যে মহিমাদীপ্ত। তিনি প্রথমে ভক্ত, তারপর কবি। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ভক্তিসাধনার পরিপূরক হিসেবে তিনি পদাবলি রচনা করেছেন। বিদ্যাপতির কবিতায় অবিমিশ্র ভক্তিভাব নেই। কিন্তু গোবিন্দদাসের পদে একজন দীক্ষিত কবির ভক্তি তন্ময়তাই প্রকাশিত।

বিদ্যাপতি জীবনের কবি, প্রেমের কবি, সৌন্দর্যের কবি ও আনন্দের কবি। প্রেমের সংগীতে তিনি ভক্তির পরশমণি ছুঁইয়ে দিয়েছেন।

গোবিন্দদাস ভক্তির কবি, সৌন্দর্যের কবি, গতির কবি, আনন্দের কবি ভাস্কর। ভক্তিধর্মের আদর্শকে তিনি মানব প্রেমের বৈচিত্র্যে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। তাই তাঁর কাব্যে তত্ত্বচিন্তা ও ভক্তিগভীরতার সঙ্গে শিল্প সৌন্দর্যের সুষম মিলনে ক্লাসিক গাম্ভীর্য সৃষ্টি হয়েছে।

বিদ্যাপতি মূলত নাগরবৃত্তিচারী রাজসভার কবি। জীবনের বহিরঙ্গের লীলা-বিলাস-লাস্য-ভঙ্গিমাতেই প্রধানত তাঁর দৃষ্টি অভ্যস্ত। নাগরিক জীবনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। স্মার্ত পণ্ডিত ও আলঙ্কারিক কবি হিসেবে রস-সৃষ্টির দ্বারা রাজ মনোরঞ্জনের জন্য এবং রসজ্ঞ রাজন্যবর্গ ও রাজকর্মচারীদের রসতৃষ্ণা মেটাবার জন্য তিনি মণ্ডনকলা ও বাক্‌নির্মিতির অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। তাঁর পদাবলি সাহিত্যে উজ্জ্বল ভাষা-ভঙ্গিমা, আলঙ্কারিক সৌন্দর্য ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বিদগ্ধ মার্জিত রাজন্যবর্গ ও রাজকর্মচারীদের মনঃ প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করে রচিত। বাংলাদেশে এই বিচিত্রমুখী প্রতিভার অধিকারী বিদ্যাপতি চিরআদৃত। তাঁর কবি প্রতিভার নিকষ-পাথর হল পদাবলি সাহিত্য। তাঁর পরিশীলিত মনোরাজ্যের উজ্জ্বল ভূমিতে কালজয়ী পদাবলি সাহিত্যের শাশ্বত রসসৃষ্টি হয়েছে।

চৈতন্য-পূর্ব যুগের কবি বলে বিদ্যাপতির উপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের প্রভাব পড়েনি। রাধা কৃষ্ণকে অবলম্বন করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি প্রাকৃত নরনারীর প্রেমলীলা বর্ণনা করেছেন। নায়ক-নায়িকার পূর্বরাগ ও মিলন সম্ভোগের পদগুলি জৈব সংস্কারের উর্ধে উঠতে পারেনি। রাজসভা ও রাজপরিবারের মনোরঞ্জনার্থে তিনি কাব্যে যে আদিরসের উল্লাসকে প্রশ্রয় দিয়েছেন তাতে আছে জীবনের কামনা বাসনার স্থূল প্রবৃত্তি, আছে নাগরিক জীবন তথা রাজসভার ভোগলিপ্সু জীবনের উল্লাস। কিন্তু স্বয়ং মহাপ্রভু যাঁর পদ আস্বাদন করেছেন, 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা'কে 'সর্বসাধ্যসার' জেনেছেন যে বৈষ্ণবভক্ত, তাঁদের কাছে যিনি 'মহাজন পদকর্তা' তাঁর সামগ্রিক বিচারের ক্ষেত্রে এত সহজে চূড়ান্ত রায় দেওয়া সহজ কথা নয়। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণলীলা কোনো বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি নয়। তাঁর সৃষ্ট রাধা চরিত্রের বিচার করলে তাঁর পদাবলির মধ্যে একটি ক্রমবিকাশের স্তর লক্ষ্য করা যায়। মিথিলায় কবি একাধিক রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন, রাজতন্ত্রের উত্থান-পতনের দীর্ঘকালীন ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল। তাঁর নিজের জীবনও সুখদুঃখের তরঙ্গলীলায় বারবার দোলায়িত হয়েছে। তাই তাঁর কাব্যের মধ্যে মানসিক স্তর পরম্পরায় বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায়। বিচিত্র পর্যায়ের পদ রচনা করেছেন তিনি। বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, মাথুর ও ভাবসম্মিলন-এর বিচিত্র পর্যায়ে রাধা চরিত্রের সুন্দর ক্রমবিবর্তন, ক্রমবিকাশ ও পরিণতি ঘটেছে। এইসব পর্যায়ের পদে কবির রূপমুগ্ধতার আনন্দ উল্লাস, মননের তীক্ষ্ণতা প্রকাশিত। রূপচেতনা ও প্রেমচেতনার রূপরসবর্ণের ইন্দ্রধনুচ্ছটা উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর পদে।

চৈতন্যোত্তর কালের নিষ্ঠাবান ভক্ত কবি গোবিন্দদাস। বিভিন্ন জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতা তিনিও লাভ করেছেন, কিন্তু কারুর মনোরঞ্জনার্থে ফরমায়েসী কবিতা তিনি রচনা করেননি, যা করেছেন তা আপন ভক্তপ্রাণের ও শিল্পীমনের চাহিদার তাগিদে। কোনো রক্তাক্ত ক্লেদাক্ত রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের তিনি সাক্ষী নন, কিন্তু তাঁর হৃদয়মন জুড়ে রয়েছেন এক ঐতিহাসিক প্রেমিক পুরুষ— তিনি স্বয়ং 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু' মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে ভক্তি তন্ময়তার একক নিদর্শন। একজন রূপদক্ষ শিল্পীর ভাবের গূঢ়তা ও গাঢ়তা, আলঙ্কারিক শিল্পনৈপুণ্য,

চিত্র ও সংগীতধর্মিতা তাঁর গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরাঙ্গবিষয়ক পদে অসাধারণ কাব্যগৌরবে উজ্জ্বল। দিব্য ভাবচঞ্চল মহাপ্রভুর অন্তর্জীবনের নিখুঁত লীলার ছবি তিনি দক্ষ সচেতন শিল্পীর মতো ধীরগম্ভীর তুলির টানে অতীব বর্ণাঢ্য ও সুস্পষ্ট করে তুলেছেন।—

"নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব।।
কি পেখলু নটবর গৌরকিশোর।"

একদিকে শ্রীচৈতন্যের মানবিক দিক, অপরদিকে শ্রীচৈতন্যসম্পর্কিত বৈষ্ণবীয় ধারণার তত্ত্বাদর্শের আলোকে মহাপ্রভুর শান্তপুণ্য করুণাঘন দিব্যজীবন ও তাঁর প্রেমাদর্শ রূপে রসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে গোবিন্দদাসের কবিতায়। কবি শ্রীচৈতন্যকে প্রত্যক্ষ না করলেও মানসদৃষ্টিতে তিনি মহাপ্রভুর যে ভাবমূর্তি অঙ্কন করেছেন তা কল্পনার ঐশ্বর্যে, ভাবের গাঢ়বদ্ধতায়, ছন্দের ঝঙ্কারে, আলঙ্কারিক গঠনশৈলীতে চৈতন্য স্বরূপের অতি উচ্চাঙ্গ ব্যাখ্যা যা প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনাকেও অতিক্রম করে যায়।

বিদ্যাপতি চৈতন্য-পূর্ব বলে তাঁর পদাবলিতে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ ও গৌরচন্দ্রিকা নেই। গোবিন্দদাসের কাব্যে বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তাঁর শিল্পচেতনার এক গভীর মেলবন্ধন ঘটেছে। ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, চিত্র ও সঙ্গীতের সুষম মিলনে তাঁর পদাবলি সৃজনশীলতার অভিনব শিল্পসামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। তাঁর কবি প্রকৃতি অলংকার শাস্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় তাঁর পদাবলি ভাষার সুললিত মাধুর্য ও ক্লাসিক সংহতির সুমহান গাম্ভীর্যে দীপ্যমান।

পদাবলি সাহিত্যে গৌরলীলা বিষয়ক পদ ছাড়াও গোবিন্দদাস রাধাকৃষ্ণলীলার পূর্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধ, খণ্ডিতা ও মাথুর প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের পদকর্তা।

বিদ্যাপতির পদাবলিতে প্রেমলীলার স্বর্গীয় দ্যুতি নেই। এই ধূলিমাটির সংসারের প্রাকৃত প্রেমকেই তিনি তাঁর কাব্যের প্রধান উপজীব্য-বস্তু করে তুলেছেন।

গোবিন্দদাসের পদাবলিতে প্রেম হয়ে উঠেছে সাধনা। এক অপার্থিব স্বর্গীয় দ্যোতনায় উদ্ভাসিত তাঁর পদাবলি।

বিদ্যাপতির পদাবলির প্রথমাংশে রয়েছে নাগরিক প্রেম। তাঁর রাধা কলাবতী নাগরিকা। তাই তাঁর পদাবলির যথার্থ সূচনা বয়ঃসন্ধিতে। এই পর্যায়ে কবি দেহ-মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক্-দিগন্তকে উন্মথিত করে তুলে শ্রেষ্ঠ পদকর্তার সম্মান লাভ করেছেন। এই বয়ঃসন্ধি কবির দৃষ্ট বাস্তব, তাঁর অভিজ্ঞতার মনোরম সংগ্রহ। রাধার মধ্যে সেই বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ঢেলে সাজিয়েছেন কবি। এই পর্যায়ে মনস্তত্ত্ব ও রসসৃষ্টির সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে একটি নারীর দেহ-মনের পরিবর্তনে যে ভাবসংকট উপস্থিত হয় বিদ্যাপতি একজন দক্ষ মনস্তত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে তাকে দেখেছেন—

"শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুঁহু লোচন লেল।।
বচনক চাতুরী লহু লহু হাস।
ধরণীএ চাঁদ কএল পরকাশ।।"

কৈশোর যৌবন-সন্ধিগতা তন্বী রাধার মনোরহস্যের অপূর্ব শিল্পলোক সৃষ্টি করেছেন কবি। শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির পদে তিনি অপূর্ব সৌন্দর্যানুভূতি, কবি-কল্পনা ও পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং অলঙ্কার ভাবনার চারুতা ও সূক্ষ্মতার স্বাক্ষর রেখেছেন। দেহ-মনের রূপান্তরের এই দ্বন্দ্বময় স্তরটি কবি অপূর্ব কাব্যকৌশলে অঙ্কিত করেছেন।—

"খনে খন নয়ন কোন অনুসরঈ।
খনে খন বসন ধূলি তনু ভরঈ।।
খনে খন দশন ছটা ছুট হাস।
খনে খন অধর আগে করু বাস।।"

রাধার দেহ সৌন্দর্যের বর্ণনায় কবি অপূর্ব সংযমের সঙ্গে গভীর সৌন্দর্য দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। এর সঙ্গে মিলেছে রাধার মানসিক পরিবর্তন। তাঁর ভীতি বিহ্বল চাপল্য, যৌবনের উত্তাপ, দ্বন্দ্ব কবির লেখনীতে বর্ণাঢ্য শিল্পসৌকর্য লাভ করেছে। একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে রাধার কৌতূহল ও সচেতনতা। এই রাধা অসামান্যা।

কৃষ্ণের রূপোল্লাস ও রাধার বয়ঃসন্ধির চলচঞ্চল সৌন্দর্য বর্ণনায় বিদ্যাপতি আলো-আঁধারি-পূর্ণ ভাবদ্যোতনা সৃষ্টি করে প্রথম শ্রেণির রোমান্টির কবি প্রতিভার নিদর্শন রেখেছেন।

পূর্বরাগেই প্রেমের প্রথম সূচনা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বিদ্যাপতির পদাবলিতে পূর্বরাগের পদ অতি সামান্য— কিন্তু সে অসামান্য। প্রথম প্রেমের লজ্জা-রক্তিম আত্মপ্রকাশ ঘটেছে রাধার অপূর্ব ভাবে—

"অবনত আনন কএ হম রহলিহুঁ
        বারল লোচন চোর।
পিয়া মুখ রুচি পিবএ ধাবল
        জানি সে চাঁদ চকোর।।"

আবার রাধার রূপলাবণ্য কৃষ্ণকে বিস্ময়ে আনন্দে একান্ত অভিভূত করে—

"যব গোধূলি সময় বেলি।
ধাম মন্দির বাহির ভেলি।।
নব জলধরে বিজুরী রেহা।
দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।।"

গোবিন্দদাস সৌন্দর্যের কবি। সৌন্দর্যকে তিনি কেবল দুচোখ দিয়ে নয়, সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। তাই তাঁর রাধা মানসলোকের পুঞ্জীভূত সৌন্দর্যের সমাহার। সেই রাধা অলৌকিক হয়েও অপূর্ব সুন্দর। ভক্তি ও রূপের মধ্যে নিবিড় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। ভাষার ঐশ্বর্য ও অলঙ্কৃতি, ছন্দের ঝঙ্কার, ভাবের গভীরতা ও গাম্ভীর্যের দ্বারা তাঁর কাব্যে সৌন্দর্যের অমরাবতী তৈরি হয়েছে।

বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাস উভয়েই সৌন্দর্যের কবি। কিন্তু এই সৌন্দর্যের পার্থক্য মূলত উভয়ের কবি-আত্মার প্রতিফলনে।

উভয় কবিই শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদ রচনা করেছেন। কিন্তু বিদ্যাপতির কৃষ্ণ এই পর্যায়ে বলেন—

"মেঘমালা সয়ঁ তড়িত লতা জনি
হিরদয়ে সেল দই গেল।।"

রাধার অর্ধমুকুলিত দেহের ক্ষণিক প্রকাশ কৃষ্ণের পূর্বরাগের প্রথম অনুভূতির সঙ্গে দেহজ কামনাকে জাগিয়ে তুলেছে। সেখানে গোবিন্দদাসের কৃষ্ণ পূর্বরাগ পর্যায়ে বলেন—

'কোমল চরণ চলত অতি মন্থর
উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি-পঙ্কজ
দুই পাদুক করি লেল।।"

কবির বর্ণনা নৈপুণ্যে রাধা সৌন্দর্যের ভাবপ্রতিমা রূপে উদ্ভাসিত। তাঁর দৈহিক সৌন্দর্যের মধ্যে কৃষ্ণ অপার্থিব লাবণ্য বিস্তার লক্ষ্য করেছেন। এই রূপানুরাগের পদে গোবিন্দদাসের প্রতিভা অতুলনীয়। কবির সৌন্দর্য চেতনায় বাহ্যিক রূপ হৃদয়ের অনুভূতিতে রসঘন শিল্পবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

রূপের বর্ণনায় বিদ্যাপতি সমস্ত আড়াল ভেঙ্গে একেবারে আবেগে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠেছেন যা অনেক সময় বৈষ্ণবতার নিয়ম লঙ্ঘন করে আদি রসাত্মক প্রেম-কবিতায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে গোবিন্দদাসের আশ্চর্য সংযম। রূপের বর্ণনা তিনিও করেছেন, কিন্তু রূপের গভীরে ডুবে গাম্ভীর্য ও সংযম দ্বারা এক ভাবগম্ভীর রূপ সৃষ্টি করেছেন। বিদ্যাপতির রূপকে দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা স্পর্শ করা যায়, কিন্তু গোবিন্দদাসের ক্ষেত্রে তা অসম্ভব।

অভিসারের দুই শ্রেষ্ঠ পদকর্তা— বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাস।

পদসাহিত্যে বিদ্যাপতির অভিসারের বিশেষ মর্যাদা আছে। অভিসার কবিকে অসীম মুক্তি দিয়েছিল। অত্যন্ত সাবলীলতায় বিদ্যাপতি অভিসারের বৈচিত্র্যের কথা বলেছেন। গোবিন্দদাসের অভিসারের পদের সঙ্গে বিদ্যাপতির অভিসারের সাধর্ম্যের থেকেও পার্থক্য বড়। বিদ্যাপতির পদে আছে পরকীয়া প্রেম-অভিসার। এজাতীয় অভিসার গোবিন্দদাসে নেই, তাঁর অভিসার অধ্যাত্মকাব্যের শ্রেষ্ঠ অভিসার। অধ্যাত্ম অভিসার বিদ্যাপতিতেও যে নেই, তা নয়। বিদ্যাপতি গৌড়ীয় ভাবনার মধ্যে অবস্থিত নন। তিনি জীবনের সত্যকে স্বীকার করবার মতো বড়ো কবি। অভিসারের প্রাণশক্তি যে লালসাতুরা নারীর কামাগ্নিতে এবং অধ্যাত্ম প্রবর্তনার প্রেম-গতিতে তা তিনি জানতেন। বিদ্যাপতির কাব্যে এই দুই অবস্থাই আমরা পাই। আবার অভিসারের প্রয়োজন বিদ্যাপতির কাছে সৌন্দর্যের প্রয়োজনও বটে; তাই তাঁর বহু পদে এই নারীরূপের অর্চনা পাই। এছাড়াও অভিসারিণীর মানসিক অবস্থার অনেক স্তর পাওয়া যায় বিদ্যাপতিতে। প্রবৃত্তির পীড়ন, বাধাপ্রাপ্ত নারীর আর্তনাদ, সুযোগমতো তাঁর পথাবতরণ, দ্রুত ক্ষুধিত গতি— বিদ্যাপতির অভিসার পদে রাধা ঝলমল করে উঠেছে এত বৈচিত্র্য-ময়তায়। এই বৈচিত্র্যময়তা, এই ক্ষুধা-শিহরিত গতি মহিমান্বিত হয়ে একসময় প্রেমাভিসারে পরিণত হয়েছে। যে দুর্বার প্রেম বিদ্যাপতির রাধাকে বয়ঃসন্ধিকাল হতে চঞ্চল-চপল ও হাস্যলীলাময়ী করে গড়ে

তুলেছিল, সেই প্রেমকেই অভিসারের পর্যায়ে এনে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনায় পূজামূর্তি করে তুলেছেন।—

"সুমুখি পুছওঁ তোহি স্বরূপ কহসি মোহি
সিনেহক কত দূর ওর।"

—এই দূরত্ব লঙ্ঘনের জন্য রাধা নিজ প্রাণের অগ্নি জ্বালিয়ে রাখেন।

বৈষ্ণব কাব্য অধ্যাত্মকাব্য, তার প্রেমের মহিমা দুঃখজয়ী। এই দুঃখ হৃদয়ে-বাইরে সর্বত্র। তাই অভিসার পর্যায়ে বৈচিত্র্যময় ঋতুতে রাধার নানামুখী অভিসারের বৈচিত্র্য। কৃচ্ছ্রাগ্নিতে দগ্ধ না হলে প্রেমের মহিমান্বিত রূপ উদ্ভাসিত হয় না। তাই কবিদের বিশেষভাবে বেছে নিতে হয়েছে বর্ষার দুর্যোগপূর্ণ ভয়ঙ্কর রজনীকে! কৃষ্ণাকাশে, দুর্গম পথে বারবার ঠিকরে উঠেছে এক দিব্য বিভামণ্ডিত স্বর্ণকান্তি দেহরেখা। অভিসার কুঞ্জে পৌঁছে রাধা এক নতুন গৌরবে উজ্জ্বল। বিদ্যাপতির কাব্যে সেই উজ্জ্বল মহিমা অধ্যাত্মিকতার। সামান্য অভিসারিণীকে কবি অসামান্য প্রেম সন্ধানীতে রূপান্তরিত করে তুলেছেন। তাই—

"নব অনুরাগিণী রাধা।
কছু নাহি মানএ বাধা।।
একলি কএল পয়ান।
পথ বিপথ নাহি মান।।"

কিন্তু পদাবলি সাহিত্যে অভিসার পর্যায়ের রাজাধিরাজ কবি গোবিন্দদাস। এই পর্যায়ে তাঁর কবিপ্রতিভা উত্তুঙ্গ শিখর স্পর্শ করেছে। এস্থলে তাঁর প্রতিস্পর্ধী কবি কেউ নেই। তিনি বৈষ্ণব সাধক ও কবি। তত্ত্ব ও সৌন্দর্য, মানবিক অনুভূতি ও আধ্যাত্মিকতা প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রকল্পে অপূর্ব বাণীমূর্তি লাভ করেছে তাঁর কাব্যে। অভিসারের লক্ষণীয় ভাবগত বৈশিষ্ট্য যে চলিষ্ণুতা, তা গোবিন্দদাসের মতো কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। তাঁর অভিসারের পদ পাঠকচিত্তে দোলা জাগায়। কাহিনি ও নাট্যরসের সমন্বয়ে স্বাদবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন গোবিন্দদাস। তাঁর অভিসার পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হল— গতি— "ছুটল বাণ কি এ যতনে নিবার" এবং নাটকীয়তা।

অঝোর বর্ষাধারায় রাধা অভিসারে চলেছেন। শঙ্কিতা সখী রাধার কাছে আপন শঙ্কা ব্যক্ত করেন—

"মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।
তহিঁ অতি দূরতর বাদল দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল।।
সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।"

শঙ্কিতা সখীকে প্রবোধ দিতে রাধার বিজয়ী দৃপ্ত আত্মঘোষণা—

"কুল মরিয়াদ কপাট উদ্‌ঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিয়াদ সিন্ধু সঙ্গে পঙারলুঁ
তাহে কি তটিনী অগাধা।"

তাই পূর্ব হতেই রাধার বিচিত্র প্রস্তুতি এই অভিসারের জন্য। অভিসারের প্রস্তুতি, অভিসারে যাত্রা, এবং যাত্রাশেষে মিলন কালে অভিসার-পথ-কষ্টের বর্ণনা— নাটকীয়ভাবে গোবিন্দদাস অভিসারের এই আদি-অন্ত দেখিয়েছেন— তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য এটি। অভিসারের পথ কষ্টের বর্ণনা বিদ্যাপতিও করেছেন, কিন্তু গোবিন্দদাস কৃষ্ণের সম্মুখে রাধামুখে সেই পথকষ্টের বর্ণনা শুনিয়ে শেষ পর্যন্ত এক গভীর ভাবদ্যোতনায় রাধাকে দিয়ে বলিয়েছেন—

"তুয়া দরশন আশে কছু নাহি মানলুঁ
চিরদুখ অব দূরে গেল।।"

পরমকে পাওয়ার তৃপ্তিতে রাধা বিভোর। কিন্তু বিদ্যাপতির রাধা মিলন সুখেও চিরঅতৃপ্তিকে বহন করেছেন, তবে মিলনের আবেশে তিনি বিভোর।—

"আজু রজনী হম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা।।"

বৈষ্ণব ভক্ত কবি গোবিন্দদাস রসশাস্ত্রের অনুসরণে অভিসার পদ রচনা করেছেন। কিন্তু সেগুলি প্রাণহীন নীরস শাস্ত্রতত্ত্ব হয়ে ওঠেনি। চিত্রশিল্পীর মতো একের পর এক প্রাকৃতিক পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলে সেই পটভূমিকায় মনস্তাত্ত্বিক শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে কবি তাঁর অভিসার পর্যায়ের নিপুণ আলেখ্য রচনা করেছেন। কাব্য সৌন্দর্যে তাই তা অনুপম।

বিদ্যাপতি প্রেয়োবোধের সঙ্গীত রচনা করেছেন আর গোবিন্দদাস প্রেমের শ্রেয়োবোধের গান রচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য রাধার যে প্রেম-সাধনা তা অনন্তের অমৃতলাভের জন্য। অনন্ত বলেই সেই প্রেমের অভিসারের বিরতি নেই। পরমের সাধনা দুঃখের সাধনা— দুঃখের মধ্য দিয়ে, ত্যাগের মধ্য দিয়ে সেই সাধনার পথ। গোবিন্দদাসের অভিসারের পদে রাধার প্রেমসাধনা বিশ্বব্যাপী জীবনছন্দের দার্শনিক প্রতীতির অভিব্যঞ্জনা লাভ করেছে। কিন্তু বিদ্যাপতির অভিসার কাব্যের এই মর্যাদা নেই। তাঁর অভিসারে নিত্য সঙ্গীতের সুরে উৎসারিত উদাত্ততার অভাব রয়েছে। কিন্তু অভিসার-কল্পনায় অনেক বেশি পরিমাণে বৈচিত্র্যের সুযোগ নিয়েছেন। পরিবেশ চিত্রণে চরিত্রাঙ্কণে বিদ্যাপতির বৈচিত্র্য গোবিন্দদাসে নেই। গোবিন্দদাসও অভিসারের নানা বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। কিন্তু গোবিন্দদাসের বৈচিত্র্যের পেছনে রয়েছে অলঙ্কারের কলাপাঠ, আর বিদ্যাপতি সেখানে জীবনানুসারী কবি। গোবিন্দদাস অভিসারের বিচিত্র পর্যায় দেখিয়েছেন— তার প্রস্তুতি, যাত্রা, স্মৃতি রোমন্থন ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর রাধার মনস্তত্ত্বের রূপ মোটামুটি একই কাঠামোয় বাঁধা। কিন্তু বিদ্যাপতির রাধায় বিচিত্র মনোরূপের প্রকাশ। তিনি যাত্রা করেছিলেন লৌকিক পরকীয়া নায়িকা থেকে, তাঁর আদর্শ ছিল সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাব্যের অভিসারিণীর বর্ণোজ্জ্বল রূপ,— কিন্তু তারপরেও তিনি স্বকীয় ভাবপ্রেরণায় আধ্যাত্মিক অভিসারিকাকে পর্যন্ত দর্শন করেছেন ও করিয়েছেন।

সেক্ষেত্রে গোবিন্দদাস বৈষ্ণব শাস্ত্রের অনুসরণে অভিসারের ভাবগত বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে তাঁর অভিসার পদের শিল্পরীতি বৈশিষ্ট্যদ্যোতক। অলঙ্কার-সজ্জায়, শব্দচিত্রে, ধ্বনিঝংকারে, অনুভূতির তীক্ষ্ণতায়, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের

আরোপে, চিত্রধর্মে ও নাটকীয়তায় তাঁর পদগুলি উচ্চশ্রেণির গীতিকবিতার উৎকর্ষ লাভ করেছে। যদিও গোবিন্দদাসকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' বলা হয়, কিন্তু অভিসার পর্যায়ের পদে গোবিন্দদাসই শ্রেষ্ঠ, এমনকি অনেক সময় তিনি বিদ্যাপতিরও ঊর্ধ্বে। অভিসার শেষে মিলন— এরপরই বিরহ।

পদাবলি অশ্রুর মন্দাকিনী, বেদনার বেদধ্বনি, আনন্দদগ্ধ হৃদয়ের শিখা। এ কাব্যের প্রধান কবি বিদ্যাপতি। প্রেম মিলনকামী। বিদ্যাপতির পদে মিলনলীলার অসাধারণ রাগরক্ত-রূপ যেমন দেখা যায়, তেমনি বিরহ পদেও বিদ্যাপতি অদ্বিতীয়। আসল কথা, বিদ্যাপতি ভোগবাদী কবি, কিন্তু ভোগসর্বস্ব নন। মিলন তাঁর ক্ষেত্রে কেবল দেহসুখ নয়, বৃহত্তর জীবন পিপাসার অন্তর্গত— সেই জীবনের আনন্দ-রূপকে গভীরভাবে যিনি বোধ করেছেন, জীবনের যাতনা-রূপের দর্শনও তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। না পাওয়া থেকে পেয়ে হারাবার যন্ত্রণা আরো ব্যাপক ও গভীর। পদাবলি সাহিত্যে বিদ্যাপতি রাধার বিরহকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছেন 'মাথুর'-এর মাধ্যমে। কৃষ্ণের মথুরা গমনকে কেন্দ্র করে বিদ্যাপতি বিরহের বৈচিত্র্যময় রূপ দেখিয়েছেন রাধার মধ্য দিয়ে। রাধার বিরহ বেদনা তীব্র ও নিখিল-ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে—

"এ সখি হমারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন মন্দির মোর।।"

বিরহের তীব্রতা ও শূন্যতাবোধের হাহাকারকে বিদ্যাপতি সার্থক বাণীরূপদান করেছেন। বিরহযন্ত্রণাদগ্ধ রাধার জ্যোতির্ময়ী মূর্তি ফুটে উঠেছে এই 'মাথুর' পদে। বিরহে রাধার আর্তিকে, সুতীব্র ব্যাকুলতাকে বিদ্যাপতির মতো অন্য কোনো কবি ফুটিয়ে তুলতে পারেননি।

গোবিন্দদাসও পারেননি। বিরহপদে তিনি ম্লান প্রতিভা। অভিসারে যিনি বিদ্যাপতিকেও স্থানে স্থানে ছাড়িয়ে গেছেন, বিরহের পদ রচনায় তাঁর সেই সার্থকতা নেই। এর কারণ হল, তিনি বেদনার কবি নন, আরাধনার কবি। তাই তাঁর বিরহ-বেদনায় ভেসে আসে স্মৃতি—

"যাহে লাগি গুরুগন্- জনে মন রঞ্জলুঁ
দুরুজন কিয়ে নাহি কেল।
যাহে লাগি কুলবতী- বরত সমাপলুঁ
লাজে তিলাঞ্জলি দেল।।
সজনি জানলুঁ কঠিন পরাণ।
ব্রজপুর পরিহরি যাওব সো হরি
শুনইতে নাহি বাহিরান।।"

বিরহই বৈষ্ণব কবিতার মূল শক্তি। কেননা বিরহবোধেই প্রেমের যথার্থ উপলব্ধি। গোবিন্দদাস বিরহের পদ রচনায় সেই উপলব্ধিতে পৌঁছতে পারেননি।

বিদ্যাপতি তীব্র বিরহেও দেহকে অস্বীকার করেননি। আবার বিরহের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেই কাব্যে চিরবিচ্ছেদের সীমারেখা টেনে দেননি। দেহের প্রাকার ভেঙে তিনি ভাবসম্মিলনের অতীন্দ্রিয় ভুবনে নিয়ে গেছেন রাধাকে।—

"কি কহববে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।।"

প্রেমের ধ্যানশক্তিতে বিচ্ছেদের অন্তহীন অশ্রুসমুদ্রেও বিদ্যাপতি মিলনদ্বীপ রচনা করেছেন। এই মিলন দেহের ভারে কম্পিত নয়, ভাবের আবেগে থরোথরো। এই প্রেম ত্রিভুবনে অপ্রাপ্তব্য, বিচ্ছেদহীন। তাই রাধার ভাবোল্লাস—

"আজু রজনী হাম ভাগেঁ পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিশ ভেল নিরদন্দা।।"

চির বিরহের মধ্যে প্রেমের শাশ্বত মহিমা দীপ্যমান হয়ে উঠেছে বিদ্যাপতির কাব্যে—

"জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।

....

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন ন গেল।।"

কারণ এই প্রেম চির পুরাতন— চিরনবীন, সঞ্জীব সুন্দর। লক্ষ মুখ দিয়েও তার ব্যাখ্যা করা যায় না। —

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।।"

এই তিলে তিলে নবীন হয়ে ওঠা প্রেমের ক্রমবিকাশ দেখাতে গিয়ে কবি প্রতিভারও ক্রমবিকাশ ঘটে গেছে।

গোবিন্দদাস অভিসার পর্যায়েই তাঁর সমস্ত কবিত্ব শক্তি, তাঁর ভক্ত-হৃদয়, দার্শনিকতাকে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন— সাধনার চূড়ান্ত রূপ— সাধনার শেষে মিলনটুকুকে দেখিয়েই পদাবলির জগৎ থেকে তিনি বিদায় নিয়েছেন; তবে যা দিয়ে গেছেন— সেই বিশেষ পর্যায়— 'অভিসার' পর্যায়ে, —বাংলা সাহিত্যে তা অনন্য, অভিনব, দ্বিতীয়-রহিত। এর পরের পর্যায়ে যে স্বল্প সংখ্যক পদ তিনি রচনা করেন, তা গতানুগতিক।

গোবিন্দদাস ছিলেন যুগপৎ কবি ও সাধক। বৈষ্ণবীয় ধর্ম-দর্শন ও অলঙ্কার শাস্ত্রে তিনি প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। ভক্তিধর্ম ও কবিকল্পনার যুক্ত আধারে রচিত বলেই তাঁর পদগুলি তত্ত্বাদর্শে ও জীবন রসে অপূর্ব কাব্যশ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্য বাস্তবিকই বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাষ্য। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দার্শনিক ভিত্তি এবং রসপর্যায় অনুসারে অকৃত্রিম প্রেমভক্তির-কাব্য রচনা করেছেন।

বিদ্যাপতির-পদাবলির শেষেরও শেষ কথা আছে। রাজসভার প্রমোদমত্ততার মাঝখানে তাঁর কাব্য ঝলমল করে উঠেছে। জীবনের ভোগবতী ধারাকে অনুসরণ করলেও তাঁর কাব্যে সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত ক্রমবিকাশ ও উত্তরণ ঘটেছে। পার্থিব জীবনের জয়গান

করতে করতে তিনি অপার্থিব স্বর্গলোকের সন্ধান করেছেন। তিনি ভোগবাদী কবি, কিন্তু ভোগসর্বস্ব কবি নন। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা না নিয়ে, বৈষ্ণবীয় জীবনচর্যা ও সাধন ভজনের রীতিনীতি না মেনেও অনুভূতির প্রগাঢ়তা ও সত্যোপলব্ধির গভীরতায় তিনি বৈষ্ণবোত্তম এক পরম মহন্ত। আদি রসকে ভিত্তি করেই বিদ্যাপতি শৃঙ্গারকে ভক্তির উচ্চমার্গে তুলেছেন। সৌন্দর্য সুখ সম্ভোগের তরঙ্গলীলায় তাঁর পদাবলি মিলন-মধুর বিরহ-বিধুর শাশ্বত জীবন ছন্দকে বর্ণদীপ্ত করে আধ্যাত্মিকতার দিকে গতি নির্দেশ করেছে। রাধা চরিত্র চিত্রণে তিনি যে ক্রম পরিণতি ও পূর্ণতম বিকাশ দেখিয়েছেন সেখানে কবিকৃতির চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। তাঁর জীবনসাধনা ও ভাবসাধনা 'প্রার্থনা' পদে ক্রমবিকাশের শেষ প্রান্তে পরম অদ্বয় সত্যে সমাহিত ও শান্তিকামী—

"ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু।।"

গোবিন্দদাসে প্রার্থনার পদ নেই।

গোবিন্দদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির পার্থক্য হল— গোবিন্দদাস চৈতন্য-পরবর্তী কালের কবি। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ধর্মের অনুশাসন এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রসশাস্ত্রের আলোকে তাঁর কাব্য রচনা করেছেন।

ফলে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পার্থক্য মূলেই। চৈতন্য-পূর্ব যুগের কবি বিদ্যাপতি কোনো ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা পরিচালিত হননি। তিনি শিল্পী এবং কবি। এই দৃষ্টিতেই দূর হতে তিনি রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন— গোবিন্দদাসও দূর হতে রাধাকৃষ্ণের লীলা আস্বাদন করেছেন, কিন্তু উভয় কবির পার্থক্য হল দৃষ্টি ভঙ্গিতে। বিদ্যাপতি শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে রাধাকে দেখেছেন। আর গোবিন্দদাস জীবনে ও কাব্যে আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তি-সাধনায় পরকীয়া তত্ত্বে মঞ্জরী ভাবের সাধনা করেছেন। রাধা কৃষ্ণের মিলন-লীলায় গোবিন্দদাস মঞ্জীরর ভূমিকায় গভীর অনুভূতিতে তন্ময় ও একাত্মচিত্ত। এত ব্যবধান সত্ত্বেও গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির যোগ্য উত্তরসূরী বলা হয়। তার প্রথম কারণ হল ভাষা।

বিদ্যাপতি মাতৃভাষা মৈথিলিতে পদাবলি রচনা করেছেন। এই ভাষা তাঁর শিক্ষিত চর্চা নয়। এ ভাষা তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত রক্তের মতো সহজ ভাষা। কিন্তু গোবিন্দদাস ব্রজবুলি ভাষাকে শিল্প রচনার উপকরণ রূপে গ্রহণ করে আশ্চর্য সিদ্ধি লাভ করেছেন। এই ব্রজবুলি মৈথিলি ও বাংলা ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্ট এক কৃত্রিম কাব্যভাষা। কবির মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু শিল্পী গোবিন্দদাসের প্রাণের ভাষা হয়ে উঠেছে এই ব্রজবুলি ভাষা। এই ভাষার সুসংবদ্ধ প্রয়োগে যে ধ্বনিরোল সৃষ্টি হয়েছে সেখানে ধ্বনি ও চিত্রের সংগম অদ্ভুত শিল্পরসোত্তীর্ণ রূপ লাভ করেছে। ব্রজবুলি ভাষায় গোবিন্দদাস ভাবকে গাঢ়তর ও ভাষাকে ধ্বনি গাম্ভীর্য দান করেছেন। ভাষা শিল্পের দক্ষ কবি গোবিন্দদাস— এক্ষেত্রে তিনি 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'। বিদ্যাপতি জীবনের কবি, প্রেমের কবি, রূপের কবি, সৌন্দর্যের কবি, গভীর জীবন রহস্যের কবি। গোবিন্দদাস ভক্ত কবি হয়েও রূপের কবি, সৌন্দর্য সাধনার কবি, আরাধনার কবি। কাব্যের প্রসাধন কলায় এক সুদক্ষ কবি হিসেবে বিদ্যাপতি যেমন অপূর্ব কল্পনা শক্তিবলে কাব্যে ছন্দ-অলঙ্কার সৃষ্টি করে বিচিত্রভাবকে

রূপে রসে সৌন্দর্যে বিকশিত করে তুলেছেন, ভক্তের আকুতি নিয়েও গোবিন্দদাস এস্থলে উত্তরসূরী হয়ে উঠেছেন। বিদ্যাপতি আত্মসমাহিত কবি নন— রাজসভার উপযোগী করে তাঁকে কাব্য রচনা করতে হয়েছে বলেই শব্দ প্রয়োগ, ছন্দ, অলঙ্কার, মণ্ডনকলা সম্বন্ধে অধিকতর মনোযোগ রাখতে হয়েছে তাঁকে। আর গোবিন্দদাস ভাবমগ্ন কবি হলেও শিল্পী হিসেবে ছন্দ-অলঙ্কার-শব্দ প্রয়োগে বিদ্যাপতির সমধর্মী হয়ে উঠেছেন। শব্দবিন্যাস ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস— উভয়ের পদাবলিতে যেমন শিল্প চাতুর্য-কলার বিচিত্রমুখী অভিব্যক্তি ঘটেছে তেমনি জীবনের বিপুল আনন্দ-বেদনা ও আলো-আঁধারি রহস্য কাব্য ব্যঞ্জনায় শাশ্বত মহিমা লাভ করেছে। এই কৌশলে বিদ্যাপতি পদাবলির বিচিত্র পর্যায়ে রাধাকে নবশোভা নবরূপা নায়িকায় গড়ে তুলেছেন আর এই কৌশল অবলম্বনে অভিসার পর্যায়ে গোবিন্দদাস রাধাকে-শাশ্বত সাধিকা করে গড়ে তুলেছেন।

বিদ্যা ও বৈদগ্ধ্যে গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতি পদাবলি সাহিত্যে অতুলনীয়। উভয়েই সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের ও ছন্দ শিল্পের কবি। উভয়েই রূপশিল্প ও রূপলোক নির্মাণে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিদ্যাপতির কাব্যপ্রেম ও ভোগৈশ্বর্যের সুরলোক আর গোবিন্দদাসের কাব্য সুর, সংগীত ও রসের অমরাবতী। চিত্রকল্প, নাটকীয়তা ও সংগীতময়তার ত্রিবেণীসংগম ঘটেছে গোবিন্দদাসের পদাবলিতে।

আলঙ্কারিক সৌন্দর্য ও ছন্দ কুশলতায়, শব্দ-ঝঙ্কার ও ছন্দোস্পন্দন, মণ্ডনকলার চাতুর্য ও ভাবের ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে চৈতন্য-পূর্বযুগের প্রথম শ্রেণির এবং শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি। তেমনি ক্লাসিক্যাল রীতিবিন্যাসে, সংগীত ধর্মে, রোমান্টিকতায় ও তত্ত্ব গভীরতায় চৈতন্যোত্তর যুগে গোবিন্দদাস একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তা— বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি।

১.৬.২.৩ চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস

মানুষ মাত্রেই অনুকরণপ্রিয়। বলা যায়, জীবন শুরু হয় অনুকরণের মাধ্যমে, আর এর মাধ্যমেই ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে তার স্বকীয়তার আভাস, পরবর্তী কালে যা তাকে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে। এ-কথা মনস্তত্ত্বসম্মত বলেই মনস্তত্ত্বের একটি বিশেষ অংশ জুড়ে রয়েছে এই অনুকরণের আলোচনা।

স্রষ্টার সৃষ্টি আপন প্রতিভার তাগিদে, অন্তরের অন্তঃস্থলে ভাবের অজস্র মুকুলের সমারোহে স্রষ্টার হৃদয়ে জাগে ফল ফলাবার প্রেরণা। সেই সৃষ্টি তার আপন অন্তরেরই বাণীবাহক। তবে কখনো দেখা যায় কোনো এক অনির্দিষ্ট কারণে দুটি হৃদয়-বীণা একই সুরে ঝঙ্কৃত হয়। আপাত দৃষ্টিতে সে-সুর এক বলে মনে হলেও সচেতন শ্রবণেন্দ্রিয় ঠিক তার পৃথক বৈশিষ্ট্যকে আবিষ্কার করে নেয়। বাইরে যা 'একহি স্বরূপ' ভেতরে তাই-ই দুটি পৃথক প্রতিমার আকার নেয় স্রষ্টার আপন-আপন বৈশিষ্ট্যে।

এমনই কারণে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয় যে, জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য, মন্ত্রশিষ্য বা উত্তরসাধক। ভাবে, ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে উভয়ের অত্যন্ত নিকট সাদৃশ্য থাকায় এই উক্তি প্রচলিত হয়েছে। বস্তুত ভাবৈশ্বর্য ও গঠন কৌশলের দিক থেকে দুজনের রচনার মধ্যে নিবিড় একাত্মতা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু তাই বলেই জ্ঞানদাস যে চণ্ডীদাসকে হুবহু অনুসরণ বা অনুকরণ করেছেন তা নয়। উভয়ের মধ্যে রয়েছে সুদূর পার্থক্য।

বর্তমান আলোচনায় উভয় কবির সমিল ও অমিল স্পষ্ট করবার জন্যেই প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে।

জ্ঞানদাসের সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রথম এবং প্রধান পার্থক্য যুগ ও ধর্মের ক্ষেত্রে। চণ্ডীদাসকে চৈতন্য-পূর্ব যুগের কবি বলেই ধরা হয়। ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃতে'—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।।"

কিন্তু জ্ঞানদাস চৈতন্যোত্তর যুগের কবি। চৈতন্যদেবের দিব্য জীবনের প্রভাবে বাংলাদেশে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বিকাশ লাভ করেছিল, চৈতন্য-পূর্ব কবি হওয়ার ফলে চণ্ডীদাসের মধ্যে সেই ধর্মের কোনো প্রভাব পড়েনি। আবার বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামী-কৃত বৈষ্ণব-ভক্তি রস-শাস্ত্রের যে বন্ধন— তাও চণ্ডীদাসের পরবর্তী যুগের ঘটনা। ফলে চণ্ডীদাস কাব্য রচনার ক্ষেত্রে ছিলেন স্বাধীন। ধর্ম তাঁরও ছিল। সে ধর্ম হল সহজিয়া ধর্ম। প্রথম জীবনের বাশুলি দেবীর ভক্ত ও সেবক চণ্ডীদাস পরবর্তীকালে সহজিয়া ধর্ম মতাবলম্বী। তাঁর পদাবলিতে এর প্রভাব পড়েছে।

কিন্তু জ্ঞানদাস চৈতন্যোত্তর কবি এবং ভক্ত বৈষ্ণব কবি। ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনুশাসন তথা গোস্বামী-কৃত বৈষ্ণব ভক্তিরস শাস্ত্রের বিধান তাঁকে কাব্যরচনার ক্ষেত্রে মেনে চলতে হয়েছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে মানব মহিমা স্বীকৃত। মানবজীবন ধন্য, কেননা মানবের সাধন-নির্মল নয়ন রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা দেখতে পায়। তার নিবেদিত হৃদয়ের সেবাধিকার বৃন্দাবন পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু নিজেকে সে সেই লীলার সঙ্গে একাত্ম করতে পারে না। তটস্থ জীব সে, তাই তার সাধনা মঞ্জরী বা সখিভাবের সাধনা— দূর হতে সেই অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণলীলা প্রত্যক্ষ করেই তার জীবন সার্থক হয়। জ্ঞানদাসের মধ্যে এই বৈষ্ণব অনুমোদিত সেবাধন্য রূপটি ফুটে উঠেছে।

সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনাতেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মতো মানব মহিমা স্বীকৃত, কিন্তু তা ব্যাপকতর গভীরতর অর্থে। সহজিয়ারা মানুষের ভেতরেই ঈশ্বরের লীলাকে প্রত্যক্ষ করেছে। এই সাধনার অঙ্গরূপে রয়েছে পিরীতিতত্ত্বের বন্দনা ও কিশোরী-ভজনা। নরনারীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার আনন্দঘন অবস্থাকে সহজিয়া বৈষ্ণবেরা বলেন 'প্রেম' যার প্রতিশব্দ 'পিরীতি'। আর কিশোরী স্বয়ং রাধিকা। সহজিয়াগণ রাধা-কিশোরীর ভাবারোপে নিজ-কিশোরীর সেবা করেন। চণ্ডীদাসের পদে এই পিরীতিতত্ত্ব ও কিশোরীতত্ত্বের বিশ্লেষণ ও বন্দনা আছে অজস্র। বিশেষত তাঁর জীবনই তাঁর কাব্য। তাই তাঁর রাধা-কৃষ্ণ লীলা কাহিনিতে তাঁর জীবনের ছায়াপাত অর্থাৎ তাঁর প্রেমিকা তাঁর সহজিয়া সাধনার সঙ্গিনী রামী ও তাঁর প্রেম-কাহিনির দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়।

চণ্ডীদাসের জীবন তথা কাব্যলোকে প্রবেশকালে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য— "তিনি (চণ্ডীদাস) বাসুলী-মন্দিরে সুবর্ণমণ্ডিত স্তম্ভের অন্তরালে

প্রাতঃসূর্যের আলোকে এক সোনার পুতুলীকে দেখিয়াছিলেন, সেই শুভদৃষ্টিতে তাঁহার সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল";—

বলা বাহুল্য, এই 'সোনার পুতুলী' হলেন রজকিনী রামী— চণ্ডীদাসের সাধনসঙ্গিনী— তাঁর কাব্যসাধনার আলোক শিখা, তাঁর সমাজ জীবনের কলঙ্কের কালিমা। এই কলঙ্ককে চণ্ডীদাস কেবল কণ্ঠভূষণই করেননি, তাকে কাব্যলোকের আধ্যাত্মিক আলোকে মহিমান্বিত করে বলেছেন—

"রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাস গায়।।"

চণ্ডীদাস এই প্রেমরসকে অগ্নি হতেও দেখেছেন, আবার বিশুদ্ধ দেহমনকে অবলম্বন করে সেই প্রেমকে 'নিকষিত হেম' হয়ে উঠতেও দেখেছেন। তাই তাঁর পদাবলিতে চণ্ডীদাসের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ বিশুদ্ধ চেতনায় পূর্বরাগ পর্যায়ের সমস্ত স্বাভাবিকতাকে ভেঙ্গে যে রাধা দেখা দিয়েছেন তিনি 'রসকলাবতী' নন, তিনি 'প্রৌঢ়পারাবতী'। চণ্ডীদাস দূর থেকে এই রাধাকে দেখেননি; এই রাধার প্রেমে মিশে আছে রামী-চণ্ডীদাসের প্রেমের দীর্ঘশ্বাস, এই রাধার বেদনায় একাত্ম হয়ে গেছেন স্বয়ং কবি। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সবচেয়ে কঠোর নিষেধ যে— চণ্ডীদাসে লঙ্ঘিত হয়েছে, বৈষ্ণব সমাজে সেই চণ্ডীদাস ব্রাত্য পদকর্তা তো ননই, বরং 'মহাজন' রূপে তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন।

চণ্ডীদাসের এই স্বীকৃতির কারণ হল, তিনি অকৃত্রিম বাঙালি কবি। বাঙালির প্রাণরস সবচেয়ে বেশি উৎসারিত তাঁর অশ্রুসজল কাব্যে। তিনি আমাদের গভীরতম আবেগমুহূর্তটিকে স্পর্শ করতে পেরেছেন। গীতিরসে বাঙালির সহজ অধিকার— সেই গীতিরস বেদনার রসে ভরা। চণ্ডীদাস গানের স্রোতে অশ্রুর বন্যা নিয়ে এসেছিলেন। 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' সেই প্লাবন-সঙ্গীতকে ঢেলে আকুল করে তুলেছিলেন।

চণ্ডীদাসের কাব্যে গ্রাম বাংলা তার প্রকৃতি ও মানুষ নিয়ে উদ্ভাসিত। সমস্ত বৈষ্ণব কবিকুলের মধ্যে এদিক দিয়ে চণ্ডীদাস অনন্য। বাস্তব জীবনের এমন মুখোমুখি আর কোনো কবি দাঁড়াননি। রমণীয় কোনো কল্পলোকে নয়, জীবনকে প্রত্যক্ষ করে তার তথ্যভিত্তিতে কাব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা বাঙালি পদকর্তার মধ্যে কেবল চণ্ডীদাসই করেছেন।

জ্ঞানদাসের জীবন কাহিনি স্বল্পই জানা যায়। চণ্ডীদাসের মতো তাঁকে নিয়ে কোনো কাহিনির সন্ধানও পাওয়া যায় না। যেটুকু পাওয়া যায় তা কেবল তাঁর ধর্মগ্রহণ ও সেই ধর্মের প্রভাবের কথা। কবি চিরকুমার ছিলেন, কিন্তু তার পেছনে কোনো রহস্যাবৃত কাহিনি রয়েছে কিনা তা জানা যায় না। জ্ঞানদাস বৈষ্ণব ভক্ত কবি। বৃন্দাবনে তীর্থযাত্রাকালে বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্যদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছেন তিনি। চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব-ভক্ত-কবি-রূপে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বিধি-বিধান মেনে কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু এই বিধি-বিধান তাঁর স্বতঃস্ফূর্ততায় বাধাসৃষ্টি করতে পারেনি।

চণ্ডীদাসের কাব্যে সত্যের সরলতা ও উপলব্ধির জ্যোতির্ময়তা আছে। তিনি সহজের কবি। ভাষার সৌন্দর্য, অলঙ্কারের নিপুণতা, ভাবের চারুত্বকে আশ্রয় না করেও কাব্যকে আত্মার প্রকাশ-স্বরূপ করে তুলেছেন কবি। তাঁর কাব্যে সহজতাই সবচেয়ে বড়ো সত্য। সেই সত্য ভূষণবিহীন, কিন্তু সযত্ন লালিত। এর দ্বারাই কবি আমাদের নিয়ে গেছেন প্রেমের স্বর্গোদ্যানে। তিনি 'মরম' আর 'ধরমে'র কবি। তাঁর কাব্যে রূপের ঐশ্বর্য-তরঙ্গ, শব্দের চূর্ণ ঝঙ্কার, বর্ণের বাসন্তী উচ্ছ্বাস নেই, নেই রসকৌতুকের নর্মলীলা। চণ্ডীদাসের বৃন্দাবন বাস্তবের নয়, সেই ভাব-বৃন্দাবন কৃষ্ণ-যমুনার অশ্রুজলতলে হৃদয়-যমুনা তটে অবস্থিত।

জ্ঞানদাস চৈতন্যোত্তর যুগের ভক্ত ভাবুক কবি। ভাবের গভীরতা, রসানুভূতির তীব্রতা ও প্রকাশভঙ্গির মাধুর্যে তাঁর রচিত পদাবলি রসিক-জন-চিত্ত-মুগ্ধকারী।

চণ্ডীদাসের মতোই জ্ঞানদাসের গাঢ় গভীর অনুভূতির আকৃতি এবং সেই অনুভূতিকে সংহত অথচ তীব্র করে প্রকাশ করবার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু চণ্ডীদাস ভাব ও রসের সমন্বয়ে তাঁর কাব্য-প্রতিমা গঠন করেছেন আর জ্ঞানদাস রূপ ও রসের সমন্বয়ে কাব্যমূর্তি গঠন করবার মতো দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী।

কাব্যের ক্ষেত্রে চণ্ডীদাস দেখিয়েছেন অলঙ্কারবিহীন যোগিনীর ভাবাকুল উদাস ভঙ্গি আর জ্ঞানদাস দেখিয়েছেন তড়িতালোকের রূপরাশি।

প্রেমের অনন্ত রহস্য, মিলনের ব্যাকুলতা, চিরন্তন অতৃপ্তি চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস— উভয় কবির পদাবলিতেই পাওয়া যায়। মর্মলোকই উভয় কবির নিত্য-বৃন্দাবন-ভূমি। আর সেই ভূমিতেই উভয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁদের পদাবলিকে। তাই উভয়ের কাব্যেই ব্যক্তিগত আবেগের সুর বেজেছে।

কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলিতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রলম্বিত ছায়াপাত ঘটেছে যেখানে, সেখানে জ্ঞানদাসের পদাবলিতে তাঁর ভক্ত হৃদয়ের ভাব ফুটে উঠেছে।

তাই চণ্ডীদাস যেখানে বলেন—
"............................ পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি।।"

সেখানে জ্ঞানদাসকে বলতে হয়—

"জাগিতে ঘুমাতে আন নাহি চিতে
রসের পসার কাচে।
জ্ঞানদাস কহে এমন পিরীতি
আর কি জগতে আছে।।"

এক রোমান্টিক রহস্যময়তা চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস— উভয় কবির পদে প্রাণস্পন্দন জাগিয়েছে। চণ্ডীদাসের পদাবলি তাই আধ্যাত্মিকতার স্তরে পৌঁছে গেছে। আগুনে পুড়ে খাঁটি হয় সোনা, বেদনার আগুনে পুড়ে খাঁটি হয় মন। মর্ত্যের প্রাকৃত দেহমনকেও পুড়িয়ে বিশুদ্ধ, অপ্রাকৃত লোকের সামগ্রী করে তোলা যায়। সেই বিশুদ্ধতম দেহমনকে অবলম্বন করে যে প্রেম তা তখন হয়ে ওঠে 'নিকষিত হেম'। চণ্ডীদাসের স্বর্গ এই পৃথিবী। তাঁর ছিল পবিত্র পার্থিবতা যা জগতের সবচেয়ে কঠিনতম বস্তু। অথচ এই

কঠিন কর্মে সিদ্ধির গৌরব রয়েছে চণ্ডীদাসে তাই তাঁর পদাবলিতে মৃৎপীঠে স্থাপিত রাধিকার স্বর্ণদেহ ভেদ করে একটি শুদ্ধসত্ত্ব বিভা তাঁকে একই সঙ্গে কাছের এবং দূরের, ঘরের এবং বাইরের, বচনীয় এবং অনির্বচনীয়ের করে তুলেছে।—

"গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছলছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি।।"

কিন্তু জ্ঞানদাস মিষ্টিক কবি নন। তাঁর কাব্যে আধ্যাত্মিকতা নয়, একটি আভাস স্পন্দিত হয়ে অসীমকে স্পর্শ করেছে। এই ধ্বনিস্পন্দন জ্ঞানদাসের মতো অন্য কোনো বৈষ্ণব পদকর্তার মধ্যে পাওয়া যায় না।—

"ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কিবা করে প্রাণ।"

জ্ঞানদাসের কাব্যে আছে সঙ্গীত, আছে কারণহীন আবেগ। এই আবেগই তাঁর কাব্যে এনে দিয়েছে অন্তহীন পথের প্রেম। এই না-বলার আবেগ, না-পাওয়ার অতৃপ্তি, না-থামার আনন্দ— যুগ-যুগান্তরের গীতিকবির চিত্তের এই আনন্দ-বেদনা-উল্লাস— জ্ঞানদাসের বিশিষ্ট কবি-মনের সম্পদ।

প্রেমের অনন্ত রহস্য, মিলনের রসঘন আনন্দ ও নিবিড় প্রশান্তি, বিরহের মর্মান্তিক দহনজ্বালা— প্রেমের এই বিচিত্র আলো-আঁধারের লীলা জ্ঞানদাসের কাব্যে অপূর্ব শিল্পরূপ লাভ করেছে। আর চণ্ডীদাসের কাব্যের মূলসুর একটিই— নিখিলের বিরহিণী নারীর শাশ্বত ক্রন্দন। মিলনে-বিরহের দোলায় এ মন দোলে না— এ মন স্থির গম্ভীর, আকুল বেদনার অনির্বাণ দীপশিখা জ্বালিয়ে রাখে।

চণ্ডীদাস রূপকে ভাবের গভীরতায় ডুবিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু জ্ঞানদাস শিল্পীর যাদু কাঠির স্পর্শে ভাবের রূপনির্মাণ করেছেন। তাই চণ্ডীদাসের রাধা—

"এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দুহাত তুলি।।"

কিন্তু জ্ঞানদাসের রাধার—

"পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে।।"

চণ্ডীদাস কবি-তাপস, বেদনার কালিদহে সিত পদ্মের মতো তিনি এবং তাঁর কাব্য। প্রেম যে দ্রবীভূত হৃদয়, কান্না যে বিগলিত নয়ন, হাসি যে ছলোছলো আত্মা চণ্ডীদাসই তা জানিয়েছেন। তাঁর কাব্যের পর্যায়ে পর্যায়ে এক অশ্রুভরা বেদনা-সমৃদ্ধ, এক 'জল ছলোছলো আঁখির আভাস'।

জ্ঞানদাসের কাব্যে দুঃখবোধ আছে, কিন্তু সেই বোধের গভীরে বেদনার আভাস নয়, আছে আনন্দময় আলোক-রশ্মি।

চণ্ডীদাস বা জ্ঞানদাস— কেউই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার ধারাবাহিক পদাবলি রচনা করেননি। কারণ, ঘটনা অপেক্ষা ভাবের অভিব্যক্তি ও রসসৃষ্টি করাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। তবে চণ্ডীদাসের কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে আপন জীবনবোধের তাগিদ অনুভব করেছেন আর জ্ঞানদাস কাব্য রচনাকালে ভক্তি-ভাবুকতাকে কাজে লাগিয়েছেন।

চৈতন্য-পূর্ববর্তী ও চৈতন্য-পরবর্তী যুগের কবিদের পদ রচনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পার্থক্য হল, চৈতন্য-পূর্বযুগে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনার প্রশ্নই ছিল না, কিন্তু চৈতন্য-পরবর্তী যুগের কবিদের মধ্যে মহাপ্রভুর দিব্য জীবনের লীলা এমন গভীর প্রভাব ফেলেছিল যে, সেই আবেগে তাঁরা শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে একাধারে রাধা ও কৃষ্ণের লীলাকে প্রত্যক্ষ করে মহাপ্রভুর দিব্য জীবনের লীলা বিষয়ক পদ রচনা করেছেন।

জ্ঞানদাস চৈতন্য-পরবর্তী যুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত কবি। তাঁর কাব্যে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদে কৃষ্ণ-বিরহিনী রাধার ভাব অপরূপ ভাষায় ফুটে উঠেছে; এক কথায় যাকে বলা যায় গৌরচন্দ্রিকার পদ—

> "অতি দূরবল দেহ ধরণে না যায়।
> ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর মুখে চায়।।
> কোথায় পরাণনাথ বলি খেনে কান্দে।
> পুরব বিরহ জ্বরে থির নাহি বান্ধে।।"

আর চৈতন্য-পূর্বযুগের কবি হয়েও চণ্ডীদাসের মধ্যে এত বেশি 'চৈতন্য দ্যুতি' রয়েছে যে, কখনো মনে হয় তিনি চৈতন্য-পরবর্তী যুগেরই কবি। তাঁর পদাবলিই তাঁর অস্তিত্বের সমস্যাকে আরো বেশি জটিল করে তুলেছে। কিন্তু চণ্ডীদাসকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি হিসেবেই গ্রহণ করা যায়, কারণ, শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী কালে বৈষ্ণব পরিমণ্ডলীতে আবির্ভূত কোনো কবির এতখানি বিজয়ী ব্যক্তিত্ব কল্পনা করতেও কুণ্ঠা হয়। যিনি চৈতন্যের প্রেমকে জীবন-সর্বস্ব করেও তাঁর প্রেমের দার্শনিক ভিত্তিকে এমন করে অতিক্রম করেছেন, তাঁর শাস্ত্রকে একেবারেই অস্বীকার করেছেন, যতখানি শ্রীচৈতন্যের কাছাকাছিতে তাঁর অবস্থান— চৈতন্যতত্ত্বের ঠিক ততখানি দূরত্বে তিনি অবস্থিত। জ্ঞানদাস যেমন গৌর-বিরহ-মূর্তি এঁকেছেন, একই সুর শুনি চণ্ডীদাসের রাধা-বিরহ-বেদনায়—

> "অকথন বেয়াধি সই কহনে না যায়।
> যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়।।
> পায়ে ধরি কান্দে তার চিকুর গড়ি যায়।
> সোনার পুতুলি যেন ধূলায় লোটায়।।"

কিন্তু সেই চণ্ডীদাস যখন রাধার মুখ দিয়ে বলান—

> "কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সবলোকে তাহাতে নাহিকো দুখ
> তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।।"

তখন এর মধ্যে আমরা চৈতন্য-তত্ত্ব, নয়, পাই রামী-চণ্ডীদাসের প্রেমতত্ত্ব। কাব্য রচনার ক্ষেত্রে চণ্ডীদাস স্বাধীন, তাই বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রের শাসনের বাইরে গিয়ে লোকজীবন থেকে উপমাদি সংগ্রহ করেছেন।

কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগের কবি জ্ঞানদাস তা পারেননি। তাঁর কাব্যে অলঙ্কার অর্থঘন অভিব্যক্তি নিয়ে এসেছে যা বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্র সম্মত—

"তাহে আছে সখি একটি তমাল
নবঘন সম দেখি।।
একটি তমাল সোনার বরণ
শুনলো মরম সখি।"

জ্ঞানদাস ভক্ত বৈষ্ণব, কিন্তু তার চেয়েও তাঁর বড়ো পরিচয় কবি ও শিল্পীরূপে। তাই চৈতন্যোত্তর যুগের কবি হয়েও সমস্ত দার্শনিকতার উর্ধে উঠে তিনি সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। স্বল্পরচিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা পর্যায়ে জ্ঞানদাস মাটির পৃথিবীর ছবি এঁকেছেন। অপ্রাকৃত বাৎসল্য প্রেমকে বর্ণনা করতে গিয়ে বাংলার কবি জ্ঞানদাস বাংলার জননীর হৃদয়কেই প্রস্ফুটিত করেছেন গভীর ভালোবাসায়। জীবনরসের কাব্য যে কতখানি জীবনের মৃত্তিকাবর্জিত হতে পারে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কাব্য তার দৃষ্টান্ত। কিন্তু এক্ষেত্রে জ্ঞানদাস ব্যতিক্রম। এখানে তিনি চণ্ডীদাসের অনুসারী। চণ্ডীদাসের কাব্যের একটি মূল সুর মানবপ্রীতি ও মর্ত্যপ্রীতি। তাঁর রাধাকৃষ্ণ কখনোই মৃত্তিকাস্পর্শ পরিহার করেনি। তাঁর রাধা শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশ, কিন্তু তাঁর আত্মার শিখা মৃৎভাণ্ডে জ্বলে উঠেছে। চণ্ডীদাসের রাধা তথা চণ্ডীদাসের কাব্য, —রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—

"আমার এই দেহখানি তুলে ধরো।
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো।।"

—এই সত্যটিকেই প্রমাণ করার জন্য ব্যাকুল।

পদাবলি - সাহিত্যে 'পূর্বরাগ' পর্যায়ে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। যদিও তিনি অন্যান্য পদও রচনা করেছেন, তথাপি বলা যায় তাঁর পূর্বরাগ পর্যায়টি বৈষ্ণব পদাবলির উষা-রাগিণী। পূর্বরাগ প্রেমের প্রথম সোপান— দেহ এখানে পরিত্যাজ্য নয়। কিন্তু চণ্ডীদাস পূর্বরাগের সব নীতি নিয়ম ভেঙ্গে, রাধাকে যৌবনে যোগিনী করে এমন এক সত্তায় উন্নীত করেছেন যে, প্রেমের জগতে তা অভিনব। তাঁর রাধা পূর্বরাগ পর্যায়েই কৃষ্ণকে দেখে আকুল হননি, তাঁকে দেখার পূর্বেই নাম শুনেই রাধা অবশ-বিকল চিত্ত।—

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।"

সহজ নিরলঙ্কৃত ভাষায় এত গভীর কথায় অনুরণন তুলতে পারেন একমাত্র চণ্ডীদাসই। তাই তিনি আধ্যাত্মিক কবি— কাব্যের মধ্যে আপন আত্মার প্রতিফলন ঘটিয়েও তিনি সম্পূর্ণত রোমান্টিক কবি হয়ে উঠলেন না।

অপর দিকে জ্ঞানদাসও অন্যান্য বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে পদাবলি সাহিত্যে 'পূর্বরাগ' পর্যায়ের পদও রচনা করেছেন। রূপের পূজারী তিনি, তাই তাঁর প্রকৃত আত্মপ্রকাশ ঘটেছে রাধা-কৃষ্ণের রূপ সমৃদ্ধলীলায়। কাজেই পূর্বরাগ পর্যায়ে জ্ঞানদাসের রাধাকে স্বপ্ন দেখতে হয় কৃষ্ণরূপ দর্শনের জন্য—

"মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে হেথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই।।"

এই স্বপ্ন দেখার পটভূমিটিও কবি তৈরি করেছেন 'রজনী শাঙন ঘন' এক বর্ষামুখরিত পরিবেশে। তাই চৈতন্যোত্তর যুগের ভক্ত বৈষ্ণব কবি হয়েও জ্ঞানদাস আধ্যাত্মিক নন— তিনি রোমান্টিক কবি।

জ্ঞানদাসের এই রোমান্টিক কল্পনার দীপ্তিতে বিভাসিত হয়ে উঠেছে বিমুগ্ধা রাধার কৃষ্ণ-অনুরাগ।

জ্ঞানদাস রাধার চোখ দিয়ে কৃষ্ণের রূপদর্শন করেছেন। চণ্ডীদাস প্রেমময়ী মহাভাবময়ী রাধার বিচিত্র অবস্থা বর্ণনা করেছেন— যার মূলে রয়েছে একটি মাত্র নাম— সে নাম কৃষ্ণ, একটিমাত্র ভাব— সে ভাব কালো রঙের বৈচিত্র্যে উদ্ভাসিত, যা রাধাকে সত্তার রূপানুরাগের ব্যাপারটিতেই বেশি জোর দিয়েছেন।—

কিন্তু জ্ঞানদাস তাঁর প্রেমময়ীরাধার অবস্থা ভেদের কারণ স্বরূপ কৃষ্ণের প্রতি রাধার রূপানুরাগের ব্যাপারটিতেই বেশি জোর দিয়েছেন।—

"একে সে মূরতি তার রসে নিরমিল গো
আর তাহে বয়স বিশেষ।
ও রূপ লাবণ্যলীলা হিলোলে পড়িয়া গো
পুন কে আসিবে নিজদেশ।"

সেই রূপদর্শনে রাধা উল্লসিত—

"দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে।।"

আর চণ্ডীদাসের রাধা নাম শোনামাত্রই সেই নামকে করেন সাধিকার জপমালিকা। সেই মালিকাকে কণ্ঠে ধারণ করে আত্মহারা রাধিকা 'বাহির দুয়ারে কপাট' লাগিয়ে 'ভিতর দুয়ার'-কে খুলে দিয়েছেন—আর সেই মুক্তদ্বার দিয়েই প্রস্তুত হয়েছে তাঁর ভাব-সাধনার পথ।

জ্ঞানদাসের রাধা রূপ মুগ্ধ হয়েই পথে নেমেছেন। সে-পথেরও শেষ নেই, এই অন্তহীন চলার শক্তি রাধা পেয়েছেন রূপের গভীরে ডুব দিয়ে—

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবি যে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।"

বিড়ম্বনা, প্রতিবন্ধকতা রাধার প্রেমের অনুভূতিকে গাঢ়তর গভীরতর করে তুলেছে। পূর্বরাগের রূপদর্শনের বিস্ময়ের ঘোর তাই অনুরাগে বেদনার উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়েছে। রাধার এই বেদনায় অপার্থিব প্রেমের লেশমাত্র নেই; আছে বাস্তব পৃথিবীর মাটির যোগ। যেমন—

"কাঁদিতে না পাই বঁধু কাঁদিতে না পাই।
নিশ্চয় মরিব তোমার চাঁদমুখ চাই।।
শাশুড়ী ননদী কথা সহিতে না পারি।"

জ্ঞানদাস রূপানুরাগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা।

অপরপক্ষে চণ্ডীদাসের রাধা যখন বলেন—

"কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিকো দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।।"

—এ রাধার সমাজ-শাসনকে লঙ্ঘন করা নয়, এ হল তাঁর লোক থেকে লোকাতীতের পথে যাত্রা।

জ্ঞানদাস, চণ্ডীদাস— উভয়েরই অভিসারের পদ মুষ্টিমেয়। কারণ চণ্ডীদাসের রাধা ভাবের গভীরে আত্মহারা, তাই বাহ্যিক অভিসারের পথ চলার কৃচ্ছ্রসাধনার বৈচিত্র্য মুখরতা চণ্ডীদাসের কাব্যে নেই বললেই চলে। তাছাড়া যে রাধা 'পুলকে আকুল দিক নেহারিতে সব শ্যামময়" দেখেন— জগৎ যাঁর কাছে শ্যামময় তাঁর মিলনপিয়াসী মনকে আর পৃথক কোনো নির্দিষ্ট মিলনকুঞ্জে নিয়ে তাগিদ অনুভব করেননি কবি তেমনভাবে।

জ্ঞানদাসের রাধা ও চণ্ডীদাসের রাধা ধ্যানময়ী, আপন উপলব্ধির গভীরে প্রবেশ করে আত্মহারা। অবস্থানগত দূরের সমস্যা তাঁদের কাছে ততখানি নয়। সমস্যা অন্যত্র। চণ্ডীদাসের ক্ষেত্রে—

"বন্ধুর লাগিয়া যোগিনী হইব
কুণ্ডল পরিব কানে।
সভার আগে বিদায় হইয়া
যাইব গহন বনে।।"

আর জ্ঞানদাসের ক্ষেত্রে রাধার সমস্যা—

"যতরূপ তত বেশ
ভাবিতে পঞ্জর শেষ।"

জ্ঞানদাস কেবল রূপসিদ্ধ নন, তিনি রূপবিদ্ধ কবিও বটে।

চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস উভয়েরই মিলনের পদ সামান্য, প্রায় নেই বললেও চলে। তবে উভয় কবির ক্ষেত্রে কারণ ভিন্ন। উভয় কবিই রসোদ্‌গারের পদ রচনা করেছেন— এ ক্ষেত্রে অনেকস্থলে উভয়ে অভিন্ন হয়ে অনেক সময় এক সংশয় সৃষ্টি করেছেন।

সুখকে চণ্ডীদাস দেখেছেন ক্ষণস্থায়ীরূপে। সেই ক্ষণস্থায়ী সুখের স্মৃতিমাখা অধ্যায় রসোদ্‌গারেই মিলনানন্দ চণ্ডীদাসের কাব্যে শিখরস্পর্শী হয়েছে। বেদনার অপার অতলান্ত মহাসাগরে ডুব দিয়ে কবি এমন এক রহস্যলোকে পৌঁছেছেন যে তাঁর পক্ষে মিলনমত্ত রাত্রির প্রাপ্তির পরমামহোৎসবকে প্রত্যক্ষে ছন্দায়িত করা সম্ভব নয়। কিন্তু মিলন-বিরহের আলোছায়ায় উদ্ভাসিত প্রেম— যে কথা কবি তাঁর সমগ্রী জীবনের সাধনায় উপলব্ধি করেছেন। তাই অনন্যোপায় কবি প্রত্যক্ষ মিলন বর্ণনার পথে না গিয়ে মিলন স্মৃতিকেই কাব্যোপজীব্য করলেন এবং আশ্চর্যের বিষয় এখানেও তিনি অনন্য। প্রেমের কবি চণ্ডীদাস এখানেই তাঁর মিলন গীতি রচনা করেছেন। রসোদ্‌গারে রাধা কণ্ঠের আনন্দ ঘনতায় চণ্ডীদাসের রসহর্ষ উচ্ছ্বলিত।—

"এক তনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই।।"

একদিকে এই মধুময় মন্থরতা, স্নেহময় প্রশান্তি, অপরদিকে মিলন প্রতীক্ষারত কৃষ্ণের জন্য রাধার নিবিড় গভীর উদ্বেগ উদ্বেলতা কী অপরূপ আর্তিতে প্রকাশিত—

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙিনার মাঝে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।।
সই, কি আর বলিব তোরে।
কোন পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলিল মোরে।।"

যে মিলনের জন্য মানুষ ব্যাকুল হয়, সেই মিলন-লগ্নটি রাধাকে করেছে ব্যাকুল। মিলনের চারপাশে এক গভীর ব্যঞ্জনার রেখা টেনে কবিকে তাই বলতে হয়েছে— "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া" এবং তাই কেবল "মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে" নয়, কবিকে আরো বলতে হয় "ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে।"

আবার এই রসোদ্গার পর্যায়ে জ্ঞানদাস দেখিয়েছেন জন্মান্তরীণ মিলন স্মৃতিকে—

"শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে-পরাণে নেহা।"

অথচ বেদনা হল—

"না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি দেহা।।"

এই ভিন্নতা না থাকলে জ্ঞানদাসের রূপের পূজারিণী রাধা যে দুচোখ ভরে রূপদর্শন করতে পারে না। বিচ্ছেদের বেদনা জ্ঞানদাসের পদেও আছে। কিন্তু জ্ঞানদাসে চণ্ডীদাসের মতো 'হৃদয়ের একুল ও কূল দুকূল ভেসে' যাবার মতো আবেগ নেই, সবক্ষেত্রেই তাঁর অপূর্ব আত্মসংযম। এই সংযমই তাঁর রাধাকে বিরহের বুকফাটা ক্রন্দনে আর্ত করে তোলে না। তাঁর বেদনা অন্তরের অন্তঃস্থলে ফল্গুর মতো নিঃশব্দে বয়ে যায়—

"দিবস গণিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি।।"

এই জনম জনম আশা পথ চেয়ে থাকা রাধা দীর্ঘ বিরহের অবসানে মিলনকালেও আশ্চর্য শান্ত সংযম দেখিয়েছেন গভীর ব্যাকুলতায়—

"বাহু পসারিয়া ধনি বঁধু নিল কোরে।
অনিমিখ লোচনে বদন নেহারে।।"

এরপরই মিলনধন্যা রাধা জ্ঞানদাসের ধর্মদর্শনের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন—

"তোমায় আমায় একই পরাণ
ভাল সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া
কিরূপে আছিলা তুমি।।"

শেষ পর্যন্ত জ্ঞানদাসকেও চণ্ডীদাসের মতো বলতে হয়েছে—

"জ্ঞানদাস কহে এমন পিরীতি
আর কি জগতে আছে।"

এই আধ্যাত্মিকতার দ্বারা জ্ঞানদাসের রোমান্টিকতা এক অপরূপ সমাপ্তি লাভ করেছে।

বিরহের ক্ষেত্রে চণ্ডীদাস শুদ্ধতম বেদনায়, অতিসত্ব অনুভূতিতে গভীরের গানে গানে বাজিয়ে তুলেছেন তাঁর পদাবলির অশ্রুর মন্দাকিনীকে। সেক্ষেত্রে জ্ঞানদাস বিরহে ম্লানশক্তি।

জ্ঞানদাস নায়িকা অপেক্ষা নায়কের রূপ বর্ণনাকে প্রাধান্য দেন— এক্ষেত্রে তিনি অনেকটা স্বাধীন। আর চণ্ডীদাসের ক্ষেত্রে নায়িকার রূপ বর্ণনা উপলক্ষ মাত্র— নায়িকার আত্মহারা ভাবতন্ময়তা, কৃষ্ণনাম জপে অভিনিবিষ্টতার আত্মিক দিকটিই সুপরিস্ফুট। ভাববৈচিত্র্যে জ্ঞানদাসও অনুভূতির গভীরতায় চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ। চণ্ডীদাস অনুভূতিকে লৌকিক ভাবের আধারে রেখে কাব্যকে মিষ্টিক আবহ দান করেন আর জ্ঞানদাস অনুভূতিকে রোমান্টিকতার বাতাবরণে লৌকিক জীবনরসে অভিব্যঞ্জিত করেন। চণ্ডীদাস ভাবুক ও সাধক, জ্ঞানদাস শিল্পী ও রূপসৌন্দর্য স্রষ্টা। চণ্ডীদাস তদ্‌গত, জ্ঞানদাস আত্মগত। চণ্ডীদাস সম্পূর্ণরূপে রাধাকৃষ্ণের ভাবে আত্মসমর্পিত হন, জ্ঞানদাস নিজেকে বিসর্জন না দিয়ে মঞ্জরীভাবে রাধা-কৃষ্ণ লীলা-রস আস্বাদন করেন। চণ্ডীদাস মানব হৃদয়কে মানবিক রেখে আধ্যাত্মিকতা আনেন, আর জ্ঞানদাস মানবিক অনুভূতিকে সৌন্দর্যে ও মিষ্টিকতায় ভরে দেন। চণ্ডীদাসের রাধা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ প্রেমে ব্যাকুল ও বিষাদখিন্ন, আর জ্ঞানদাসের রাধা কখনো আনন্দময়ী কখনো বেদনাবতী। চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণরূপ মুগ্ধ হয়েও একান্ত ভাবতন্ময়। কিন্তু জ্ঞানদাসের রাধা কৃষ্ণভাবময়ী হয়েও প্রধানত রূপসৌন্দর্যে বিভোর। চণ্ডীদাসের রাধা মহাভাবময়ী সাধিকা, জ্ঞানদাসের রাধা রূপজ নায়িকা। চণ্ডীদাস তত্ত্বসন্ধানী বলে আবেগের গভীরতায় ডুব দিয়েছেন, আর জ্ঞানদাস তত্ত্বজ্ঞানী বলে আবেগকে যথাসাধ্য মননশীলতার দ্বারা পরিশীলিত করেছেন। চণ্ডীদাস রূপসাগরে ডুব দিয়েছেন অরূপরতনের আশায় আর জ্ঞানদাস রূপজগতের সঙ্গে অরূপের সেতুবন্ধ রচনায় প্রয়াসী। চণ্ডীদাস শিল্পসৃষ্টিতে উদাসীন, সহজ ভাষায় গভীর ভাবের ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে অতুলনীয় কিন্তু জ্ঞানদাস রূপনির্মিতিতে অধিকতর শিল্পপ্রয়াসের পরিচয় দিয়েছেন। ছন্দ, অলঙ্কার ও চিত্রসৃষ্টিতে তিনি উচ্চতর শিল্পী।

মানসলোকের এই দুস্তর পারাবার-সম পার্থক্যকে লঙ্ঘন করেও উভয় কবির মধ্যে আশ্চর্য এক ভাবসম্মিলন ঘটেছে। তার কারণ—

উভয়েই বাঙালি কবি। ভাবে ভাষায় প্রকাশরীতিতে উভয়ের নিকট সাদৃশ্য। প্রেমের আত্মনিবেদনে উভয়েই মানবজীবনের সীমা ছাড়িয়ে ভাবাদর্শের ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করেন। উভয়েই প্রেমের কবি, দুঃখের কবি, সহজ ভাষার সহজভাবের কবি। কলাকৌশলের ক্ষেত্রে দুজনেরই অবলম্বন সহজ সরল অনাড়ম্বর বাক্‌রীতি। উভয়েই ভাব তন্ময় কবি। রাধার হৃদয় যন্ত্রণা উভয়ের ক্ষেত্রেই আপন চিত্তবিদারক হয়ে উঠেছে, উভয়েই রাধার সঙ্গে কল্পনায় একাত্ম হয়ে যান। লিরিক গীতিমূর্চ্ছনা, অনুভূতির প্রগাঢ়তা ভাবের গভীরতায় উভয়ের মধ্যেই নিবিড় একাত্মতা রয়েছে। তবে জ্ঞানদাস যেহেতু চণ্ডীদাসের উত্তর সাধক তাই জ্ঞানদাসকেই চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা যায়।

১.৭ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

এই বিভাগে বিদ্যপতির জীবন ও সাহিত্য আলোচনা করে আমরা জানতে পারলাম যে পদাবলি সাহিত্যে বিদ্যাপতির পদ এক অভিনব সংযোজন, অন্যান্য পদকর্তাদের সঙ্গে তুলনা করেই আমরা বলতে পারি একথা।

প্রথমত : তিনি-এ বাংলারই আত্মজ নন। তবুও নিজের ভাষাকেই ভাবের আবেশে এমন এক সুদূর-প্রসারী বিস্তৃতি দিয়েছেন যার ফলে মৈথিলি ভাষায় লিখিত হয়েও তাঁর রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক পদ পদাবলি সাহিত্যে বাংলা পদের প্রায় সমগোত্রের স্থান পেয়েছে এবং জনমানসেও তাঁর পদ সমধিক আদৃত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : চৈতন্য-পূর্ব যুগের কবি বিদ্যাপতি। তাঁর রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক পদ রচনার উৎসভূমি শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির 'বিকশিত ভাব-কদম্ব' রূপ নয়— বরং হয়তো বা প্রণয় মূলত প্রচলিত কিছু প্রকীর্ণ লৌকিক পদ যাতে অধ্যাত্মসাধনার ছিটে ফোঁটাও নেই; আর বিদ্যাপতির সামনে হয়তো ছিল জয়দেবের 'মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলি'। অথচ কাব্য রচনা করতে গিয়ে এর এত গভীরে তিনি প্রবেশ করেছেন যে তাঁর কাব্য লৌকিক কামনার স্তর পার হয়ে অধ্যাত্মলোকের প্রেমরূপী ভূমানন্দের আস্বাদ এনে দিয়েছে। তাই স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবও তাঁকে অস্বীকার করতে পারেননি।

তৃতীয়ত : বিদ্যাপতি পণ্ডিত এবং অভিজাত বংশের সন্তান। তাঁর নিজের জীবনও কেটেছে রাজসভাকবি হয়ে চরম আভিজাত্যের মধ্যে। ফলে তাঁর জীবন-রসের নির্যাস হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, তাঁর কাব্যে যে বিলাস-কলাকুতূহল, যে নাগর বৈদগ্ধ্য, যে মণ্ডনকলার সন্ধান আমরা পাই তা তাঁর কাব্যকে খণ্ডিত করেনি বৈষ্ণব পদাবলি হিসেবে; বরং তাঁর সৌন্দর্যচর্চা, তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কবি হিসেবে তাঁকে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে।

চতুর্থত : পঞ্চোপাসক বিদ্যাপতি বিনয়ী বৈষ্ণব ভক্ত সাধক নন। কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি কোনো প্রাদেশিকতার বা সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীতে আবদ্ধ নন। কিন্তু পদাবলি রচনার ক্ষেত্রে এটি তাঁর নঞর্থক দিক না হয়ে সদর্থক দিকেই অঙ্গুলি সঙ্কেত করে। তাঁর উদার প্রশস্ত চিত্তে যখন যে ভাব লালিত হয়েছে তাকেই তিনি সরল মুক্তমনে কাব্যে রূপ দিয়েছেন। তাই তাঁর কাব্যে আমরা দুটি স্তর লক্ষ্য করি। প্রথম স্তরে তাঁর বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, অলঙ্কারপ্রিয়তা, আভিজাত্য, ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রাধান্য আদি সহকারে রচিত পদসমূহ রাজসভাকবিরই যোগ্য হাতের রচনা, কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের কাব্যাস্বাদকালে আমরা অবাক না হয়ে পারি না। কারণ যে-কবি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী নন, যিনি শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদের পূর্বেই এ পদসমূহ রচনা করেছেন— এত প্রেমভক্তি, এত গভীরতা, এত আবেগ বিহ্বলতা তিনি পেলেন কোথা থেকে। এ-প্রসঙ্গে বলতে পারি, 'বৈষ্ণব কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে বৈষ্ণব কবিকে প্রশ্ন করেছিলেন—

"রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ,
কার আঁখি হতে"

বিদ্যাপতির পদ পাঠ করে এর উত্তর বৈষ্ণব কবির পক্ষ হয়ে আমরাই দিতে পারি, যে এ চুরির উৎস কেবল কবির মন। তা না হলে বিদ্যাপতিতে এই গভীরতা অসম্ভব।

যাই হোক, উপসংহারে আমরা বলতে পারি, যিনি কাব্যে রীতি-বিলাসের চূড়ান্ত প্রমাণ রেখেছেন, বাগ্ বৈদগ্ধ্যে যিনি অতুলনীয়, রূপ ও রসের মিলনোল্লাসে যাঁর কাব্য কৃতিত্বের চূড়ান্ত সীমায়, সেই মহান কবি বিদ্যাপতি কেবল তাঁর যুগেরই শ্রেষ্ঠ কবি নন, বৈষ্ণব পদাবলির যুগ-যুগান্তের অন্যতম মহান কবি তিনি।

চণ্ডীদাসের জীবন ও সাহিত্য আলোচনা করে যা দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"বড়ো কঠিন সাধনা যার
বড়ো সহজ সুর।"

চণ্ডীদাস তেমনই বিরাট শক্তিশালী কবি, যিনি অতি সহজ ভাষায় অতি গভীর কথাকেই শোনান। মানব জীবনের ভোগাচারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হল কাম। এই কামের রক্তিমাভায় প্রেমও কখনো হয়ে ওঠে কলুষিত। তার পথে পথে ছড়ানো স্খলন-পতন। চর্যার সিদ্ধাচার্যরাও বারবার সাধনার ক্ষেত্রে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন—

"ডাহিন বাম মা হোহী।"

আর ভারতীয় সাধনার ধারায় একমাত্র বৈষ্ণবের পক্ষেই বলা সম্ভব হয়েছে—

"কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে প্রেমনাম।"

এই প্রেমের এমনই গুণ যে, তা দেবতাকে প্রিয় করে, প্রিয়কে করে তোলে দেবতা— ঐহিক কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে এই প্রেমের শক্তিই দেহকে দেবালয়ের প্রদীপ করে তুলে বলতে পেরেছে—

"যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা।"

সহজিয়া চণ্ডীদাস সহজ ভাষাতেই এই কঠিনতম কাজটিকে করে গেছেন। সহজিয়া সাধক, বাশুলি দেবীর সেবক, রামীর পরাণ-প্রিয় চণ্ডীদাস যখন বলেন—

"আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক সে।"
"কানুর পীরিতি চন্দনের রীতি ঘসিতে সৌরভময়।"
"জলবিনে মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কবহু না দেখিয়ে।।"

—তখন আমরা অনুভব করি এই সহজ সরল ভাষার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের নিবিড়তম যোগ রয়েছে, কিন্তু এই সাধারণ কথাগুলিই এক অপূর্ব ভাবরস সমৃদ্ধ হয়ে পাঠকের অন্তরলোকে অনন্তের অপূর্ব বাণীকে বাজিয়ে দিয়ে গেছে। তাঁর ভাষা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়- "ছেড়েছে তার সকল অলঙ্কার।" তাঁর কাব্যে বাক্‌চাতুর্য, অলঙ্কার ও চিত্র প্রয়োগের আয়াস নেই; অথচ অনায়াস ভাবগভীর অনুভূতির পরিপূর্ণতায় তা স্বয়ং সম্পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের মতে— "কঠোর ব্রত সাধনা-স্বরূপ প্রেম সাধনা করা চণ্ডীদাসের ভাব।" সেই প্রেমের পদাবলি রচনায় চণ্ডীদাস সর্বকালের লোককান্ত কবি। জীবনপাত্র-উচ্ছলিত দুঃখের বেদনায় অশ্রুসিক্ত তাঁর পদাবলিতে স্বর্গের অমৃতমাধুরী উছলে পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, চণ্ডীদাসের কবিতা "সায়াহ্ন সমীরণের দীর্ঘশ্বাস।" বেদনা ও ব্যাকুলতা তাঁর পদের মূল সুর বলে তার সার্বজনীন আবেদন রয়েছে। তাই তাঁর সহজ সুরে মানুষের অন্তরাত্মা

সহজেই জেগে ওঠে। চণ্ডীদাস তাই বিরহের, বৈরাগ্যের কবি হয়ে পদাবলি সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছেন।

চণ্ডীদাসের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্পের বিখ্যাত সমালোচকের উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ সমাপ্ত করি—

"বৈষ্ণব পদকারদের মধ্যে একমাত্র চণ্ডীদাসই মিস্টিক। রাগাত্মিকতার সঙ্গে মিস্টিসজমের গভীর সম্পর্ক; চণ্ডীদাস রাগাত্মিকতার ভাবুক ও সাধক। তিনি মৌনের মহান সঙ্গীতকার। তিনি এত বলিয়াছেন, তবু যেন কিছুই বলেন নাই। তিনি নৈঃশব্দ্যের মহাকবি। শব্দ লইয়া কাব্য। সে শব্দ প্রাণধ্বনিকে উন্মুক্ত করে। প্রগল্ভ চঞ্চলতা, সহর্ষ উচ্ছ্বাস, উদ্দীপ্ত উল্লাস, সমুদ্র বিস্তার ব্যাপ্তি, নীরব সায়রে গাহন— প্রাণের কত 'রূপ'ই আছে! চণ্ডীদাসের রাধা অপরপক্ষে জীবনের ঐকান্তিক অপস্মৃতিকে গ্রহণ করিয়াছিল। প্রাপ্তির উৎসব রাত্রে মাতোয়ারা লোককন্ঠের কোলাহল-এ রাধা পাইল না। 'কূলে কূলে স্তব্ধ নিটোল গভীর ঘন কালো' একটি অশ্রুময় চির বিশ্রাম— তাহার জন্য। সেখানে কেহ নাই, সখীরা পর্যন্ত নয়— নৈঃশব্দ্যের পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে চেতনার স্বর্ণরেখার মতো একটি রূপকে— রাধিকাকে— দূর হইতে দেখার সৌভাগ্য— সে আমাদের যুগযুগের সৌভাগ্য।

সেই রাধার পাশে রাধা-কবি। বেদনার কালীদহে সিত পদ্মের মতো এই কবি। চণ্ডীদাস কবি-তাপস। এত অনাবরণ অনির্বাণ আত্মবান কবি আর কে! প্রেম যে দ্রবীভূত হৃদয়, কান্না যে বিগলিত নয়ন এবং হাসি যে ছলোছলো আত্মা— চণ্ডীদাসই তাহা জানাইয়াছেন। যত মৃদুকণ্ঠে করা হোক না কেন, 'তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত স্তোত্র বা বন্দনাই কর্কশ ও শব্দমুখর মনে হয়।' তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধে বলিতে তাই ভয় জাগে। এক শান্ত, সুস্থির, শিশিরবিন্দুর সুকুমারতায় স্নিগ্ধ পদকার আর কেউ আছেন কি না সন্দেহ। চণ্ডীদাসের পদে করুণ মরণের সন্ধ্যাছায়ায় অমর প্রেমের দীপশিখা।"

গোবিন্দদাসের জীবন ও সাহিত্য আলোচনা করে দেখা গেল তিনি উচ্চস্তরের ভক্ত কবি। তথাপি তাঁর রচনাও সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ নয়। তাঁর যতখানি কৃতিত্ব সেই তুলনায় অবশ্য তাঁর ব্যর্থতা সামান্য। যেখানে তাঁর প্রতিভা অস্বচ্ছন্দ সেই পর্যায়েও তিনি রচনা করেছেন।

বলা চলে প্রেমবৈচিত্ত্যের পদগুলিতে গোবিন্দদাস শ্রীরূপগোস্বামীর রসশাস্ত্রের বাধ্য অনুসারী। শ্রীরূপ গোস্বামী নির্দেশিত প্রেমবৈচিত্ত্যের লক্ষণ গুলিকে তিনি কেবল কাব্যাকারে ফুটিয়ে তুলেছেন।

গোবিন্দদাস বিরহের কবি না হলেও যেহেতু বিরহই রাধা প্রেমের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তাই কিছু বিরহ পদ তিনি রচনা করেছেন। তাঁর পদে বিরহ স্পষ্ট।

গোবিন্দদাস বিরহের পদে অসফল বটে, তবে সর্বত্র নয়। যেমন কৃষ্ণ বিরহিত বৃন্দাবনের রূপাঙ্কণে চিত্রের সাহায্যে যে পটভূমিকা তিনি তৈরি করেছেন, তা অসামান্য রসরূপ ধারণ করেছে।

"সখাগণে ধেনু বেণু সব বিছুরল
বিছুরল যমুনা-কিনার।।

সারী শুক মূক   কপোত না ফুকরত
কোকিল না পঞ্চম গান।
কুসুম ত্যেজি অলি   ভূমিতলে লুঠই
তরুগণ মলিন সমান।।"

গোবিন্দদাসের প্রতিভার তিনটি দিক রয়েছে— (১) তাঁর চলিষ্ণুতা, (২) তাঁর আকার সৌষ্ঠব ও ক্লাসিকেল রীতি গাম্ভীর্য, (৩) তাঁর বৈদগ্ধ্য। রাধার বিরহ পর্যায়ে, অন্তত পদাবলি-সুলভ যে করুণ রূপ আমরা পাই তাতে এই তিনটি দিকের অবকাশ খানিকটা কম বলেই হয়তো রাধার বিরহ পর্যায়ে কবির এই ব্যর্থতা।

কবি অলঙ্কার নিপুণ, কিন্তু রাধার বিরহবেদনা প্রকাশের ক্ষেত্রে কবি যে নিপুণ অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন তা উপযুক্ত ভাবপ্রকাশকে ব্যহত করেছে।

গোবিন্দদাস মধ্যযুগীয় রীতিতে বারমাস্যা বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতির বর্ণনা সেখানে অপরূপ হলেও ভাব গতানুগতিক।

যাই-হোক, তবু গোবিন্দদাস চৈতন্য-পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালি পদাবলি-কর্তা। সঙ্গীত-সৌন্দর্যে, অলঙ্কার-প্রকরণে, ছন্দোশিল্পে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি আরাধনার কবি। তিনি ভক্ত বৈষ্ণব কবি।

জ্ঞানদাসের জীবন ও সাহিত্য আলোচনা করে দেখা গেল প্রেম বেদনার সরল ও মধুময় লিরিক মূর্চ্ছনা জ্ঞানদাসের কবিতাকে কালজয়ী মহিমার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর ভাব ও ভাষা, চিত্র প্রতীক ও আবেগ সরস জীবনরস মর্ত্যচেতনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। চৈতন্যোত্তর যুগের ভক্ত বৈষ্ণব হয়েও কাব্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি কোনো সাম্প্রদায়িক সংস্কারের দাসত্ব করেননি— একমাত্র দাসত্ব করেছেন তাঁর নিজস্ব কবি প্রতিভার। সেই প্রতিভার প্রতিফলন যেখানেই ঘটেছে সেখানেই তিনি আপন অন্তরের আলোকে নয়ন ধৌত করে দেখেছেন অসীম রূপরাশিকে। তাঁর উল্লাস, তাঁর বিভোরতা, মুগ্ধতা, চিরন্তন অতৃপ্তি, অসমাপ্তির ব্যঞ্জনা— সব কিছু মিলিয়েই জ্ঞানদাস চিরকাল রসিক পাঠকের চিত্তহারক কবি।

১.৮ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

(লক্ষণীয় প্রসঙ্গগুলি দ্রষ্টব্য।)

১.৯ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

সম্ভাব্য প্রশ্নবলিতে দুই ধরনের প্রশ্ন রয়েছে— প্রথমত, বড় প্রশ্নাবলি। দ্বিতীয়ত , ছোট প্রশ্নাবলি।

১.৯.১ বড় প্রশ্নাবলি

(১) বিদ্যাপতির পদাবলি অবলম্বনে বিদ্যাপতির কবিচিত্তের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(২) বিদ্যাপতি মিলন ও বিরহ— দুই পর্যায়েই কাব্যোৎকর্ষ দেখিয়েছেন। —একই কবির পক্ষে দুই বিপরীত ভাবের পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা কীভাবে সম্ভব হয়েছে, কারণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(৩) বিদ্যাপতি মূলক পঞ্চোপাসক স্মার্ত পণ্ডিত; তাই তাঁর রচনায় বিশুদ্ধ ভক্তিরসের প্রাধান্য দেখা যায় না। —বিদ্যাপতি রচিত পদাবলি সাহিত্য অবলম্বনে এই অভিমত কতখানি গ্রহণযোগ্য দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন।

(৪) শৃঙ্গার-বিষয়ক রচনায় বিদ্যাপতি চিরাচরিত রীতিকে যেমন মেনেছেন, আবার তেমনি কবি তাকে অতিক্রমও করেছেন; এখানেই বিদ্যাপতির মৌলিকতা— পঠিত পদাবলির সাহায্যে এই অভিমতের যৌক্তিকতা বিচার করুন।

(৫) বিদ্যাপতির কাব্য সাধনার দুটি স্তর— পঠিত পদাবলি অবলম্বনে বিদ্যাপতির পদের দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচনা করুন।

(৬) বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে বয়ঃসন্ধি পদে বিদ্যাপতি অদ্বিতীয়। —পঠিত পদাবলি অবলম্বনে আলোচনা করুন।

(৭) বয়ঃসন্ধি পর্যায়ে বিদ্যাপতি আলঙ্কারিক প্রেরণা গ্রহণ করেও প্রেম মনঃস্তত্ত্বের সুনিপুণ কথাকার হয়ে উঠেছেন। —পঠিত পদাবলি অবলম্বনে দৃষ্টান্ত-সহ বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি পর্যায় আলোচনা করুন।

(৮) বয়ঃসন্ধি পর্যায়ে বিদ্যাপতি একাধারে দেহ ও অলঙ্কারের, যৌবনের ও সৌন্দর্যের সুনিপুণ রূপকার এবং প্রেম-মনস্তত্ত্বের সুদক্ষ সন্ধানী— বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি পদ অবলম্বনে উক্তিটির যাথার্থ্য প্রমাণ করুন।

(৯) মাথুর পর্যায়ে বিদ্যাপতি মহাজন পদকর্তা— আলোচনা করুন।

(১০) সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলিতে বিদ্যাপতির তুল্য মাথুর-বিরহের কবি নেই— বৈষ্ণব পদাবলির পদ-অবলম্বনে আলোচনা করুন।

(১১) বিদ্যাপতি কেবল দেহ চেতনার সুদক্ষ-রূপকার নন, তিনি মনস্তত্ত্বেরও গভীর বিশ্লেষক-- বৈষ্ণব পদাবলির বিভিন্ন পর্যায় থেকে বিদ্যাপতির পদ-অবলম্বনে উক্তিটির যাথার্থ্য প্রমাণ করুন।

(১২) বিদ্যাপতি কেবল দেহ চেতনার সুদক্ষ-রূপকার নন, তিনি মনস্তত্ত্বেরও গভীর বিশ্লেষক— বৈষ্ণব পদাবলির বিভিন্ন পর্যায় থেকে বিদ্যাপতির পদ-অবলম্বনে উক্তিটির যাথার্থ্য প্রমাণ করুন।

(১৩) পদাবলি সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণ লীলার পদ রচনায় বিদ্যাপতি রাজসভার কবি, কিন্তু 'প্রার্থনা' বিষয়ক পদে বিদ্যাপতি ভক্তিব্যাকুল আধ্যাত্মিক কবি। —আলোচনা করুন।

(১৪) 'ভাবোল্লাস' পর্যায়ে বিদ্যাপতি শ্রেষ্ঠ কবি। —আলোচনা করুন।

(১৫) মিলনের সঙ্গে ভাবোল্লাস বা ভাবসম্মিলনের পার্থক্য কোথায়, বিদ্যাপতির পদাবলির থেকে উদাহরণ দিয়ে বিশ্লেষণ করুন।

(১৬) পদাবলি সাহিত্যে 'প্রার্থনা' বিদ্যাপতির এক অভিনব সংযোজন— আলোচন করুন।

(১৭) বিদ্যাপতির 'প্রার্থনা' পদে তাঁর ব্যক্তিজীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। —উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করুন।

(১৮) বিদ্যাপতি মানবিক প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি হিসেবেই শ্রেষ্ঠ, তবে তাঁর মধ্যে যথেষ্ট আধ্যাত্মিকতাও রয়েছে। —উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(১৯) আলঙ্কারিক কবি হিসাবে বিদ্যাপতি শ্রেষ্ঠ। —উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করুন।

(২০) বিদ্যাপতির বিরহ-পদে তীব্র দেহচেতনা আছে, আবার তা অতীন্দ্রিয় ব্যাকুলতায় পরিণতি লাভ করেছে— বিদ্যাপতির বিরহ পর্যায় অবলম্বনে আলোচনা করুন।

(২১) বিদ্যাপতি ভোগৈশ্বর্যের কবি, কিন্তু ভোগবদ্ধ কবি নন। —বিদ্যাপতির পদাবলি অবলম্বনে আলোচনা করুন।

(২২) চণ্ডীদাসের পদাবলিতে আধ্যাত্মিকতা রয়েছে। —চণ্ডীদাসের পদ-অবলম্বনে আলোচনা করুন।

(২৩) পূর্বরাগ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস। —চণ্ডীদাসের পদ-অবলম্বনে পূর্বরাগ পর্যায়ে তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(২৪) আপেক্ষানুরাগের কবি চণ্ডীদাস— উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করুন।

(২৫) 'প্রেম বৈচিত্ত্য' কথাটির অর্থ কী? চণ্ডীদাসের পদাবলিতে 'প্রেম-বৈচিত্ত্য' এক অভিনব সংযোজন, —আলোচনা করুন।

(২৬) চণ্ডীদাস করুণ এবং মধুর — চণ্ডীদাসের পদ-অবলম্বনে উদ্ধৃতিটি ব্যাখ্যা করুন।

(২৭) চণ্ডীদাস যথার্থই লিরিক কবি। — এই মন্তব্যের আলোকে চণ্ডীদাসের পদাবলির আলোচনা করুন।

(২৮) চণ্ডীদাসকে কবি বললে যথেষ্ট বলা হয় না, তিনি কবিতাপস। — উদাহরণসহ এই মন্তব্যের সার্থকতা আলোচনা করুন।

(২৯) আক্ষেপানুরাগের পদে চণ্ডীদাসের কবিসত্তা সর্বাধিক আত্মপ্রকাশ করেছে— আলোচনা করুন।

(৩০) চণ্ডীদাস সহজতম ভাষায় গভীরতম ভাবটি প্রকাশ করেছেন। — উদ্ধৃতিসহ ব্যাখ্যা করুন।

(৩১) চণ্ডীদাসের কাব্যের প্রেমদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

(৩২) চণ্ডীদাসের কাব্যের সকল পর্যায়ই বিরহভাবে পূর্ণ— তাই তাঁকে সর্বাত্মক বিরহচেতনার কবি বলা হয়— আলোচনা করুন।

(৩৩) চণ্ডীদাস সহজ এবং গভীর— চণ্ডীদাসের পদ-অবলম্বনে মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার করুন।

(৩৪) চণ্ডীদাসের কাব্যে তাঁর ব্যক্তিজীবন এবং সমাজ-জীবনের অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে। —আলোচনা করুন।

(৩৫) চণ্ডীদাসের পদে আছে এক করুণ প্রশান্তি, স্নিগ্ধতা ও আত্মনিবেদনের ভাব— আলোচনা করুন।

(৩৬) বিরহের পদ চণ্ডীদাসে রয়েছে, কিন্তু তাঁর সমগ্র পদাবলি বিরহের সুরে মূর্ছিত। — পদাবলি থেকে উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করুন।

(৩৭) মিলনে নয়, রসোদ্‌গারেই মিলনানন্দ চণ্ডীদাসের কাব্যে শিখরস্পর্শী। — চণ্ডীদাসের পদাবলি-অবলম্বনে উদ্ধৃতিটি ব্যাখ্যা করুন।

(৩৮) পূর্বরাগ পর্যায়ে চণ্ডীদাসের রাধা যৌবনেই যোগিনী— উদাহরণসহ এই উক্তির যাথার্থ বিশ্লেষণ করুন।

(৩৯) চণ্ডীদাসের পদে আত্মার কথাই বেশি, কিন্তু কবি কোনো সময়ই দেহবাস্তবকে বিস্মৃত হননি। —আলোচনা করুন।

(৪০) সরলতাই চণ্ডীদাসের ঐশ্বর্য। —আলোচনা করুন।

(৪১) চণ্ডীদাসের সর্বস্ব আক্ষেপানুরাগ এবং আক্ষেপানুরাগের সর্বস্ব চণ্ডীদাস। — উদ্ধৃতিটির যাথার্থ্য বিচার করুন।

(৪২) চণ্ডীদাসের রাধা মহাভাবময়ী— আলোচনা করুন।

(৪৩) চণ্ডীদাসের পদাবলিতে আক্ষেপানুরাগের নানারূপ আছে— সেগুলো উল্লেখ করে এই রসপর্যায়ে তাঁর কাব্যসাফল্য সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

(৪৪) গোবিন্দদাসকে চৈতন্যোত্তর কালের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা ও কবি মনে করার কারণ কী?

(৪৫) গোবিন্দদাসকে বৈষ্ণব ভাব ও রসের প্রতিনিধি কবি বলার কারণ কী— আলোচনা করুন।

(৪৬) গোবিন্দদাস সূক্ষ্ম ধ্বনিসৌন্দর্যের ও ছন্দশিল্পের কবি— উদ্ধৃতি-সহযোগে আলোচনা করুন।

(৪৭) রূপলোক নির্মাণের ক্ষেত্রে গোবিন্দদাস বৈষ্ণবকাব্যে অতুলনীয় কবিরূপে স্বীকৃত। —উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করুন।

(৪৮) গৌরাঙ্গবিষয়ক পদে গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

(৪৯) অভিসার পর্যায়ে গোবিন্দদাস অসমান্য প্রতিভার অধিকারী— আলোচনা করুন।

(৫০) বৈষ্ণব তত্ত্বকে কাব্যরূপদানে গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

(৫১) গোবিন্দদাস বৈষ্ণব তত্ত্বের অনুশাসনকে মানলেও তাঁর অভিসার পদের ব্যাখ্যায় আমরা তাঁর রোমান্টিক মনেরও পরিচয় পাই। —প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আলোচনা করুন।

(৫২) রূপ ও রসের অসামান্য মিলনে গোবিন্দদাসের পদ পরম আস্বাদ্যতা লাভ করেছে। —গোবিন্দদাসের বৈষ্ণব পদাবলি-অবলম্বনে আলোচনা করুন।

(৫৩) ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহারে গোবিন্দদাসের বৈশিষ্ট্য ও সাফল্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৫৪) গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলা হয় কেন? তিনি বিদ্যাপতিকে কতটুকু অনুসরণ করেছেন, এবং তাঁর স্বকীয়তা কতখানি— এ-সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করুন।

(৫৫) "গোবিন্দদাস দ্বিতীয় বিদ্যাপতি"— আলোচনা করুন।

(৫৬) বিরহের পদে গোবিন্দদাস যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। —এই মত আপনি সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেন কি? আপনার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে আলোচনা করুন।

(৫৭) শব্দঝঙ্কার, চিত্ররীতি, অলঙ্কারনৈপুণ্য, ছন্দের কারুকার্যের দিক দিয়ে গোবিন্দদাস চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। —আলোচনা করুন।

(৫৮) চৈতন্য-পূর্ব এবং চৈতন্যোত্তর পদাবলি সাহিত্যের ভাবাদর্শগত পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করে প্রসঙ্গক্রমে এই দুই যুগের প্রসিদ্ধ পদকর্তাদের রচনার উল্লেখ করুন।

(৫৯) গোবিন্দদাস একাধারে ভক্তবৈষ্ণব, কবি এবং শিল্পী। —গোবিন্দদাসের পদাবলি আলোচনা-প্রসঙ্গে উল্লিখিত উক্তির যাথার্থ্য বিচার করুন।

(৬০) "বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব তত্ত্বের রস ভাষ্য"— গোবিন্দদাসের পদাবলি আলোচনা প্রসঙ্গে এই মন্তব্য কতদূর গ্রহণযোগ্য তা বিচার করুন।

(৬১) গোবিন্দদাসের চৈতন্য-বিষয়ক পদে একদিকে যেমন আছে জীবনের তথ্য; অন্যদিকে তেমনি রয়েছে রসের তত্ত্ব। —একথা কতদূর স্বীকার্য, গোবিন্দদাসের পদ-অবলম্বনে আলোচনা করুন।

(৬২) রূপানুরাগের পর্যায়ে গোবিন্দদাসের অসমান্য সাফল্যের স্বরূপ দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন।

(৬৩) গোবিন্দদাসের কাব্যে গতি, চিত্রময়তা ও নটকীয়তা প্রধান— অভিসারের পদ অবলম্বনে গোবিন্দদাসের এই বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৬৪) জ্ঞানদাস কেবল কবি নন, চৈতন্যপরবর্তী ভক্ত বৈষ্ণব সাধক— জ্ঞানদাসের পদাবলি-অবলম্বনে আলোচনা করুন।

(৬৫) জ্ঞানদাস বৈষ্ণবভক্ত সাধক হলেও খাঁটি কবি প্রতিভার অধিকারী। — জ্ঞানদাসের পদাবলি-অবলম্বনে আলোচনা করুন।

(৬৬) রূপানুরাগের পদে জ্ঞানদাস অদ্বিতীয়— আলোচনা করুন।

(৬৭) জ্ঞানদাসের রাধা কবির অন্তর-সত্তারই প্রতিফলন— জ্ঞানদাসের পদাবলি-অবলম্বনে আলোচনা করুন।

(৬৮) জ্ঞানদাসের রাধা ধ্যানময়ী— আলোচনা করুন।

(৬৯) একদিকে রূপতন্ময় বালিকার ভাব ব্যাকুলতা, অপরদিকে পরিণত প্রেমের কাছে নিঃশেষে আত্মনিবেদন— এই দুয়ের যুগ্ম-বন্ধনেই জ্ঞানদাসের রাধা গড়ে উঠেছেন, — জ্ঞানদাসের পদাবলি-অবলম্বনে আলোচনা করুন।

(৭০) জ্ঞানদাস রূপদক্ষ শিল্পী— জ্ঞানদাসের পদাবলি আলোচনা-প্রসঙ্গে এই উক্তির সার্থকতা প্রমাণ করুন।

(৭১) একদিকে রূপানুরাগ, অপরদিকে আক্ষেপানুরাগ জ্ঞানদাসের পদগুলিকে বেদনা-মধুর করে তুলেছে— আলোচনা করুন।

(৭২) জ্ঞানদাস রোমান্টিক লিরিক কবি— পদাবলি-অবলম্বনে আলোচনা করুন।

(৭৩) জ্ঞানদাসের কাব্য লাবণ্যময়— আলোচনা করুন।

(৭৪) জ্ঞানদাসের কাব্যের মধ্যে আছে ধ্বনি— তাঁর পদাবলি সাহিত্যে এই ধ্বনিময়তার প্রকাশ কীভাবে ঘটেছে— আলোচনা করুন।

(৭৫) মাধুর্য ও রোমান্টিক রহস্য মিশে জ্ঞানদাসের পদাবলি অপরূপ হয়ে উঠেছে— প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আলোচনা করুন।

(৭৬) জ্ঞানদাসের দুর্বলতা তাঁর ভাষা— যেখানে তিনি বাংলা ভাষায় পদাবলি রচনা করেছেন সেখানে তিনি অদ্বিতীয়, কিন্তু ব্রজবুলি ভাষায় লেখা পদাবলিতে তিনি আড়ষ্ট— এর কারণ কী? জ্ঞানদাসের পদাবলির ভাষা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে উক্তিটির সত্যতা বিচার করুন।

(৭৭) জ্ঞানদাস যথার্থ অর্থেই আধুনিক। সবকিছুকে নতুন করে দেখার শক্তি জ্ঞানদাসের নিজস্ব প্রতিভা— আলোচনা করুন।

(৭৮) জ্ঞানদাস বৈষ্ণব সাধক কবি, প্রেমের কবি— আলোচনা করুন।

(৭৯) "বৈষ্ণব কবি, কাব্য ও ধর্মের বিরোধ মিটাইয়াছেন।"— জ্ঞানদাস সম্পর্কে এই উক্তির কতদূর গ্রহণযোগ্য তা তাঁর পদাবলি-অবলম্বনে বিশ্লেষণ করুন।

(৮০) চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে জ্ঞানদাস অদ্বিতীয়, কিন্তু তাঁর সীমাবদ্ধতা আছে। —পদাবলি বিশ্লেষণ করে আলোচনা করুন।

(৮১) পদাবলি সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাস সমস্যা এক দারুণ জটিল সমস্যা— এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা কীভাবে হয়েছে তা আলোচনা করুন।

(৮২) চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি— চৈতন্য-পূর্ব যুগের এই দুই কবির মধ্যে রূপগত ও ভাবগত যে পার্থক্য রয়েছে তা উভয়ের পদাবলির উল্লেখ-পূর্বক আলোচনা করুন।

(৮৩) বিদ্যাপতির পদাবলি রাজকণ্ঠের মণিমালা, আর চণ্ডীদাসের পদাবলি যেন বৈরাগীর রুদ্রাক্ষমালা— আলোচনা করুন।

(৮৪) বিদ্যাপতি ভোগবাদী কবি হলেও ভোগসর্বস্ব নন, কিন্তু চণ্ডীদাস প্রথম থেকেই উদাসী— উভয়ের পদের আলোচনা প্রসঙ্গে উক্তিটির যাথার্থ্য আলোচনা করুন।

(৮৫) বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য গোবিন্দদাস— উভয়ের পদাবলির আলোচনা প্রসঙ্গে এঁদের সাধর্ম্য ও পার্থক্য বিষয়ে আলোচনা করুন।

(৮৬) বিদ্যাপতি মৈথিল কবি, তাই মাতৃভাষার অধিকার নিয়েই তিনি তাঁর পদাবলির ভাষা সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু বাঙালি কবি গোবিন্দদাসের হাতে পদাবলির ব্রজবুলি ভাষার এক শৈল্পিক রূপায়ণ ঘটেছে। —প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন।

(৮৭) গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে উভয় কবিরই বিশেষ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। —আলোচনা করুন।

(৮৮) জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য— উক্তিটির আলোচনা-প্রসঙ্গে উভয় কবির সাধর্ম্য ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৮৯) চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস— উভয়েই রোমান্টিক কবি, কিন্তু উভয়ের রোমান্টিকতার মূলে একটি পার্থক্য রয়েছে— আলোচনা করুন।

(৯০) চণ্ডীদাস ভাবসর্বস্ব কবি, জ্ঞানদাস নির্মাণ করেছেন রূপের প্রতিমা— একজন চৈতন্য-পূর্ব কবি হয়েও সাধক, অপরজন চৈতন্য-পরবর্তী সাধক হয়েও শিল্পী— আলোচনা করুন।

(৯২) চণ্ডীদাসের কাব্য বিষাদের অশ্রুজলতলে অরূপের অন্বেষণ আর জ্ঞানদাসের পদাবলি মাধুর্যে ভরা রূপসাগরে অরূপের সন্ধান— আলোচনা করুন।

১.৯.২ ছোট প্রশ্নাবলি

(আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্নাবলি দ্রষ্টব্য)

১.১০ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

(১) চণ্ডীদাস পদাবলী— বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিক (সাহিত্য পরিষদ)

(২) বিদ্যাপতি পদাবলী— খগেন মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার (জিজ্ঞাসা)

(৩) গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ— বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত

(৪) মধ্যযুগের কবি ও কাব্য— শঙ্করীপ্রসাদ বসু

(৫) বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস— শঙ্করীপ্রসাদ বসু

(৬) প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, পদাবলী সাহিত্য— তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও রসবিচার— কালিদাস রায়

(৭) বৈষ্ণব কবিতা ঃ দার্শনিক ভিত্তি ও কাব্য বিশ্লেষণ— ব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য

(৮) বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস— দেবিদাস ভট্টাচার্য

(৯) বৈষ্ণব রস প্রকাশ— ক্ষুদিরাম দাস

(১০) বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর ক্রমবিকাশ— সতী ঘোষ

(১১) শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ ঃ দর্শনে ও সাহিত্যে— শশীভূষণ দাশগুপ্ত

(১২) পদাবলী পরিচয়— হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(১৩) বৈষ্ণব পদাবলী— সুকুমার সেন সম্পাদিত (সাহিত্য অকাদেমী)

(১৪) বৈষ্ণব পদাবলী— কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

(১৫) প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন — ক্ষেত্র গুপ্ত

(১৬) বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়— সনাতন গোস্বামী

(১৭) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস— সুকুমার সেন

(১৮) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত— অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস— শ্রীমন্তকুমার জানা

* * *

দ্বিতীয় বিভাগ
গোরক্ষবিজয়

বিষয় বিন্যাস ঃ

২.০ ভূমিকা (Introduction)
২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
২.২ নাথধর্মের গুরু পরম্পরা
২.৩ গোরক্ষনাথ
২.৪ নাথ-সাহিত্য ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি (গোরক্ষবৃত্ত)
  ২.৪.১ গোরক্ষবিজয়ের কাহিনি
২.৫ গোরক্ষবিজয়ে প্রতিফলিত নাথ ধর্ম, দর্শন ও সাধনপন্থা
২.৬ চরিত্রবিচার
  ২.৬.১ গোরক্ষনাথ
  ২.৬.২ মীননাথ
  ২.৬.৩ পার্বতী
  ২.৬.৪ শিব
২.৭ গোরক্ষবিজয়ে প্রতিফলিত সমাজচিত্র
২.৮ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
২.৯ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)
২.১০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি
২.১১ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

২.০ ভূমিকা (Introduction)

নাথধর্ম নামে একটি উপধর্ম এবং সেই উপধর্মাশ্রিত সাহিত্য বহুকাল ধরে শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারতে এখনও প্রচলিত। গোরক্ষনাথের নামাঙ্কিত এই ধর্মের জনপ্রিয়তা দেখে মনে হয় যে একদা এই নাথধর্মমতের সাধনা সমাজের সর্বস্তরে, বিশেষভাবে প্রচার লাভ করেছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণিই শুধু নয়, মুসলমানরাও বিপুলসংখ্যায় এই নাথধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের আধ্যাত্মিক যোগাযোগের বড়ো উপাদান এই নাথ ধর্ম ও নাথ সাহিত্য। লোকগাথা, নাটক, আখ্যানকাব্য, ছড়া-পাঁচালির মাধ্যমে নাথপন্থীরা এই দেহকে মায়া বলে পরিত্যাগ না করে, দেহকে কেন্দ্র করেই মোক্ষ বা নির্বাণ লাভের পন্থা প্রচার করেছিলেন।

নাথধর্ম সম্পর্কে দেখা যাবে যে পতঞ্জলির আধিমানসিক চর্যা, যা 'যোগ' নামে পরিচিত, তাকে কেন্দ্র করে প্রাচীন ভারতের ষড়দর্শনের অন্তর্ভুক্ত একটি বিচিত্র কায়াবাদী সাধন প্রণালি পরিকল্পিত হয়েছিল। মধ্যযুগের নাথ ধর্মের মূল উৎস বা রহস্য এই যোগশাস্ত্রের মধ্যেই। কেননা, তন্ত্র, হঠযোগ প্রভৃতি আধিদৈহিক ও আধিমানসিক

ধারাকে গ্রহণ এবং স্বীকরণ করেই নাথ দর্শন গড়ে উঠেছে। কায়াবাদ বা দেহকে এই ধর্ম যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে, মৃত্যুর পর মানুষের মোক্ষ, নির্বাণ, মুক্তি— যাই লাভ হোক না কেন, নিজ দেহের প্রতি আকর্ষণ বা মমত্ববোধ মানুষের জীবসত্তার আদিমতম প্রেরণা। তাই মানুষ যুগে যুগে এই দেহের মধ্যেই অমৃততত্ত্বের সন্ধান করেছে এবং এইজন্য কত মন্ত্র-তন্ত্রের রসায়ন, কত বিচিত্র ধর্মপ্রণালি ও সাধনার সৃষ্টি হয়েছে। পতঞ্জলির আগেই বৈদিক যুগেও ভারতে এই চেষ্টা প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়, তবে পতঞ্জলিই সর্বপ্রথম বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত যোগপন্থাকে একটি নীতি-নিয়মের মধ্যে বেঁধে দিলেন এবং চিত্তবৃত্তিনিরোধকে যোগের প্রধান লক্ষ্য বলে গণ্য করা হল।

যোগ শাস্ত্রকে একপ্রকার সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রও বলা যায়। যোগশাস্ত্র আটটি পন্থার দ্বারা স্থূল দেহকে অধ্যাত্মমার্গে উন্নীত করে— যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণ ও সমাধি। সমাধির অর্থ, বাহ্যিক জগৎ থেকে সত্তার নির্বাসন, দেশকালহীন অবাধ মুক্তির জগতে মনঃসংযোগ— এটিই যোগসাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য। পরবর্তীকালে যোগের সঙ্গে নানা প্রকার রহস্যবাদ, তুকতাক, মন্ত্র-তন্ত্র মিশে গিয়েছিল। কেউ কেউ যোগশাস্ত্রকে নিরীশ্বরবাদী বলেছেন। ঈশ্বরলাভ একমাত্র বেদান্ত ভিন্ন অন্য দর্শনের চর্চার বিষয় নয়। অবশ্য পতঞ্জলির মতে, ঈশ্বরভক্তি মোক্ষলাভ ও মুক্তিলাভের একটি উপায়। পরবর্তীকালে অবশ্য যোগদর্শনে গুরুর আধিপত্য স্বীকৃত হল, ঈশ্বর প্রাপ্তিকেই মোক্ষ বলে প্রচারও করা হল। তখন সমাধির অর্থ হ'ল ঈশ্বর-চেতনার মধ্যে জীবচেতনার বিলোপ। এইভাবেই কালে কালে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ, বিন্দুধারণ, উল্টো পদ্ধতি, খেচরীমুদ্রা প্রভৃতি সাধনাকে অবলম্বন করেছেন। তবে এই সব মতের সাধকদেরই নির্বিশেষে যোগী বলা হত। এঁদের মধ্যে শিবকে কেন্দ্র করে যে মোক্ষাভিপ্রায়ী যোগাবলম্বী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল তাঁরাই নাথযোগী সম্প্রদায় নামে পরিচিত। পরমেশ্বর শিব হলেন এঁদের আদি গুরু বা আদিনাথ। শিব আদিনাথ হলেও গুরু গোরক্ষনাথই এই সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য। এজন্যই এঁদের গোরক্ষপন্থীও বলা হয়।

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই উপবিভাগে বিন্যস্ত হয়েছে এক উপসম্প্রদায় কেন্দ্রিক ধর্মসাধনামূলক একটি গ্রন্থ। শিষ্য কর্তৃক গুরুকে সাধনার মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার কাহিনিই এর বিষয়বস্তু। এদিক থেকে মধ্যযুগীয় ইতিহাসে গ্রন্থটি অভিনব। আমরা এখানে এই গ্রন্থকে অবলম্বন করে নাথ ধর্ম সম্পর্কিত কিছু প্রাথমিক কথা জেনে নেব, জানব নাথ ধর্মের গুরুপরম্পরার প্রসঙ্গটি। নাথ ধর্ম-দর্শন ও সাধনপন্থা সম্পর্কে আলোকপাত করব। গুরু মীননাথের তুলনায় শিষ্য গোরক্ষনাথের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় সেই প্রসঙ্গটিও আমরা চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আলোচনা করব। এই কাব্যের মানব-জীবন রস ও সমাজচিত্র প্রসঙ্গটিও বিচার করে দেখব।

২.২ নাথ ধর্মের গুরু পরম্পরা

নাথ ধর্মে প্রচলিত গুরু পরম্পরায় বিভিন্ন গুরুদের নামের যে তালিকা পাওয়া যায় সেগুলি প্রধানত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে লভ্য—

(১) জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের 'বর্ণনরত্নাকর'।

(২) 'হঠযোগ প্রদীপিকা'।

(৩) 'শূন্যপুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থে,

(৪) দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থে,

(৫) যবদ্বীপে এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের সুফি সাহিত্যে।

'গোরক্ষসিদ্ধান্ত সংগ্রহ' নামক গ্রন্থে চৌরাশি সিদ্ধার সঙ্গে নয়জন নাথেরও নাম আছে। 'তন্ত্র মহার্ণব'-এ এঁদের নাম শুধু নয়, বাসস্থানেরও উল্লেখ আছে। এঁরা হলেন— গোরক্ষনাথ, জালন্ধর, নাগার্জুন, দত্তাত্রেয়, দেবদত্ত, জড়ভরত, আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও কাহ্নপা;— শিবের আদেশে নারায়ণের অবতার রূপে এই নয়জন নাথের জন্ম হয়।

বাংলাদেশের নাথ সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরা এরূপ—

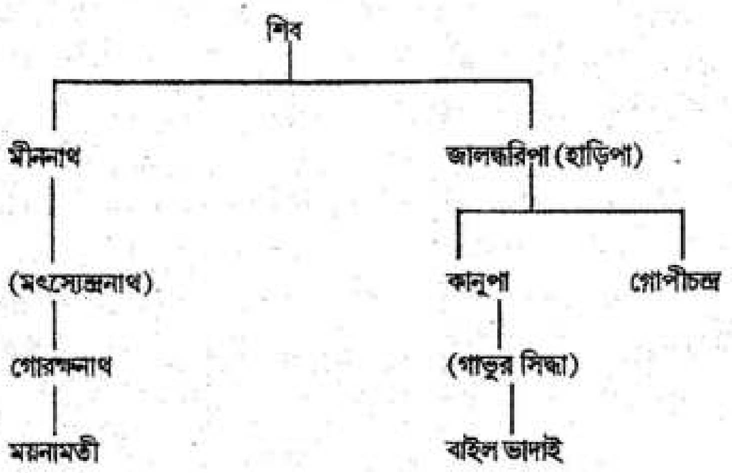

ধর্মমঙ্গল কাব্যে, সহদেব চক্রবর্তী ও লক্ষ্মণের 'অনিলপুরাণে' নাথ গুরুর নামধামে নানা পার্থক্য সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে, খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে গোরক্ষনাথের নেতৃত্বে এই নাথযোগী ধর্ম ভারতের সর্বত্র প্রচারলাভ করেছিল। বাংলাদেশে ও বাংলার বাইরে যে বিপুল কলেবর নাথ সাহিত্য রচিত হয়েছিল তার কিছু কিছু সংস্কৃত, বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি, নেপালি প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাতেও পাওয়া যায়। এই নাথ সাহিত্য মূলত তিনভাগে বিভক্ত ঃ

(ক) ধর্মদর্শন ও সাধন-ভজন প্রণালি,

(খ) গোরক্ষনাথের কাহিনি,

(গ) হাড়িপা—ময়নামতী—গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের কাহিনি।

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যায়, ধর্মমঙ্গলে, বৈষ্ণবগ্রন্থ ভক্তমালে এমনকি শক্তিশাস্ত্রেও শৈব নাথযোগীদের বিভিন্ন উল্লেখ আছে। তবে বাংলা নাথ সাহিত্যের প্রধান দুটি ভাগ হচ্ছে— (ক) গোরক্ষবিজয় ও (খ) ময়নামতীর গান। গোরক্ষবিজয়ে গোরক্ষনাথ কর্তৃক অধঃপতিত গুরু মীননাথকে উদ্ধারের বৃত্তান্ত এবং ময়নামতীর গানে গোরক্ষনাথের

শিষ্য, রানি ময়নামতীর আগ্রহে তাঁর পুত্র, তরুণ গোবিন্দচন্দ্রের বা গোপীচন্দ্রের জালন্ধরিপা বা হাড়িসিদ্ধার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সন্ন্যাস অবলম্বনের কাহিনি প্রধান।

২.৩ গোরক্ষনাথ

নাথ সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরায় গোরক্ষনাথ তৃতীয় স্থান অধিকার করলেও ভারতের সর্বত্র তাঁরই কীর্তি-কাহিনি ও পুণ্যচরিত্র বেশি প্রচলিত। নাথ ধর্মের প্রধান অবলম্বন গোরক্ষনাথের প্রচারিত তত্ত্বদর্শন। এককথায়, শিব ও মীননাথ অপেক্ষা গোরক্ষনাথের জীবনকথার প্রাধান্যই নাথ ধর্ম-সাহিত্যে বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন গোরক্ষনাথ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর আবির্ভাবকাল সম্পর্কে নানা জনের নানা মত। যেমন গ্রিয়ার্সনের মতে, অষ্টম শতাব্দী (Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol-vi), কেউ কেউ বলেন, ১০ম, ১১শ শতাব্দী (The Calcutta Review, August, 1924-Dr. B. C. Sen), কারো মতে, তিনি ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন (Gorakhnath and the Kanphata Yogis–G.W. Briggs)। আবার কবির ও নানকের সঙ্গে গোরক্ষনাথের সাক্ষাৎ হয়েছিল---- এই জনশ্রুতিতে বিশ্বাস করে উইলসন প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাঁর আবির্ভাব পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে হয়েছিল বলে মনে করেন।

এইরূপ নানাবিধ পরস্পর বিরোধী মতামত থেকে ও সন তারিখ থেকে তাঁর আবির্ভাবকাল সম্পর্কে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায় না। সাধারণত তাঁকে অষ্টম-নবম থেকে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের মধ্যে আবির্ভূত বলে মনে করা হয়।

তিনি কোন অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবিষয়েও কোনো স্থির সিদ্ধান্ত হয়নি। পৌরাণিক সংস্কার অনুসারে তিনি সত্যযুগে পঞ্জাবে, ত্রেতাযুগে গোরক্ষপুরে, দ্বাপরে দ্বারকায় এবং কলিযুগে কাথিওয়াড়ে আবির্ভূত হন। নেপালিরা মনে করেন, তিনি পশ্চিম নেপালের এক গুহায় বাস করতেন। কেউ কেউ মনে করেন, 'গোর্খা' নামটিও গোরক্ষ থেকে উৎপন্ন। অন্যমতে, তিনি উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরের অধিবাসী, যেটি বর্তমানেও কানফাটা যোগীদের প্রধান কেন্দ্র। আধুনিককালে নাথপন্থের ঐতিহাসিক ও গবেষক ডঃ মোহন সিং বলেন যে প্রকৃতপক্ষে গোরক্ষনাথ পেশোয়ার অঞ্চলেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। এইসব উপাদান ও উল্লেখ থেকে মনে হয়, তিনি খুব সম্ভব পঞ্জাবের অধিবাসী ছিলেন এবং ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। প্রত্যেক ভক্তরাই তাই তাঁদের গুরুকে নিজ নিজ অঞ্চলের লোক বলে দাবি করেন।

বাংলাদেশে নাথ সাহিত্যে গোরক্ষনাথ, মীননাথের শিষ্য এবং রানি ময়নামতীর গুরুরূপে বর্ণিত হয়েছেন। নাথ ধর্ম শৈব এবং গোরক্ষ শিবের অবতার---- এরূপ কথা যোগী সমাজে সর্বত্র প্রচারিত আছে। বৌদ্ধ জনশ্রুতিমতে তিনি পূর্বে তান্ত্রিক বৌদ্ধমতে বিশ্বাসী ছিলেন। পরে তিনি বৌদ্ধমত ত্যাগ করে শৈবযোগী হন।

২.৪ নাথ সাহিত্য : সংক্ষিপ্ত পরিচিতি (গোরক্ষবৃত্ত)

বাংলাদেশ থেকে পাওয়া গোরক্ষমহিমা বিষয়ক তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে— (ক) ঢাকা সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত শ্যামদাস সেনের মীনচেতন (১৯১৫) (খ) মুন্সী আব্দুল করিম সম্পাদিত শেখ ফয়জুল্লার গোরক্ষবিজয় (১৯১৭), (গ) ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত ভীমসেনের গোর্খবিজয় (১৯৪১)। এঁদের মধ্যে প্রকৃত কবি কে এই নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডা কম নেই, তবে লোকসমাজে ও সাহিত্যে গোরক্ষনাথ ও মীননাথের মূল কাহিনিটি নানাজনের হস্তক্ষেপের ফলে নানা পাঠবৈষম্য সৃষ্টি করেছে— কিন্তু উপর্যুক্ত তিনটি কাব্যের মধ্যে এত মিল দেখা যায় যে এগুলি একজনের রচনা বলেই মনে হয়।

২.৪.১ গোরক্ষবিজয়ের কাহিনি

গোরক্ষবিজয়ের কাহিনিতে গুরু মীননাথ অপেক্ষা শিষ্য গোরক্ষনাথের গৌরবই বেশি প্রচারিত হয়েছে। শিষ্য হয়েও গোরক্ষনাথ গুরু মীননাথকে নারীর মায়াপাশ থেকে চেতনায় ফিরিয়ে আনেন। এজন্যই এই কাব্যের নাম 'মীনচেতন'-ও বটে। আদি গুরু নিরঞ্জনের মুখ থেকে যোগী রূপে শিব, নাভি থেকে মীননাথ, হাড় থেকে হাড়িপা (জালন্ধরিপা), কান থেকে কানিফা (কানুপা) এবং জটা থেকে গোরক্ষনাথ জন্ম নিলেন। নিরঞ্জনের সর্বশরীর থেকে গৌরী জন্ম নিলেন এবং শিব তাঁকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন। একদিন গৌরী শিবকে প্রশ্ন করলেন— 'তুমি কেনে থাক গোসাই আমি কেনে মরি'— তখন মহাজ্ঞান বোঝানোর জন্য ক্ষীরোদ সাগরের জলটুঙ্গি ঘরে শিব গৌরীকে নিয়ে গেলেন। সেখানে দেবীর নিদ্রার সুযোগে মীননাথ চুরি করে মহাজ্ঞান শুনে নিলেন। মহাদেব এই বঞ্চনা ধরতে পেরে তাঁকে অভিশাপ দেন যে মীননাথ যা শিখেছেন সব ভুলে যাবেন।

একদিন গৌরী শিবকে বললেন, তোমার শিষ্যরা সংসারী না হলে পৃথিবী কী করে রক্ষা পাবে। শিব বলেন, তাঁর যোগী শিষ্যরা জিতেন্দ্রিয়, কামক্রোধ বর্জিত। তাঁরা কোনো কামনাতেই টলেন না। দেবী পরীক্ষা করতে চাইলেন। চারজন শিষ্যকে আমন্ত্রণ করে দেবী অন্ন পরিবেশন করছেন। দেবীর অসামান্য রূপ দেখে মীননাথ ভাবলেন, এমন সুন্দরী স্ত্রী পেলে— 'রঙ্গকৌতুক রসে রজনী পোয়াই'। দেবী তখন অভিশাপ দিলেন, কদলী দেশে স্ত্রী রাজ্যে গিয়ে ষোড়শ কদলী নিয়ে বাস করবেন মীননাথ। হাড়িপা ভাবলেন এমন সুন্দরীসহ— 'হাড়িকর্ম করি যদি থাকি তার পাশ'। দেবী তাঁকেও শাপ দিলেন, যাও রানি ময়নামতীর কাছে গিয়ে কোদাল ঝাড়ু নিয়ে হাড়ির কর্মই করো। কানুপা ভাবলেন, এমন স্ত্রী পেলে মৃত্যুতেও আপত্তি নেই। দেবী বলেন, তুমি ডাহুকের দেশে চলে যাও, সেখানে— 'সংমায়ে ভজিব তুম্মি দেখিয়া জোয়ান'। সবশেষে যোগীশ্রেষ্ঠ গোরক্ষ দেবীকে দেখে ভাবলেন, দেবী যদি আমার জননী হতেন, যে মা সর্বঘৃণা ত্যাগ করে সন্তান পালন করেন, আমি সেই মায়ের স্নেহ লাভ করতে চাইতাম—

> 'তবে ভাবিলেক মনে গোর্খে করি সার।
> এমত জননী যদি থাকএ আমার

তাহার কোলেতে বসি সুখে দুগ্ধ খাই
এমত জননী যদি কভু আমি পাই।'

এই চারজন শিষ্যের মধ্যে দেবী গোরক্ষকে জয় করতে পারলেন না। দেবী আরও বিপজ্জনক পরীক্ষা করতে চাইলেন। যে পথে গোরক্ষনাথের যাতায়াত সে পথে বিবস্ত্রা হয়ে লালসাময়ী রূপে শায়িতা রইলেন। গোরক্ষনাথ বৃক্ষপত্র দিয়ে দেবীকে আবৃত করলেন। এরপরও দেবী মাছি রূপে গোরক্ষর উদরে প্রবেশ করেন। গোরক্ষনাথ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করায় দেবীর প্রাণ যায় যায়, দেবীর কাকুতি মিনতিতে গোরক্ষ দেবীকে মুক্তি দিলেন, কিন্তু দেবীর রূপ হ'ল রাক্ষসীর মতো, পরে শিবের অনুরোধে গোরক্ষ তাঁর স্বরূপ ফিরেয়ে দিলেন। শিব দেবীর অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য গর্ভেশ্বর রাজার বালিকা কন্যার সঙ্গে গোরক্ষের বিবাহ দিয়ে তাঁর ব্রহ্মচর্য নষ্ট করতে চাইলেন। কিন্তু গোরক্ষ স্ত্রীকে ত্যাগ করে গেলেন। গোরক্ষনাথের স্ত্রী গোরক্ষের কৌপীন বা কপটী সিক্ত জলপানের ফলে একটি পুত্র লাভ করেন যার নাম কপটীনাথ। পথে গোরক্ষনাথ কানুপার কাছে জানতে পারলেন যে তাঁর গুরু মীননাথ কদলী রাজ্যে মায়ার ছলনায় বদ্ধ হয়ে আছেন।

গোরক্ষনাথ তখন গুরুকে উদ্ধার করে আত্মজ্ঞানে প্রবুদ্ধ করার জন্য কদলীর দেশে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, গুরু নারীদের সঙ্গে বাস করে যোগদেহ নষ্ট করে ফেলেছেন, তাঁর একটি সন্তান (বিন্দুনাথ)-ও হয়েছে এবং গুরুর মৃত্যুর আর দেরি নেই। নারীর ছদ্মবেশে মাদলে ঘা দিয়ে গোরক্ষ গুরুকে 'কায়া সাধ কায়া সাধ' বলে সচেতন করে দিতে চাইলেন। এতেও চেতনা আসে না দেখে গোরক্ষ কতকগুলি প্রহেলিকা বা ধাঁধা বলেন—

'পুকুরেতে জল নাই পার কেনে বোড়ে
বাসার মধ্যে ছায় থুই আড়ি-মুউড়া করে।
নগরে মনুষ্য নাই ঘর চালে চালে
আন্ধলে দোকান দেএ খরিদ করে কালে—

এরপর এতেও কাজ হল না দেখে মায়াপাশ ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে গোরক্ষ, মীননাথের পুত্র বিন্দুনাথকে মেরে ফেললেন। গুরু পুত্রশোকে ব্যাকুল হলে পুত্রকে আবার বাঁচিয়ে দেওয়া হল, এবার—

'স্বপ্ন হতে মীন যেন উঠিল জাগিয়া'। মায়াপাশ বদ্ধ মীননাথ শিষ্যের সাহায্যে পুনর্বার যোগীজীবনে ফিরে গেলেন। তাঁর আত্মজ্ঞান ফিরে এল, পুত্র বিন্দুনাথও যোগী সন্ন্যাসী হলেন।

২.৫ গোরক্ষবিজয়ে প্রতিফলিত নাথ ধর্ম, দর্শন ও সাধনপন্থা

গোরক্ষবিজয়ের কাহিনিতে মানবজীবনের একটি চিরন্তন দুর্বলতার কথা প্রচারের পাশাপাশি নাথ ধর্মের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের কীর্তন করা হয়েছে। জীবনবোধের অপূর্ব স্পর্শ এতে থাকা সত্ত্বেও এই আখ্যান মূলত যোগপন্থার উদ্দেশ্যবাহী। গোরক্ষনাথ ও মীননাথের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গোরক্ষপন্থী যোগীদের গুহ্য তত্ত্ব কোথাও খোলাখুলিভাবে, কোথাও বা আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে। অপক্ক দেহকে কী করে যোগদেহে পরিণত করতে হবে, কেমন করে মোক্ষ বা মুক্তিলাভ করতে হবে, মরদেহের

মধ্যে অমর হতে হবে, সে সমস্ত গুহ্যাতিগুহ্য মহাজ্ঞানের কথা গোরক্ষনাথ নিজগুরু মীননাথকে শুনিয়ে প্রবুদ্ধ করতে চেয়েছেন। এই মতের মূল আদর্শ মহারস সংরক্ষণ (বিন্দুধারণ) ও উল্টাসাধন। এই তত্ত্বটি অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রকাশ্যে বা গোপনে ভারতবর্ষীয় সমাজে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে চর্চিত হয়ে আসছে। জড়দেহকে অজড়স্বভাব ও অমর করবার জন্য এই প্রকার সাধনা স্বীকৃত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। তাই এইপ্রকার সাধনা কখনও ব্রাহ্মণ্যমত, কখনও বৌদ্ধমত, কখনও সুফিমত, কখনও বা যোগীমতে গৃহীত হয়েছে। বিন্দুধারণের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হতে পারে— যোগে পরবর্তীকালে এই ধরনের হঠযোগ সাধনা প্রবিষ্ট হয়। খেচরী মুদ্রার দ্বারা বিন্দুধারণ সাধক নিজেই করতে পারেন, অথবা বজ্রোলী মুদ্রার দ্বারা নারী সাহচর্যেও তা লাভ করা যায়। এই শেষোক্ত পন্থা পরবর্তীকালের তন্ত্র হঠযোগ, কৌলপন্থা ও সহজিয়া বৈষ্ণব সমাজে স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু গোরক্ষপন্থায় বজ্রোলী পন্থা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। কারণ নারীসঙ্গে মহাসাধকও 'মহারস' অবিচলিত রাখতে পারেন না। বোধহয় মীননাথের অধঃপতনের দৃষ্টান্তের দ্বারা গোরক্ষপন্থীরা পুনঃ পুনঃ তারই নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য 'হঠযোগপ্রদীপিকা'র একটি শ্লোকের টীকায় মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি আচার্যগণ সহজোলী ও বজ্রোলী মুদ্রাকে শ্রদ্ধা করতেন— এরূপ বর্ণনা আছে।

মীননাথকে গোরক্ষনাথ কায়াসাধনার যে গূঢ় কথা গানের সাহায্যে বলেছিলেন, তার মূল বক্তব্য হল— যোগশাস্ত্রে, বিশেষত হঠযোগশাস্ত্রে বিন্দুধারণ বা বিপরীতে বিন্দুসঞ্চরণ মোক্ষের একমাত্র উপায় রূপে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু গুরু সেই অমূল্য সম্পদ নষ্ট করেছেন। তাই গোরক্ষনাথ কৌশলে গুরুকে 'চারিচন্দ্র' সাধনার কথা বললেন—

'গুরু চারিচন্দ্র হয়ে শরীর ব্যাপিয়া রয়ে
তাহার সাধিলে পরিত্রাণ'

'উল্টাযোগের' কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন—

'উলটিয়া ধর আপনা ত্রিবেণীতে দেয় হানা
খালে জল ভরিতে কারণ।'

তবু যোগসাধনায় মীননাথের অনীহা দেখে গোরক্ষনাথ অনেকগুলি প্রহেলিকা আবৃত্তি করে যোগাচার ব্যাখ্যা করলেন; বার বার উল্টাসাধন পদ্ধতি অবলম্বন করতে ও পবনবিজয় করে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলতে লাগলেন।

নাথযোগপন্থার বিশিষ্ট ক্রিয়া-কর্মের প্রাকরণিক নির্দেশই গোরক্ষনাথের জবানিতে রূপক-প্রহেলিকার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। নাথযোগী সম্প্রদায়ের কায়াসাধনতত্ত্ব ও উল্টাসাধনার রহস্য দুর্জ্ঞেয় ভাষায় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গ্রন্থের শেষাংশে সাধ্যসাধনার কথা গুরুতর আকার ধারণ করে অনেকটা স্থান দখল করেছে। শিষ্য গুরুকে দুবার যোগসাধন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন প্রায় একই উপমা-রূপক-প্রতীক ব্যবহার করে। ফলে বর্ণনায় পুনরাবৃত্তি দোষ ঘটেছে। আজকের পাঠক হয়তো এই কাব্য থেকে আখ্যানরস ও চরিত্রবৈশিষ্ট্য পেতে পারেন, কিন্তু সে যুগের যোগী সমাজে এর তত্ত্বাংশের মর্যাদাই ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

২.৬ চরিত্রবিচার

গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে যদিও এক বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের বিশিষ্ট দর্শনতত্ত্ব এবং সাধনপন্থাই মূলত প্রকাশ পেয়েছে, তবু যে চরিত্রগুলিকে আশ্রয় করে তা প্রকাশিত হয়েছে সেই চরিত্রসমূহ আধুনিক পাঠকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আসুন গোরক্ষবিজয়ের প্রধান চরিত্রগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমরা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখি।

২.৬.১ গোরক্ষনাথ

গোরক্ষবিজয় গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম গোরক্ষনাথ। গোরক্ষনাথকে এই গ্রন্থের নায়কচরিত্র বলা যেতে পারে। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে বলা হয়েছে, নায়ক হলেন তিনিই যিনি কাহিনিকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পরিচালিত করেন। গোরক্ষবিজয়েও গোরক্ষনাথের চরিত্রে এই গুণ বর্তমান থাকায় তাঁকে নায়ক বলতে কোনো দ্বিধা থাকে না।

গোরক্ষবিজয়ের গোরক্ষনাথের চরিত্রটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় কালিদাস রায় বলেন—'গোরক্ষনাথের অবিচলিত চরিত্রে যে নির্বিশেষ শ্রেয়োবোধ আছে তাহা সাহিত্যেরই উপজীব্য।' —এই চরিত্রটির পরিকল্পনা বহু সহৃদয় সাহিত্য রসিককেই বিমোহিত করেছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন— 'গোরক্ষযোগীর চরিত্র শরৎ-শেফালিকা বা যূথিকার ন্যায় শুভ্র, তাঁহার চরিত্রমাহাত্ম্য বঙ্গসাহিত্যের আদিযুগের একটি প্রধান দিকনির্দেশক স্তম্ভ।'

গোরক্ষনাথের চরিত্রের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমটি তাঁর চরিত্রের অতুলনীয় অবিচলিত সংযম, আর দ্বিতীয়টি গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি।

কাব্যের আরম্ভেই তাঁর সংযমের অগ্নিপরীক্ষা হয়েছে গৌরীর প্রলোভন জয়ের মধ্য দিয়ে। একবার নয়, বার বার তিনি গৌরীর চক্রান্ত ব্যর্থ করেছেন এবং গৌরীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মাতৃরূপে বন্দনা করেছেন—

> 'তবে ভাবিলেক মনে গোর্খে করি সার
> এ মত জননী যদি থাকএ আমার।'

কিন্তু এই সংযমের পরিচয় আমাদের মনকে খুব একটা দোলা দেয় না; কারণ, বর্ণনার মধ্যে কিছুটা নিষ্প্রাণতা ও কৃত্রিমতা রয়েছে। অবশ্য কাহিনির পরবর্তী অংশ থেকে তাঁর চরিত্রে প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যায়। যখন শিবের কাছে বর পেয়ে গন্ধর্ব-রাজকন্যা তাঁকে পতিত্বে বরণ করতে চাইলেন, তখন—

> 'গোর্খে বলে গুরুবাক্য পালিবারে চাই
> শিবের বচনে কন্যা বরিল জামাই।'

গুরুভক্ত গোরক্ষনাথ গুরুবাক্য লঙ্ঘন করতে পারেন না। সেজন্য আজন্ম ব্রহ্মচারী হয়েও তিনি পত্নী গ্রহণ করলেন। গোরক্ষনাথ একাধারে অটুট সংযম, দৃপ্ত পৌরুষ ও অবিচলিত গুরুভক্তির মূর্ত বিগ্রহ।

গৌরীর প্রলোভন জয় করবার মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রের সংযম ও অবিচলতা ফুটে উঠেছে, কিন্তু তা আরও দৃঢ় হয়েছে তাঁর নিজের বিবাহিতা পত্নীর সঙ্গে ব্যবহারে।

নিভৃত গৃহে রাত্রিকালে তাঁর স্ত্রীর প্রলোভন অতিক্রম করার মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্ম করুণ সুর ফুটে উঠেছে যা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। স্ত্রীর অনুনয়-বিনয়, আবেদন-নিবেদন, ক্রন্দন, ভীতি প্রদর্শনের উত্তরে গোরক্ষনাথ বলেন—

'স্ত্রী পুরুষ নহি আমি নাহি বীর্য্যবল
শুখনা কাষ্ঠের মত শরীর সকল
গন্ধহীন পুষ্প আমি মাদারের ফুল
শরীরেতে রস নাই কাষ্ঠ সমতুল।।'

একদিকে ব্রতের অনুরোধে তাঁর স্বাভাবিক জৈবধর্ম পালনে অস্বীকার, অসীম সৌন্দর্য ও দৃপ্তযৌবনের প্রতিমূর্তি হয়েও স্ত্রীর কাছ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য নিজেকে অকুণ্ঠ চিত্তে নির্বীর্য পুরুষ বলে ঘোষণা, অপরদিকে স্ত্রীর আশাভঙ্গ— এসমস্ত মিলে একটি অপূর্ব করুণরসমধুর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে কবি নিজের অজ্ঞাতসারে অত্যন্ত সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

তারপর অলৌকিক উপায়ে স্ত্রীর পুত্রকামনা চরিতার্থ করে তার কাছ থেকে গোরক্ষনাথ বিদায় নিলেন। এরপর কানফার সঙ্গে তাঁর দেখা হলে দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড বাগ্‌বিতণ্ডা হল। কানফার কাছে নিজের গুরু মীননাথের সংবাদ পাবার পর কানফাকে তাঁর গুরুর খবর দিয়ে গোরক্ষনাথ গুরুর আসন্ন মৃত্যু রোধ করার জন্য যমের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন— 'গোর্খের দেখিয়া ক্রোধ যম কাঁপে ডরে'। এরপর তিনি গুরুকে উদ্ধার করবার জন্য কদলী রাজ্যে যাত্রা করলেন। কদলী রাজ্যে প্রবেশ করে তিনি একটি বকুল গাছের তলায় বসে মীননাথের প্রাসাদে প্রবেশ করার উপায় চিন্তা করাকালীন সময়ে এক রমণী এসে তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে প্রেম নিবেদন করল। গোরক্ষনাথ তাকে স্বব্যক্তিত্বে নিরস্ত করলেন। এরপর তিনি যোগীবেশে মীননাথের প্রসাদে প্রবেশ করতে গেলে বাধাপ্রাপ্ত হলেন। ফলে নর্তকীবেশে নানা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়ে মহলে প্রবেশ করলেন।

রাজসভার দৃশ্যটিতে আবার গোরক্ষনাথ চরিত্র বিদ্যুৎদীপ্তিতে ঝলসে উঠেছে। এক সংযমী, আজন্ম ব্রহ্মচারী পুরুষের নর্তকী সেজে এক দুর্নীতিপূর্ণ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করা এবং নাচতে নাচতে কথা না বলে শুধুমাত্র মাদলের সংকেতে তত্ত্বোপদেশ দেওয়া— তাও আবার নিজগুরুকে, যে গুরু আত্মবিস্মৃত নীতিপথভ্রষ্ট,— কাব্যোপযোগিতার দিক দিয়ে এই পরিবেশটির তুলনা নেই। তত্ত্বের দিক থেকে যেমন রসের দিক থেকেও তেমনি সমগ্র রচনার মধ্যে এই অংশেরই সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ।

নাচতে নাচতে মাদলের তালে তিনি গুরুকে উপদেশ দিতে থাকেন— 'নাচন্তি যে গোর্খনাথ শূন্যে করি ভর/কায়া সাধ কায়া সাধ গুরু মেচ্ছন্দর।' সুন্দরী যুবতী নর্তকী দেখে কামুক মীননাথ নিজের উগ্র লালসা ব্যক্ত করলে গোরক্ষনাথ নিজ পরিচয় দান করলেন। এরপর তীব্র ভাষায় গুরুকে ভর্ৎসনা করলেন এবং গুরুর সম্মুখে তাঁর সাংঘাতিক পরিণামের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে তাঁকে নানা তত্ত্বোপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও গুরুকে সাধনপথে ফিরিয়ে আনতে না পেরে ক্ষোভে বিহ্বল হয়ে গুরুকে তিনি তিরস্কার করে বললেন—

'বোঝাইলে না বোঝ তুমি পশুর লক্ষণ
অমৃত ছাড়িয়া কর গরল ভক্ষণ।'

এর মধ্য দিয়ে গোরক্ষনাথের মনের অবস্থা উপলব্ধি করা যেতে পারে। কিন্তু এসব চেষ্টাই বিফল হবার উপক্রম হল, যখন মীননাথ বলেন— 'বিধির ঘটন কেবা খণ্ডাইতে পারে';— অর্থাৎ তিনি পার্থিব সুখভোগ ত্যাগ করতে রাজি নন। কিন্তু গোরক্ষনাথও হাল ছাড়বার পাত্র নন; তিনি কখনও সাধারণ ভাষায়, কখনও আদেশের সুরে, কখনও সন্ধ্যাভাষায়, কখনও অনুনয়ের ভঙ্গিতে গুরুকে বোঝাতে লাগলেন—

'খেনেকে বালক হএ খেনে বৃদ্ধ নাথ
খেনেকে যুবক হএ মীনের সাক্ষাৎ
হাতের মারিয়া তালি গুরুকে বোঝায়
বন পক্ষিগণ যেন না ছাড়ে বাছায়।'

এর মধ্য দিয়ে গোরক্ষনাথের একাগ্র অধ্যবসায় এবং গুরুর প্রতি সুনিবিড় মমতা— দুই-ই উজ্জ্বলতরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। গোরক্ষনাথের বহু পরিশ্রমের পর মীননাথের চৈতন্যোদয় হল। কিন্তু মহিষীদের কাতর অনুনয়ে গুরু পুনরায় বিচলিত হলে গোরক্ষনাথ গুরুকে তীব্র ভর্ৎসনা করে অলৌকিক বিভূতি প্রদর্শন করে অবশেষে তাঁকে জয় করলেন।

গোরক্ষনাথের চরিত্রে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে বর্ণিত ধীরোদাত্ত নায়কের অনেকগুলি গুণই বর্তমান। সংযম, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, তিতিক্ষা, ভক্তি, স্নেহ— সমস্তই তাঁর আচরণের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘাতের মধ্য দিয়েই কাব্যের চরিত্র জীবন্ত হয়। উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা এই গুরুশিষ্য সংবাদের দৃশ্যটিতে সংঘাতের মাত্রা প্রায় শেষপর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন বলে নায়ক গোরক্ষনাথ স্বাভাবিক মানুষ হয়েই দেখা দিয়েছেন, তত্ত্বকথার বাহন মাত্রে পর্যবসিত হননি।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, গোরক্ষনাথ চরিত্র আগাগোড়া একটি আদর্শায়িত চরিত্র। মনুষ্যসুলভ দোষগুণের অনাবিল ও অবারিত প্রকাশ তাঁর চরিত্রে ঘটেনি। তিনি আদর্শমতি চরিত্রের অপাপবিদ্ধ প্রতীক, বহির্ঘটনার আঘাতে তাঁর চরিত্র ক্রমেই এক জ্যোতির্ময় মহিমা লাভ করেছে। পার্বতীর ছলনা থেকে শুরু করে রাজকন্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ, কদলীর দেশে গিয়ে নানা কৌশলে গুরুর সাক্ষাৎলাভ এবং গুরুকে প্রবুদ্ধ করা ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁকে অনেক প্রলোভন, অনেক বাধা জয় করে তবে গুরুকে 'ব্যাঘ্রী'দের কবল থেকে মুক্ত করতে হয়েছে। কিন্তু এসমস্ত বাধা এসেছে বাইরের দিক থেকে; তাঁর অন্তরের কোনো সংকট, কোনো জটিলতা, দুর্বলতা এতে প্রকাশিত হয়নি। পত্নীকে মাতৃসম্বোধন, নিজেকে দাম্পত্যজীবনের পক্ষে অক্ষম হিসাবে প্রতিপন্ন করা, কদলীর দেশে এক রমণীর নির্দেশে গুরুর কাছে যাওয়ার উপায় লাভ ইত্যাদি বর্ণনায় তাঁর মানসিকতার যে পরিচয় আমরা পাই, তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু অন্যদিক থেকে বলা যায়, যে যোগীশ্রেষ্ঠ যোগমার্গ অবলম্বন করে মহাজ্ঞানের সাহায্যে সম্ভোগদেহকে সিদ্ধদেহে এবং সিদ্ধদেহকে দিব্যদেহে পরিণত করে 'দশমী দুয়ারে তালা' দিয়েছেন, তাঁর নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপশিখার মতো অচঞ্চল মন যে জাগতিক মোহের দ্বারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না, তা খুব স্বাভাবিক।

একমাত্র কদলী রাজ্যে গুরুর চেতনা উদ্ধারের দৃশ্যটিতে গুরুর সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ, মেজাজের ওঠানামা এবং আশা-নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গোরক্ষনাথ চরিত্র জীবনের দীপ্তিতে মণ্ডিত হয়েছে। অবশ্য আখ্যানের প্রথমাংশে, পার্বতীর ছলনা

অংশে, গোরক্ষনাথ চরিত্রের মানবিক দিক কিছুটা প্রকাশিত হয়েছে। মাছি রূপে তাঁকে ছলনা করার জন্য দেবী তাঁর উদরে প্রবেশ করেছেন জেনে দেবীকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য 'তালি দিয়া বৈসে নাথ দশমী দুয়ারে', তারপর দেবীর কাতর উক্তিতে উদর থেকে তাঁকে বের করে দেওয়ার প্রক্রিয়ার বর্ণনাংশে কৌতুকরসের সৃষ্টি হয়েছে—

'দেবীর মিনতি শুনি যতিনাথ হাসে,
কোন পথে ছাড়ি দিব মনেতে বিমসে,
ভাবিয়া চিন্তিয়া নাথ মনে কৈল সার,
মার্গপথে ছাড়ি দিব বাহির হইবার।'

পরিশেষে বলা যায়, যতিশ্রেষ্ঠ গোরক্ষনাথ শিষ্য হয়েও যেভাবে গুরুর লুপ্ত চেতনা উদ্ধার করেছেন তাতে তিনি কুটিল প্রকৃতির কটাক্ষ উপেক্ষা করে এই আখ্যানে আত্মার জয় ঘোষণা করেছেন। প্রাজ্ঞ সমালোচক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক অভিমত উদ্ধার করে আমরা এই আলোচনা সাঙ্গ করতে পারি। গোরক্ষনাথ চরিত্র সম্পর্কে তিনি বলেন— 'এ যেন বাস্তব জীবনের সঙ্গে আদর্শায়িত জীবনের, ভোগসুখমগ্ন জীবনের সঙ্গে যোগক্ষেম-জীবনের, দেহের সঙ্গে বৈদেহী চেতনার, স্নেহ-ভালবাসার মায়াবী জগতের সঙ্গে মায়ামমতাহীন নিঃস্পৃহ মুমুক্ষু জীবনের প্রচণ্ড সংগ্রাম, বেনিয়নের Pilgrim's Progress-এর যাত্রীটির মতো আত্মিক জয়লাভই এই কাব্য ও চরিত্রের মূল লক্ষ্য।'

২.৬.২ মীননাথ

গোরক্ষবিজয়ের রচনাকৌশলের দিক থেকে মীননাথের চরিত্রটিই অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয়েছে এবং এই চরিত্রে মনোবিকলনতত্ত্ব-সঙ্গত এবং মনস্তত্ত্বসম্মত একটি পরিণতি লক্ষিত হয়েছে।

ফাঁকি দিয়ে গোপনে মহাজ্ঞান অবগত হওয়ার ঘটনাতেই তাঁর চরিত্রিক দুর্বলতার প্রথম সূচনা। গুরু হিসাবে শিবের পরেই তাঁর স্থান; অথচ তিনি সাধারণ মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত নন। সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভের কঠোর পথ ত্যাগ করে তিনি চাতুর্যের সহজ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। পরিবেশনরত পার্বতীকে দেখে তিনিই সবচেয়ে বেশি মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন—

'কহিলেক মীননাথ মনে মায়া ধরি।
জগতেও পাই যদি এমন সুন্দরী।।
বিচিত্র শয্যাতে থাকি হেন নারী লই।
রঙ্গ কৌতুক রসে রজনী পোয়াই।।'

তাঁর কামবাসনা কদলীর দেশে গিয়ে উদ্দাম হয়ে উঠেছে। নারীসঙ্গে তাঁর অধঃপতন যোগীসমাজের কাছে ভয়াবহ হলেও, শিষ্য কর্তৃক গুরুর চেতনা উদ্ধার এবং সাধ্যসাধনতত্ত্ব সংক্রান্ত এই কাব্যে মীননাথের সংসার-বাসনা মর্ত্যচেতনাকেই স্বীকৃতি দিয়েছে। গোরক্ষনাথ তাঁকে নারীসঙ্গ থেকে উদ্ধার করার জন্য প্রয়াসী হলেও মীননাথ কামকুণ্ডের বিলাসপঙ্ক পরিত্যাগ করতে পারেননি। মায়া তাঁকে ভ্রষ্ট করেছে, প্রকৃতি তাঁকে ছলনা করেছে, সংসারের প্রেমঘটিত দুর্বলতা তাঁর মোক্ষের পথে কাঁটা হয়ে

দাঁড়িয়েছে— এসব অনুধাবন করেও তিনি অশক্ত শারীরিক অবস্থার অজুহাতে নির্দিষ্ট যোগপন্থা পরিহার করতে চাইছেন। বৃদ্ধ অবস্থায়ও তিনি কীরূপ কামলোলুপ, তা নর্তকীবেশধারী গোরক্ষনাথকে দেখে তাঁর চিত্তচাঞ্চল্যের মধ্যে ধরা পড়েছে। যদিও তাঁর 'পাকিছে মাথার কেশ আয়ু হইছে শেষ,' এবং 'উঠিয়া বসিতে নাই শকতি' তবু এই কামাতুর অশক্ত বৃদ্ধ নটীবেশী গোরক্ষনাথকে স্ত্রীলোক মনে করে বলপ্রয়োগের ভয় দেখিয়েছেন। যদিও গোরক্ষনাথের প্রহেলিকা সংগীতের সাহায্যে তাঁর চেতনাসঞ্চার হল, তবু তিনি এই কামকূপ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য প্রয়াসী নন। কারণ তখন তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে সন্তানের প্রতি আকর্ষণ। গোরক্ষনাথ তখন মীনপুত্র বিন্দুনাথকে হত্যা করে গুরুকে তীব্র মানসিক আঘাতদানের মাধ্যমে চৈতন্যসঞ্চারের চেষ্টা করলেন। পুত্রের মৃত্যুসংবাদে মীননাথের বিলাপে ধরা পড়েছে পুত্র বিয়োগব্যথায় কাতর পিতার হৃদয়ের হৃদয়ার্তি—

'কোথায়ে গেল বিন্দুনাথ না দেখি নয়ানে,
কিরূপে মারিল তারে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জনে।
রৌদ্রমধ্যে বিন্দুনাথ দেখিল নয়ানে,
মুখে মুখ দিয়া মীন করয়ে ক্রন্দনে।
কান্দিতে কান্দিতে মীন হইল অচেতন,
পুত্র পুত্র বলি রাজা ফাটিল নয়ন।'

তারপর আবার পুত্রের পুনর্জন্ম এবং গোরক্ষনাথের অভিশাপে কদলী রাজ্যের নারীদের বাদুড় হয়ে উড়ে যাওয়া। এতে মীননাথের সকল বন্ধনের অবসান হল। এখন 'স্বপ্ন হতে মীন যেন উঠিল জাগিআ।' তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে কায়াসাধনার মূল স্রোতে ফিরে এলেন।

মীননাথের চরিত্রের ধর্মীয় তাৎপর্য— যোগীর অধঃপতন এবং তা থেকে তাঁকে আবার যোগপথে আনয়ন— এসমস্ত বর্ণনা সে যুগের যোগীসমাজে সাহিত্যরসের অতিরিক্ত সাধনসংক্রান্ত তত্ত্বকথারূপেই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছিল। কিন্তু আধুনিককালের সাহিত্যবিচারের মানদণ্ডে এই চরিত্রে চিহ্নিত করা যায় এক বাসনাজর্জর চিত্তসংকট, চরিত্রটিতে লক্ষ করা যায় মনস্তত্ত্বসম্মত এক বিকাশ ও পরিণাম।

মীননাথের পতন এবং পুনরুদ্ধারের ঘটনাক্রমটিকে অনুসরণ করলে দেখা যায় যে নিতান্ত স্বাভাবিক উপায়েই মীননাথের এই পতন দেখানো হয়েছে। বাহ্যিক সাধন ভজনের অন্তরালেও যে একটি চিরন্তন মানবিক দুর্বলতা সর্বদাই প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে এবং অনুকূল অবসরে তা বাহ্যিক সকল বাধা অতিক্রম করে প্রবল বেগে আত্মপ্রকাশ করে— এই শাশ্বত সত্যই মীননাথের পতনের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কঠোর সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে তিনি গোরক্ষনাথের মতো শিষ্যের গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু নারীসৌন্দর্যের ছায়ারূপ মাত্র দেখে তাঁর অন্তরস্থিত চিরন্তন দুর্বলতা সজাগ হয়ে উঠল। মানুষের মনে যৌন প্রবৃত্তি দীর্ঘকাল নিরুদ্ধ হয়ে থাকার পর, একবার বাঁধ ভেঙে গেলে তার বেগ রোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। মীননাথের জীবনেও তাই দেখা গেছে। রুশ লেখক টলস্টয়ের একটি দীর্ঘ গল্পের মধ্যেও এই কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। শৃঙ্খলিত করে যে প্রবৃত্তিকে শাসন করা হয়, একবার কোনো উপায়ে শৃঙ্খলমুক্ত হতে পারলে সেই প্রবৃত্তিই তার শাসনদণ্ড তখন নিজের হাতে তুলে নেয়। বাহ্যসংস্কারের বাঁধ যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে; সেজন্য এতে যে পতন আসে তা পূর্বদৃষ্ট নয়,

বরং নিতান্তই আকস্মিক। মীননাথও একদিন যখন পার্বতীর শরীর জলের ছায়ায় দেখলেন তখন তাঁর মনে ভাবান্তর অনুভব করলেন এবং তাকে তিন রোধ করতে পারলেন না। দেবীর বর বা অভিশাপ রূপকমাত্র। তাঁর সেই মুহূর্তের ভাবান্তরই তাঁকে নিতান্ত স্বাভাবিক নিয়মে সর্বনাশের অতলগহ্বরে ঠেলে দিল। মীননাথের চরিত্রে এই একান্ত মানবিক অনুভূতির প্রকাশ, কাহিনির গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

মোহ যখন একবার মানুষের দেহমন আচ্ছন্ন করে, তখন সত্যের আলোক যে কোনো দিক দিয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না—তা-ও মীননাথের চরিত্রে পল্লিকবিগণ দেখিয়েছেন। নারীসঙ্গই জীবনের চরম সার্থতা বলে মীননাথ সেদিন মনে করেছেন এবং তারই সমর্থনে নানা যুক্তি অনুসন্ধান করেছেন—

'মোর গুরু মহাদেব জগত ঈশ্বর।
গঙ্গা গৌরী দুই নারী থাকে নিরন্তর।।
আর দুই নারী তার স্যাক্ষাতে দিগম্বর।
হেন রূপে করে গুরু কেলি কুতূহল।
তান আছে গৃহবাস আহ্মি কোন হই।
ভবে মোর এক গতি শুন আহ্মি কই।।'

মাতাল যেমন মদ খাওয়ার একটি যুক্তি উপস্থিত করে, মোহমত্ত মীননাথও তেমনি নারীসঙ্গের যুক্তি খুঁজে বের করেছিলেন। অবশেষে গোরক্ষনাথের ক্রমাগত প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে মীননাথ পুনরায় সত্য উপলব্ধি করলেন। শিষ্য গোরক্ষনাথ তাঁকে সেই চৈতন্যোদয়ে সহায়তা করলেন— এখানেই কাহিনিটির বিশেষত্ব।

২.৬.৩ পার্বতী

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে (একমাত্র ধর্মমঙ্গল বাদে) হরগৌরীর বৃত্তান্ত কাব্যের প্রথম ভাগে অর্থাৎ দেবখণ্ডে একটি বিশিষ্ট প্রথারূপেই বর্তমান ছিল।

গোরক্ষবিজয় আখ্যানে দেবী ভগবতীর আদি ও সংক্ষিপ্ত বন্দনাসহ সৃষ্টিতত্ত্বের বন্দনার পরেই এসেছে হর-গৌরী প্রসঙ্গ। এতে পার্বতীর চরিত্রবর্ণনা সংক্ষিপ্ততর হলেও তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও বিশেষত্বসূচক। তাৎপর্যপূর্ণ এই জন্য যে, পার্বতী দ্বারা নাথসিদ্ধাদের নৈতিক চরিত্র পরীক্ষার ছলেই প্রধান চারজন সিদ্ধার শীর্ষস্থানীয় মীননাথের পতন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, গোরক্ষনাথের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রকে নানাভাবে চেষ্টা করেও দেবী যোগভ্রষ্ট করতে পারেননি। সুতরাং গোরক্ষের নৈতিক চরিত্রবলের কাছে স্বয়ং দেবী পার্বতীও পরাজয় স্বীকার করেছেন।

গোরক্ষবিজয়ের কাহিনিতে আছে, আদ্যদেব ও আদ্যাদেবী থেকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি দেবতার সৃষ্টি হয়। গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে ডঃ সুকুমার সেন নাথপন্থার ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ধর্ম-নিরঞ্জনের 'আদ্যকথা' প্রসঙ্গটি এনেছেন। তাতে ধর্ম নিরঞ্জনের ঔরস-পুত্র হিসাবে উল্লিখিত হয়েছেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব ও কেতকা। এই জন্মান্তরিত কেতকাই পার্বতী বা চণ্ডী যাকে নিরঞ্জনের আদেশে শিব বিবাহ করেন।

একদিন পার্বতী শিবকে হাড়ের মালা পরবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে শিব বললেন যে চণ্ডী সাতবার মৃত্যুবরণ করেছেন এবং প্রত্যেকবার মৃত্যুর পর তাঁর একটি

করে হাড় থেকে গেছে। সেই স্মৃতি রক্ষার জন্যই শিবের গলায় হাড়ের মালা। তখন পার্বতী নিজের মৃত্যুর কারণ জানতে চাইলেন এবং শিবের কাছ থেকে 'মহাজ্ঞান' লাভ করতে চাইলেন—

'তুমি কেনে থাক গোসাই আমি কেনে মরি,
সেই তত্ত্ব কহ গোসাই যুগে যুগে তরি।'

তখন শিব 'মহাজ্ঞান' দান করার জন্য পার্বতীকে সমুদ্রের উপরে জলটুঙ্গিতে নিয়ে গেলেন যাতে এই গুহ্যশাস্ত্র অন্য কেউ শুনতে না পায়। কিন্তু মীননাথের কাছে তা অগোচর থাকল না। শিব যখন মহাজ্ঞান প্রদান করছিলেন, তখন পার্বতীর নিদ্রাবেশের সুযোগে মীননাথ কৌশলে মাছের পেটে আত্মগোপন করে শিব প্রদত্ত মহাজ্ঞান লাভ করলেন। পরে মীননাথ ধরা পড়লে শিব তাঁকে অভিসম্পাত দিলেন যে সংকটকালে মীননাথ চুরির দ্বারা লব্ধ বিদ্যা বিস্মৃত হবেন।

এরপর সিদ্ধ অনুচরদের ত্যাগ করে শিব উপনীত হলেন কৈলাসে। চার সিদ্ধা বিচরণ করতে লাগলেন। একদিন গৌরী শিবকে বললেন, শিব যেখানে নিজে দুটি পত্নী নিয়ে সংসারী, সেখানে শিষ্যরা বিবাহাদি না করলে ভালো দেখায় না। শিব জানালেন, তাঁর শিষ্যরা কামমুক্ত, তাই তাঁরা বিবাহাদি করবে না। গৌরী শিষ্যদের পরীক্ষা করতে চাইলে শিব ধ্যানযোগে শিষ্যদের আহ্বান করলেন। পার্বতী মোহিনীবেশ ধারণ করে চার সিদ্ধাকে কামাসক্ত করতে প্রয়াসী হলেন। আমন্ত্রিত শিষ্যদের অন্ন পরিবেশনকালে গৌরী তাঁর ছলনাজাল বিস্তার করলেন। তিনজন শিষ্যই আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন। মীননাথ ভাবলেন এমন সুন্দরী স্ত্রী পেলে 'রঙ্গকৌতুক রসে রজনী পোয়াই', হাড়িপা ভাবলেন, এমন সুন্দরী পাওয়া গেলে— 'হাড়িকর্ম করি যদি থাকি তার পাশ'। কানুপার মনে হল, এমন সুন্দরী রমণী লাভ করলে তিনি মৃত্যুকেও ভয় পাবেন না। পরিশেষে যতিশ্রেষ্ঠ গোরক্ষনাথ দেবীকে দেখে—

'তবে ভাবিলেক মনে গোর্খে করি সার।
এমত জননী যদি থাকএ আমার।।
তাহার কোলেতে বসি সুখে দুগ্ধ খাই।
এমত জননী যদি কভু আমি পাই।'

গোরক্ষনাথের নিকট দেবীর ছলাকলার পরাজয় হল। দেবী গোরক্ষকে কঠিনতর পরীক্ষা করতে মনস্থ করলেন। তিনি তখন গোরক্ষনাথের চলাচলের পথের মধ্যে বিবস্ত্রা হয়ে লালসাময়ীরূপে শায়িত হয়ে রইলেন। দেবীকে সেরকম অসম্বৃত অবস্থায় দেখে গোরক্ষনাথ ভাবলেন, 'অতিবড় লঘু বেটি কিকর্ম করিল', এবং বিবস্ত্রা দেবীকে বৃক্ষপত্র দ্বারা আবৃত করে লজ্জানিবারণ করলেন। গৌরী তখন পরাস্ত ও লজ্জিত হয়ে গোরক্ষকে শাস্তি দেওয়ার জন্য গোরক্ষের উদরে প্রবেশ করলেন। বুঝতে পেরে গোরক্ষ যোগবলে দশমী দুয়ার বন্ধ করলেন, দেবীর কাকুতি মিনতিতে শেষপর্যন্ত তাঁকে মুক্ত করলেন যতিশ্রেষ্ঠ গোরক্ষনাথ, কিন্তু মুক্ত হওয়ার সময় দেবীর 'কাঁকাল' ভেঙে গেল।

গোরক্ষনাথ ও মীননাথের কাহিনিতে শিবের তুলনায় পার্বতীর চরিত্র অধিকতর সুপরিস্ফুট হয়েছে। একান্ত স্বাভাবিক নারীমানসিকতায় তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না যে, কোনো পুরুষ কামভাবশূন্য হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার মতো তিনি কোনো বিশেষ পুরুষকে লাভ করতে চান না; তিনি পুরুষের শক্তি পরীক্ষা করে

দেখতে চান। এই ক্রূর কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই তিনি সিদ্ধাদের সাধক-জীবনের সর্বনাশ করলেন। গোরক্ষনাথের কাছে তাঁর এই শক্তি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় দেবী ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে নারীজীবনের চরম লাঞ্ছনা স্বীকার করেও গোরক্ষনাথকে যে চরম পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন, গোরক্ষনাথ তাতেও উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু এর ফলে পার্বতী নিজে যে নৈতিকস্তরে অধঃপতিত হলেন, তা থেকে তাঁর আর উদ্ধার পাওয়ার উপায় রইল না।

মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী-চরিত্রের সঙ্গে নাথ-গীতিকার পার্বতী চরিত্রের তুলনা করলে দেখা যায়— মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী ক্রূরা, প্রতিহিংসো-পরায়ণা ও দাম্পত্য-কলহপ্রিয়া। নাথ-গীতিকার পার্বতী চরিত্রে ক্রূরতা বা দাম্পত্য-কলহপ্রিয়তার পরিচয় নেই বটে, তবে প্রতিহিংসো-পরায়ণতার দিক দিয়ে মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীর সঙ্গে নাথ গীতিকার পার্বতীর বিশেষ পার্থক্য নেই। তবে মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীর নৈতিক রুচি উন্নততর, কিন্তু নাথ গীতিকার পার্বতী নৈতিক রুচির দিক থেকে নিতান্তই গ্রাম্য প্রকৃতির।

আসলে গোরক্ষবিজয় কাব্যটি তো দেবদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য নয়; এতে মানবচরিত্রের মহিমাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর সে ক্ষেত্রে পার্বতীর চরিত্রের অবচেতন মানস উদ্‌ঘাটনের অন্তর্লীন অভিব্যক্তিগুলিই একটা প্রধান বিশেষত্ব লাভ করেছে। এই পার্বতী বাংলার সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর কুলবধূ, কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যদীপ্ত স্বাধীন নারী। মধ্যযুগে বাঙালি নারীর এই স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত চরিত্র হয়তো মঙ্গলকাব্য-যুগেরই বৈশিষ্ট্যবহ। কিন্তু যা মঙ্গলকাব্যেও অনুপস্থিত, তেমন একটি বিরলদৃষ্ট বিশেষত্ব এখানে পার্বতী চরিত্রে প্রকাশিত। তা হল নারীর অবদমিত কামনার অবচেতন প্রকাশ— যা শিবের শিষ্যদের পরীক্ষার ছলে প্রকটিত হয়েছে। বিশেষভাবে গোরক্ষনাথের বিরুদ্ধে পার্বতীর মোহিনী ছলাকলায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি পার্বতী মূর্তি মধ্যযুগের কাব্য-ইতিহাসে অমর হয়ে রইল।

২.৬.৪ শিব

নাথ-গীতিকায় যে শিবের পরিচয় আমরা পাই তিনি সংস্কৃতপুরাণের শিব নন। এমনকি মঙ্গলকাব্যের শিবও নন। তিনি উত্তর ও পূর্ববঙ্গের কৃষকের এক নিজস্ব সৃষ্টি। নাথ-গীতিকায় তাঁর যে পরিচয় প্রকাশিত তাতে দেখা যায় তিনি কোনো আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নন। তিনি সাধারণ মানবিক অনুভূতির দাস মাত্র। গোরক্ষনাথ ছাড়া অন্য শিষ্যগণ তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারেননি। কিন্তু এজন্য গোরক্ষনাথের প্রতি তাঁর কোনো বিশেষ স্নেহ ছিল না। উপরন্তু পার্বতীকে বারবার পর্যুদস্ত করায় গোরক্ষনাথের প্রতি শিবের এক আক্রোশ জাগ্রত হয়।— তিনি গোরক্ষকে তাঁর আদর্শচ্যুত করার জন্য বিরহিণীকে গোরক্ষকেই স্বামীরূপে লাভ করার বর দিলেন। কিন্তু গোরক্ষনাথ শিবের কৌশল ব্যর্থ করে প্রমাণ করলেন যে, তিনি শিবের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

পার্বতীর অন্বেষণে শিব যখন গোরক্ষনাথের কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, 'কোথা গেল মোর নারী তুমি কি করিলা?' তখন গোরক্ষনাথ শিবের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন—

'ভাঙধুতুরা খাও কি বলিব তোরে,
কথাত হারাইছ নারী ধর আসি মোরে।।'

একথায় শিব অপমানিত হয়ে প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার উপায় সন্ধান করতে লাগলেন। গুরুশিষ্যের সম্পর্কের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। শিবের দেবত্ব এখানেই লুপ্ত হল এবং তাঁর মধ্যে এক সহজ মানবিকতার বিকাশ হল।

মঙ্গলকাব্যে শিবের যে চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাতে দেখা যায়— মঙ্গলকাব্যের শিব ব্যভিচারী ও লম্পট, ঐহিক অভাব-অনটন নিপীড়িত ও কোপন-স্বভাবা স্ত্রী চণ্ডী কর্তৃক সদালাঞ্ছিত। কিন্তু নাথ গীতিকার শিবের নৈতিক চরিত্র দৃঢ়, সাংসারিক অভাব তিনি অনুভব করেন না; আর মঙ্গলকাব্যের বহুখ্যাত হর-গৌরীর সংসারযাত্রার দুর্বিষহ দাম্পত্যকলহ ব্যাপারটিও এখানে অনুপস্থিত। মঙ্গলকাব্যের শিব ভক্তের ঐহিক সুখদুঃখে নির্বিকার, কিন্তু নাথ গীতিকার শিব নির্বিকার নন— গোরক্ষনাথের প্রতি শিবের আক্রোশ সঞ্চারে তা প্রমাণিত।

বস্তুত দেবতা সম্বন্ধে গীতিকার কবিদের কোনো শ্রদ্ধাবোধ ছিল না বলেই তাঁদের চিত্রিত দেবতা চরিত্রে দৈবীমহিমা অনুপস্থিত, লোকসাহিত্যের কোনো বিভাগেই দেবতার কোনো অস্তিত্ব অনুভূত হয় না, লোকসাহিত্যের সর্বত্রই একমাত্র সত্য মানব; নাথ গীতিকাও এর ব্যতিক্রম নয়। পল্লির কবিদের সামনে দেবতাচরিত্রের কোনো 'মডেল' ছিল না, পরিবর্তে পার্থিব নর-নারীই সর্বদা তাঁরা প্রত্যক্ষ করতেন এবং মানবমহিমাই আন্তরিকভাবে অনুভব করতেন। সেজন্যই গীতিকায় দেব চরিত্র অপেক্ষা মানবচরিত্র অধিকতর মহিমামণ্ডিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, দেবতারও ঘটেছে মানবায়ন।

২.৭ গোরক্ষবিজয়ে প্রতিফলিত সমাজচিত্র

গোরক্ষবিজয় নাথ যোগীদের সাধনতত্ত্বের গুহ্য কায়াসাধনা প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ। সুতরাং যে গ্রন্থ শুধু একটি ধর্মসম্প্রদায়ের নিগূঢ় তত্ত্বের বাহক, তাতে সমাজচিত্র ও মানবচরিত্রের প্রতিফলনের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে নিছক গুহ্য তত্ত্ব প্রকাশেই আলোচ্য গ্রন্থের যবনিকা টানা হয়নি। এখানে মানব চরিত্র এসেছে, এসেছে তৎকালীন সমাজ। আর এরই ফলস্বরূপ গোরক্ষবিজয় গ্রন্থটির একটি প্রায় প্রধান রস হয়ে উঠেছে মানবরস। সিদ্ধা মীননাথের কামকূপে পতন এবং এক কামশূন্য শক্তিশালী চরিত্রের ধারক গোরক্ষনাথ নানা প্রতিকূল বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে আপন গুরু মীননাথকে উদ্ধারের কাহিনি এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এতে কাহিনির আনুষঙ্গিক হিসাবে এসেছে কদলীরাজ্য, বিচিত্র নরনারীর চরিত্র সকল। দ্বিতীয়ত, এটা মনে রাখতে হবে যে গোরক্ষবিজয় যদিও ধর্মতত্ত্বের বাহন এবং সে ধর্ম ব্যক্তিক সাধনার বিষয়, তথাপি তা একটা সামাজিক ধর্ম। শুধু বাংলার নাথ সম্প্রদায় নয়, বিশাল ভারতের একটা বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং এই সাম্প্রদায়িক ধর্মের উপস্থাপনায় সমাজও যে কিছুটা অংশগ্রহণ করে তাতে আর সন্দেহ কী।

গোরক্ষবিজয়ে যে জীবন বিধৃত হয়েছে তা লৌকিক জীবন। কবিরাও গ্রাম্য ছিলেন বলে মনে হয়। এতে দেবদেবীর আচার আচরণেও একটা গ্রাম্যতা ফুটে উঠেছে, যা আমরা বর্তমান কালেও বাংলার অশিক্ষিত গ্রাম্য অঞ্চলের নরনারীর হাসিঠাট্টায় প্রকাশিত হতে দেখি। গৌরী এখানে দেবী হওয়া সত্ত্বেও পুত্রবৎ গোরক্ষনাথকে পরীক্ষা করতে গিয়ে একটা কলুষময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন। অমার্জিতভাবে সেকালের সমাজে

কীভাবে কামলিপ্সা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত তার পরিচয় আমরা চার সিদ্ধার মনোভাবের বিশ্লেষণে অনুভব করতে পারি।

এখানে যে কদলীরাজ্যের বর্ণনা আছে তা একদা কাছাড় তথা মণিপুর অঞ্চলে ছিল বলে পণ্ডিত মহলের ধারণা। (এখানে রমণীরাজ্যকে কদলীরাজ্য বলায় মনে হয় নারীর ভোগের দিক, যৌবনের দিক তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়, কলাগাছের বৃদ্ধির সঙ্গে তার তুলনা করা যেতে পারে। অনেক সময় বহুসংখ্যক ছেলেমেয়ের পিতাকে কলাগাছের বাপ বলা হয়।) যাই হোক, এই নারীসমাজের চিত্রণ অনেকে অনার্যমূল মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-প্রভাবিত বলে মনে করেছেন। এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাব আমরা পূর্ববঙ্গ গীতিকা তথা মৈমনসিংহ গীতিকায় লক্ষ করেছি। তবে তাদের বেশ-ভূষার মধ্যে যদিও কামোত্তেজক অনেক কিছু আছে, তথাপি তাতে যে একটা উন্নত সমাজের পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা অস্বীকার করা যায় না। এই সমাজের পরিচয় আমরা মনসামঙ্গলে পেয়েছি—

"কদলীএ কৈল বেশ শিরেতে লম্বিত কেশ
করবী বান্দিল ঠমকে
পরিধান পুষ্পমালা কবরী শোভিছে ভালা
যেন দেখি বিজুলি চমকে।
গুরুতর পয়োধর তাথে দোলে রত্নহার
হস্তপদ জ্বলয়ে উজ্বলে
কটি দেশে কিঙ্কিনী চরণে নূপুর ধ্বনি
দেখিয়া মুনির মন টলে।"

ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে গোরক্ষনাথের লঙ্গ মহালঙ্গ সহ কদলীরাজ্যে প্রবেশের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের আচার আচরণ ফুটে উঠেছে।—

"গলে তিন গুণ দিল কপালেতে ফোঁটা।
মাথেতে আলগা ছাতি লঙ্গে লইল লোটা।।"

এছাড়া তৎকালে ব্রাহ্মণ দেখলে যে সকলে প্রণাম করত এবং ব্রাহ্মণকেও দীর্ঘ আশীর্বচন নিক্ষেপ করতে হত তার পরিচয়ও এর মধ্যে পাই।

সেকালে যোগীসম্প্রদায় বিরোধী একদল, যোগীদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার করত তার পরিচয় আমরা পাই কদলীরাজ্যে যোগীদের উপর অত্যাচারের বর্ণনায়—

"লাখে লাখে যোগী সব ফেলাইল মারি।
মরা যোগীর গন্ধে পথে চলতে না পারি।।"

এছাড়া আরও আছে—

"বুঢ়া যোগী পাইলে চাপড়ে ভাঙ্গে গাল,
গাভুর যোগী পাইলে কোমরে তুলি কাটে,
পোলা বস্যা পাইলে পাটাতে তুলি বাটে।"

এবং এই অত্যাচারীরা যে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত তা গোরক্ষের রূপমুগ্ধ নারীর কথায় শুনতে পাওয়া যায়—

'নিতি নিরামিষ্য খাই ব্রাহ্মণী যোগিনী হই।'

নাথ যোগীদের সাধারণ বেশ-চিহ্ন হচ্ছে কানে কুণ্ডল এবং গলায় নাদবিন্দু ধারণ। কুণ্ডল হত শাঁখের অথবা গণ্ডার শৃঙ্গের। নাদ হচ্ছে নিরঞ্জনের পদচিহ্ন অথবা অনুরূপ কোনো লাঞ্ছনা। বিন্দু হচ্ছে কৃষ্ণবর্ণ উর্ণাসূত্র যাতে নাদ গাঁথা থাকত। জটাভার বহন অথবা মস্তকমুণ্ডন এবং অঙ্গে ভস্ম লেপন ছিল গোষ্ঠীগত রীতি।

ব্রহ্মচর্যের উপর নাথ সম্প্রদায়ের জোর ছিল সবচেয়ে বেশি। নাথপন্থের ঐতিহ্যে যার পরিচয় রয়েছে পদে পদে, নারীর ও নারীদেবতার নিন্দায়। গোরক্ষবিজয়ের উপক্রমণিকায় গোরক্ষনাথের হাতে গৌরীর লাঞ্ছনায় এর তীব্র অভিব্যক্তি। লক্ষ্মণের অনিলপুরাণে দেবদেবীর কুৎসায় মুখর শান্তনুমুনির উক্তিতে এমনই নারীবিদ্বেষের প্রত্যক্ষ আভাস রয়েছে।

যোগীরা তন্ত্রানুযায়ী বকুলগাছকে কুলবৃক্ষ বলে মেনেছেন। যোগীরা শব দাহ না করে 'মাটি' দিতেন। মীননাথের উক্তিতে শুনি— 'আমি মৈলে তুমি আসি দিয় মোরে মাটি।'

তৎকালীন সামাজিক চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে গোরক্ষনাথের প্রতি কদলীরাজ্যের জনৈকা মহিলার প্রেম নিবেদনের ভিতর দিয়ে। ব্রাহ্মণী যোগিনী হলে যে নিরামিষ খেতে হয় তার আভাস আমরা পাই তাঁর উক্তিতে—

"নিত্য নিরামিষ্য খাই ব্রাহ্মণী যোগিনী হই
চল যোগী আমার বাড়ীত।"

তৎকালের সমাজে যে সুতা কেটে কাপড় বোনার প্রচলন ছিল তাও এই রমণীর উক্তিতে ফুটে ওঠে। তবে আমরা চর্যাপদের সমাজেও এই সুতা কাটা ও কাপড় বোনার প্রচলন যে ছিল তা আগেই জেনেছি। এখানে শুনি—

"আহ্মারে কাটিমু সুতি তুহ্মি যে বুনিবা ধুতি
হাট নিলে বেচিলে হবে কড়ি,"

সেকালে যে গ্রামের সম্মানিত ব্যক্তিরা আপন প্রভাববশত হাত নেড়ে কথা বলে সমাজে আপন ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্যকে প্রকাশ করতেন তারও ইঙ্গিত আমরা পাই—

"যখনে সমাজে যাইবা মৈদ্যঘটি মান্য পাইবা
কথা কইবা দুই হাত নাড়ি।"

সেকালে নর্তকীর নৃত্য এবং যাত্রাগানের প্রচলন সমাজে ছিল। গোরক্ষনাথ যখন নটীর বেশে কদলীর দেশে যান তখন 'নাটুয়া নগরে গিয়া করিলেন্ত ভাও।' এখানে 'ভাও' বা 'ভাওনা' হচ্ছে যাত্রাগান। নর্তকীর নৃত্য, সঙ্গে মাদলবাদ্য, মাদলের মধ্যে 'বুলি'-কে স্পষ্ট করে তোলা ইত্যাদি বিষয় গোরক্ষনাথের কদলীর দেশে আচরণের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। নর্তকীর সাজসজ্জাও আধুনিক বলে মনে হয়—

"গলাতে দিলেন নাথ সাতছড়ি হার।
করেতে কঙ্কণ দিল অতি শোভাকর।।

কপালে তিলক দিল নয়ানে কাজল।।
করণেতে দিল নাথ সুবর্ণের কুণ্ডল।।
পায়েতে নূপুর দিল কনক উথটি।
গায়েত কাঞ্চলি কোমরে কাছটি।।"

গোরক্ষনাথ যখন শূন্য থেকে কদলীরাজ্য পরিদর্শন করেছিলেন, তখন সে রাজ্যের যে বর্ণনা আমরা পাই—

"কদলীর প্রজাএ পেয়ে পাটের পাছড়া।
প্রতি ঘরে চালে দেখি সোনার কোমড়া।।
কার পুষকর্নীর জল কেহ নাই খায়ে।
মণিমাণিক্য তারা রৌদ্রেতে সুখায়ে।।

....

সুবর্ণের ঘরদ্বার রত্ন বিভূষিত।
দেশের নিবাসী যত সুবর্ণে ভূষিত।।"

এছাড়া 'সোনার কলসে সবে লোকে খাএ পানি' ইত্যাদি ঐশ্বর্যব্যঞ্জক বর্ণনা থেকে তৎকালীন সামাজিক সমৃদ্ধির আভাস পাওয়া যায়। পঞ্চানন মণ্ডল মহোদয় মন্তব্য করেছেন, "যোগীরাজ্যে সোনার কোমড়া যোগীদের সমৃদ্ধির ব্যঞ্জক হইতে পারে অথবা ঘরের চালের স্বর্ণময় অংশ বিশেষ হইতে পারে।" কিন্তু কদলীরাজ্য যে যোগীরাজ্য ছিল তার কোনো প্রমাণ গ্রন্থে নেই। সেখানে মৃত যোগীর গন্ধে পথ চলাই দায়। মীননাথ সে রাজ্যে ছিলেন যোগী হয়ে নয়, ভোগকারী হিসাবে। আর গোরক্ষনাথকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে কদলী রমণী যে নিজেকে যোগী বলে পরিচয় দিয়েছে সে 'যোগী' নিশ্চয় নাথ যোগী নয়।

পরিশেষে বলা যায় একটি বিশিষ্ট সাধনপন্থার প্রাকরণিক নির্দেশ সম্বলিত এই কাব্যে প্রকীর্ণ নানা খণ্ডচিত্রের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ-পরিবেশের যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তা কবির জীবনাভিজ্ঞতারই পরিচায়ক।

২.৮ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

গোরক্ষবিজয়ের সামগ্রিক আলোচনার শেষে আমাদের বক্তব্যকে সংহত করলে আমরা দেখব যে, নাথ ধর্ম ও সাধনা মূলত দেহকেন্দ্রিক, চিত্তবৃত্তিনিরোধই এর প্রধান লক্ষ্য। শিবকে কেন্দ্র করে যে মোক্ষাভিপ্রায়ী যোগাবলম্বী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল তাঁরাই নাথযোগী নামে পরিচিত। শিব তাঁদের আদিগুরু, তবে গোরক্ষনাথ এঁদের প্রধান আচার্য।

গোরক্ষবিজয়ের অভিনবত্ব হচ্ছে— এতে গুরু মীননাথ অপেক্ষা শিষ্য গোরক্ষনাথের গৌরবই বেশি প্রচারিত হয়েছে। নীতিভ্রষ্ট গুরুকে গোরক্ষনাথই সাধনার মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনেন। যোগশাস্ত্রে বিন্দুধারণ বা বিপরীতে বিন্দুসঞ্চরণ মোক্ষের একমাত্র উপায়। মীননাথ সেই অমূল্য সম্পদ নষ্ট করেছেন। গোরক্ষনাথ প্রহেলিকা আবৃত্তি করে, গুরুর কাছে যোগাচার ব্যাখ্যা করেন। বস্তুত গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে নাথপন্থার বিশিষ্ট ক্রীয়া-কর্মের প্রাকরণিক নির্দেশই গোরক্ষনাথের মুখে রূপক-প্রহেলিকার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে।

গোরক্ষনাথ চরিত্রে গুরুর প্রতি অচলা ভক্তির পাশাপাশি অতুলনীয়, অবিচলিত সংযম প্রকাশিত হয়েছে। তবে চরিত্রটিতে আদর্শবাদের প্রবল্যের ফলে চরিত্রটির মানবিক আবেদন অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তুলনায় মীননাথ চরিত্র অধিকতর প্রাণবন্ত ও বহুলাংশে মানবিক গুণ-সমৃদ্ধ। দেবতা চরিত্রগুলিরও এই কাহিনিতে মানবায়ন ঘটেছে। পার্বতী চরিত্রে অবদমিত কামনার অবচেতন প্রকাশ ঘটেছে।

গোরক্ষবিজয়ে তৎকালীন লৌকিক জীবন ছায়াপাত করেছে। কদলীরাজ্যের বর্ণনায় ধরা পড়েছে অনার্যমূল মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামো। তা ছাড়া বিধি-কৃত্য, ক্রীয়া-কর্মের বর্ণনাও গোরক্ষবিজয়ের বহু স্থানে পাওয়া যায়।

২.৯ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

পতঞ্জলি : বিখ্যাত যোগশাস্ত্র প্রণেতা ও দার্শনিক। পাতঞ্জলদর্শন নামক যোগশাস্ত্রের রচয়িতা।

ষড়দর্শন : পূর্বমীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক— এই ছয় প্রকার দর্শনশাস্ত্রের সমাহার।

কায়াবাদ : দেহকেন্দ্রিক সাধনতত্ত্ব।

বেদান্ত : ব্যাস প্রণীত দর্শনগ্রন্থ। এতে ব্রহ্মের স্বরূপাদি নির্ণীত হয়েছে।

সুফি : মুসলমানদের একটি সম্প্রদায় যাঁরা ঈশ্বরকে প্রেমাস্পদ হিসাবে উপাসনা করেন।

ভক্তমাল : বৈষ্ণব চরিতগ্রন্থ। এতে বহু ভক্তচরিত্রের সঙ্গে ভগবত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

শূন্যপুরাণ : রামাই পণ্ডিতের কাব্য। শূন্যবাদ ও ব্রহ্মজ্ঞান বর্ণনা করাই এর উদ্দেশ্য। শূন্যমূর্তি ধর্মের উৎপত্তি, ধর্ম থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উদ্ভব, প্রকৃতির জন্ম, জলপ্লাবন, রাজা হরিশচন্দ্রের ধর্মপূজা ইত্যাদি এতে বর্ণিত হয়েছে।

সন্ধ্যাভাষা : হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষা, সম্যক অভ্যাসের দ্বারাই এই বিশেষ রীতির ভাষার অর্থ বোধগম্য হয়।

ধীরোদাত্ত নায়ক : নিরহংকার ও সুখে-দুঃখে অবিচল নায়ক।

বেনিয়নের Pilgrims Progress : জন বেনিয়নের লেখা বিখ্যাত রূপকগ্রন্থ। বহু প্রলোভন, ভ্রম ইত্যাদি জয় করে কাহিনির নায়ক কী করে এক আদর্শ জগতে এসে পৌঁছয়— এই গ্রন্থে সে কাহিনিই বর্ণিত হয়েছে।

সাধ্যসাধনতত্ত্ব : বৈষ্ণব দর্শনে ভক্তের উদ্দিষ্টকে বলা হয়েছে সাধ্য এবং সেই উদ্দিষ্টকে লাভ করার যে উপায় বা পন্থা তা হচ্ছে সাধন। এই সাধ্য এবং সাধনপন্থার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই সাধ্যসাধনতত্ত্ব।

টলস্টয় : রাশিয়ার বিখ্যাত সাহিত্যিক ও রাজনীতিক। ওয়ার অ্যান্ড পিস, আনা কারেনিনা, রেজারেকশান ইত্যাদি বিখ্যাত গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। ঈশ্বর-বিশ্বাস ও মানবপ্রেম তাঁর রচনার মূল সুর।

২.১০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

১। নাথ ধর্মের স্বরূপ বিবৃত করুন। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যে নাথ ধর্ম কথখানি অনুসৃত হয়েছে আলোচনা করুন।

২। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যে সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্র কোনটি এবং কেন, বুঝিয়ে লিখুন।

৩। 'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থে কাব্যিক উৎকর্ষ কিছু আছে কি না আলোচনা করুন।

৪। 'গোরক্ষবিজয়' বিশ্লেষণ করে নাথধর্মের সম্যক পরিচয় দিন।

৫। 'গোরক্ষবিজয়' অনুসরণে গোরক্ষনাথের চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

৬। নাথ ধর্মের সঙ্গে শৈব-আখ্যানের সম্পর্ক আদ্যন্ত ব্যাখ্যা করুন।

৭। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যটিকে গীতিকা বলে অভিহিত করা হয়েছে কেন? কাব্যটির বিষয়বস্তু অবলম্বনে এ সম্পর্কে আপনার মতামত উদ্ধৃতি সহযোগে ব্যক্ত করুন।

৮। নাথ সাধনার যে আভাস-ইঙ্গিত 'গোরক্ষবিজয়'-এ পরিলক্ষিত হয় তা উপযুক্ত উদ্ধৃতি সহযোগে বিশদভাবে আলোচনা করুন।

৯। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যে পার্বতীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন। এবং এ প্রসঙ্গে তাঁকে কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা যায় কি না উল্লেখ করুন।

১০। গোরক্ষনাথের চারিত্রিক মাহাত্ম্যের পরিচয় দিন এবং প্রসঙ্গক্রমে তাঁর আচার-আচরণে নাথধর্ম সাধনার যে লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় তা উদাহরণ সহযোগে বিশদভাবে ব্যক্ত করুন।

১১। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যে গুরুবাদ কীরূপ অভিব্যক্তি লাভ করেছে, আলোচনা করুন।

১২। 'গোরক্ষবিজয়ে' মানবিক আবেদন কথখানি যে বিষয়ে আলোচনা করুন।

১৩। 'গোরক্ষবিজয়' কোন সময়ের রচনা তা নির্ণয় করার চেষ্টা করুন।

১৪। 'গোরক্ষবিজয়' অবলম্বনে গোরক্ষনাথের চরিত্র বিশ্লেষণ করুন। গুরু মীননাথের চরিত্রের সঙ্গে এ চরিত্রের পার্থক্য কোথায়?

১৫। কোন গুণে 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যখানি মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ইতিহাসে অভিনব সংযোজন তা আলোচনা করুন।

১৬। 'গোরক্ষবিজয়'-এ তত্ত্ব প্রাধান্য মানবিক আবেদনকে একেবারে অভিভূত করেনি। উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহ মন্তব্যটির যাথার্থ্য বিচার করুন।

১৭। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্য অবলম্বনে গোরক্ষনাথের অসীম ধৈর্য, অটল অধ্যবসায় ও অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের পরিচয় দিন।

১৮। 'গোরক্ষবিজয়ে'র গল্পটি বড়ো দুর্বল, এতে কার্যকারণ শৃঙ্খলাও তেমন রক্ষিত হয়নি। আলোচনা করুন।

১৯। 'গোরক্ষবিজয়ে' হরপার্বতীর যে সব বৃত্তান্ত আছে সেগুলি কতদূর শাস্ত্রসম্মত, বিচার করুন।

২০। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের প্রতিপাদ্য কী, বিশ্লেষণ করুন।

২১। "গোরক্ষবিজয়ে' মানবমহিমা উন্নততর হলেও দেব-দেবীর চরিত্রে উচ্চতর ভাবাদর্শ বিশেষ রক্ষিত হয়নি।' গোরক্ষনাথ এবং হর-পার্বতীর চরিত্র অবলম্বনে মন্তব্যটির যাথার্থ্য বিচার করুন।

২২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন/টীকা লিখুন—

(ক) গোরক্ষবিজয়ের রচনাকাল সম্পর্কে একটি টীকা প্রস্তুত করুন।

(খ) টীকা লিখুন— নাথ ধর্মের গুরু পরম্পরা; কদলী রাজ্য।

(গ) প্রসঙ্গ নির্দেশ করে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন— "তালি দিয়া বৈসে নাথ দশমী দুয়ারে।"

(ঘ) পুত্রের মৃত্যুতে মীননাথের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

(ঙ) 'মোর গুরু মহাদেব জগত ঈশ্বর।
গঙ্গা গৌরী দুই নারী থাকে নিরন্তর।' —তাৎপর্য নির্দেশ করুন।

২.১১ প্রসঙ্গ পুস্তক (References/Suggested Readings)

১। নাথ ধর্ম ও সাহিত্য— প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী।

২। বাংলার লোকসাহিত্য— আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৩। বাংলার নাথসাহিত্য— সুখময় মুখোপাধ্যায়।

৪। গোরক্ষবিজয়— সম্পাঃ পঞ্চানন মণ্ডল।

৫। বাংলার বাউল ও বাউল গান— উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

* * *

তৃতীয় বিভাগ
মৈমনসিংহ গীতিকা
(মহুয়া, কাজলরেখা, চন্দ্রাবতী, লীলা ও কঙ্ক, দেয়ানা মদিনা)

বিষয় বিন্যাস ঃ

৩.০ ভূমিকা (Introduction)
৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
৩.২ গীতিকা ঃ সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
৩.২.১ ভারতীয় গীতিকা সাহিত্য
৩.৩ মৈমনসিংহ গীতিকা ঃ সামগ্রিক পরিচিতি
৩.৪ মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রতিফলিত সমাজচিত্র
৩.৫ মৈমনসিংহ গীতিকায় নাট্যলক্ষণ
৩.৬ মৈমনসিংহ গীতিকায় উপন্যাসলক্ষণ
৩.৭ মৈমনসিংহ গীতিকায় নারী-প্রেমের স্বরূপ
৩.৮ মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রকৃতির প্রভাব
৩.৯ গীতিকা ও রূপকথা
৩.১০ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
৩.১১ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)
৩.১২ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি
৩.১৩ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৩.০ ভূমিকা (Introduction)

মৈমনসিংহ এবং পূর্ববঙ্গের নানাস্থান (ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রাম) থেকে যে পালাগুলি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। দীনেশচন্দ্র সেনের আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই এই গাথা-গীতিকা সাহিত্যের প্রচার-ব্যাখ্যান সম্ভবপর হয়েছে। তাঁরই ঐকান্তিক আগ্রহে ও প্রয়াসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে এই পালাগুলি প্রকাশিত হয়েছে এবং আধুনিক যুগের পাঠকদের মনে সপ্রশংস কৌতূহল সঞ্চার করেছে। মৈমনসিংহের অধিবাসী কবি চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক সংগৃহীত এই পালাগুলি দীনেশচন্দ্র সেনের সুযোগ্য সম্পাদনায় মৈমনসিংহ গীতিকা নামে প্রকাশিত হয়।

মৈমনসিংহ এবং পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সংগৃহীত পালাগুলি Ballad বা গীতিকাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজি Ballad শব্দটি ল্যাটিন Ballare শব্দ থেকে এসেছে— যার অর্থ নৃত্য। প্রাচীন-যুগে পাশ্চাত্য যে সমস্ত কাহিনি নৃত্যগীত সহযোগে পরিবেশন করা হত সেগুলিকেই Ballad বলা হত। এসব কাহিনির উপাদান সংগৃহীত হত চিরপরিচিত জীবন থেকেই। এগুলি লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। কোনো একটি নাটকীয়

ধরনের দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রেম-প্রণয় বা দ্বন্দ্ব-কলহ-সংঘর্ষঘটিত স্থানীয় কাহিনি পুরাতন গীতিসাহিত্যের পটভূমি। অবশ্য অধ্যাত্মচেতনা, অলৌকিকতা, অদ্ভুত ব্যাপারও ব্যালাডে কিছু কিছু দেখা যায়। তবে মর্তজীবনের ভালো-মন্দ, আলো-ছায়ার লীলাই গাথা-গীতিকার প্রধান ভিত্তিভূমি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গীতিকা সাহিত্যের সামান্য ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। মঙ্গলকাব্যের অনেকটাই প্রাচীন গাথাসাহিত্যের ঐতিহ্যের অনুসারী। নাথসাহিত্যকেও অনেকে নাথগীতিকা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তবে যথার্থ বিশুদ্ধ গাথা গীতিকা সাহিত্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল এযুগে প্রকাশিত মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গগীতিকায়। এর শ্রেষ্ঠ আখ্যায়িকাগুলি মর্তপ্রেমের অশ্রুবেদনায় ভরপুর। প্রাচীন পাশ্চাত্য ব্যালাডের অনেকগুলিতে ব্যর্থপ্রেমের রক্তাক্ত প্রতিহিংসা এবং জিঘাংসাই প্রধান স্থান লাভ করেছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গ থেকে প্রাপ্ত গীতিকাগুলিতে প্রেমের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও বেদনা অধিকতর বিশিষ্টতা লাভ করেছে। মধ্যযুগের উপান্তভূমিতে রচিত এই গীতিসাহিত্যগুলিতে হিন্দু-মুসলমানের অসাম্প্রদায়িক হৃদয়বৃত্তির অপূর্ব সমন্বয় ফুটে উঠতে দেখা যায়। এই দৃষ্টান্ত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অন্যত্র বিরল।

আসুন, আমাদের আলোচনার শুরুতেই গীতিকার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যাক।

৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই উপবিভাগে আমরা বাংলা সাহিত্যের এমন একটি ধারার সঙ্গে পরিচিত হব, যা লোকসাহিত্যের অন্তর্গত এবং যা সাধারণভাবে মৌখিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত; যদিও পরবর্তীকালে তা লিখিত আকারেই প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এখানে গীতিকা সাহিত্যের স্বরূপ-লক্ষণ চিহ্নিত করে, সাধারণভাবে গীতিকার সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ডেই ভারতীয় গীতিকা তথা মৈমনসিংহ গীতিকার আলোচনা করব। আমরা মৈমনসিংহ গীতিকায় সমালোচক-কথিত নাট্যগুণ এবং উপন্যাস লক্ষণের অনুসন্ধান করব। এই প্রেমমূলক গাথা সাহিত্যে নারীর প্রেমের শক্তিমত্তার দিকটি আমরা আবিষ্কার করার চেষ্টা করব। রূপকথাও যেহেতু মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্গত, তাই গীতিকার রূপকথাধর্মিতার প্রসঙ্গটিও আলোচনা করব এবং সেইসূত্রে আমাদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত পালাগুলির মধ্যে কোন কোন পালা রূপকথার লক্ষণাক্রান্ত, তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করব।

৩.২ গীতিকা : সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

গীতিকা এক শ্রেণির আখ্যানমূলক লোকগীতি। ইংরেজিতে এই জনশ্রুতিমূলক বিষয়ভিত্তিক গেয় কবিতাগুলিকে ব্যালাড (Ballad) বলা হয়। বিভিন্ন দেশে গীতিকার বিভিন্ন নাম আছে। যেমন ডেনমার্কে Vise, স্পেনীয় ভাষায় Romance, রুশ-Bylina, উইক্রেনীয়-Dumi, সাইবেরীয়-Junacka pesme, ইত্যাদি। ইংরেজ সমালোচক গীতিকার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন—

"A ballad is a folk song that tells a story with stress on the curcial situation, tells it by letting the action unfold itself in event and speech and tells it objectively with little comment or intrusion of personal bias"

মোটামুটিভাবে গীতিকার কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ সমালোচকরা লক্ষ করেছেন। যেমন—

(ক) গীতিকা আখ্যানমূলক কাব্য, এর কাহিনি শিথিলবদ্ধ হলে চলে না, বরং এতে থাকা উচিত দ্রুত বলে যাওয়া একটি দৃঢ়পিনদ্ধ গাল্পিক কাঠামো।

(খ) কাহিনির মধ্যেকার ক্রিয়া, theme বা বিষয়বস্তু, প্রতিবেশ সৃজন এবং চরিত্র ইত্যাদি উপাদানের মধ্যে ক্রিয়া বা Action-ই প্রধান, বাকিগুলির ভূমিকা গীতিকায় গৌণ। গীতিকা কাহিনিপ্রধান বা চরিত্রপ্রধান নয়।

(গ) গীতিকা আবৃত্ত হয় না, গীত হয়।

(ঘ) গীতিকার বিষয়বস্তু জনশ্রুতিমূলক (Traditional)।

(ঙ) প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে এর মধ্যে স্থানীয় লৌকিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে এবং একটিমাত্র লৌকিক ছন্দ ব্যবহার করা হয়।

গীতিকায় একটি সম্পূর্ণ কাহিনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এগিয়ে চলে না। বরং আনুপূর্বিক কাহিনির কয়েকটি সঙ্কট-জটিল মুহূর্তের উপর আলোক সম্পাত করে খানিকটা দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাওয়া হয়। এর ফলে কাহিনিতে বৈচিত্র্যহীনতা বা একঘেয়েমির দোষ থাকে না। বিবৃতির দ্রুতি এবং বিশেষ ক্রিয়াগুলিকে প্রাধান্য দেওয়ায় পরিবেশ ও দৃশ্যপট অস্পষ্ট হয়ে যায়। পরিবেশগত আঞ্চলিকতা গীতিকায় যেমন অপরিহার্য, তেমনি প্রতিবেশ চিত্রণে মুনশিয়ানা প্রদর্শনের চেষ্টাও অসংগত। গীতিকার সাফল্য নির্ভর করে সেই সঙ্কট-জটিল মুহূর্তগুলি নির্বাচনের উপর, যে মুহূর্তগুলির উপর তীব্র আলোক ফেলা হবে এবং আগের ও পরের 'না বলা বাণী' টুকু ধরিয়ে দেওয়া হবে।

গীতিকায় ক্রিয়া-নির্ভর গল্প হবে একটি মাত্র, অনাবশ্যক ঘটনা ও অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা বর্জন করার ফলে আনুপূর্বিক নাটকীয় চরিত্রগুলির মতো গীতিকার চরিত্রমালা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে না, একটি পরিণত চরিত্রও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তবে ঘটনাই এই জাতীয় সৃষ্টির মূল আকর্ষণ বলে এর মধ্যে কোনো ফাঁক থাকে না। আর অতিমাত্রিক action— নির্ভরতা চমৎকার নাট্যঘন মুহূর্তের জন্ম দিতে পারে, ফলে শ্রোতার মনে পরম বিস্ময়, সুগভীর কারুণ্য কিম্বা রোমহর্ষক ভীতিভাবের সৃষ্টি হয়। দ্রুতগতিতে বলে যাওয়ার দরুন আভাস-ইঙ্গিতের সাহায্য নিয়ে কাহিনির দৈর্ঘ্য ছেঁটে দেওয়া হয়; আর ইঙ্গিতের রহস্যভেদ করে কাহিনির পরিপূর্ণ রসাস্বাদনের জন্যে শ্রোতারাও ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

গীতিকা দেশীয় বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গীত হয়। অনেকটা পাঁচালির সুরের মতো গীতিকার সুর গতানুগতিক বলেই বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে; কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সুর নয় কাহিনিই এর লক্ষ্য, সুর অবলম্বন মাত্র। আবেগের তীব্র উত্থান-পতন ও নাটকীয়তা সুরের একঘেয়েমির বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকে বলেই শ্রোতারা বিরক্ত হয়ে ওঠেন না। আসলে পদে পদে রোমাঞ্চকর চমক থাকায় সুরের কথা মনে আসে না।

এখানেই সাধারণ লোকসংগীতের সঙ্গে গীতিকার পার্থক্য। লোকসংগীতে সুরই মুখ্য, কথা গৌণ; অথবা বলা যায়, কথা সুরেরই অধীন। কিন্তু গীতিকায় ঠিক বিপরীত— কথাই মুখ্য, সুর গৌণ।

গীতিকা সংহত লোকসমাজ ও লোকজীবনের ফসল। গীতিকা শিক্ষিত ও প্রায় সচেতন কবিমনের সৃষ্টি। একটি ঐতিহ্যশালী সচেতন জনসমাজের সংস্কৃতিবোধ ও শিল্পভাবনা গীতিকার স্রষ্টাকে তৈরি করে দেয়। এই সমাজের জনতা নিরক্ষর হলেও মূর্খ নয়। বরং "They are homogeneous, interested in one another in the dramatic aspects of life."

বোঝাই যাচ্ছে আদিম কিংবা আদিবাসী সমাজে গীতিকা সৃষ্টি হতে পারে না। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন— "যে সমাজ বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সঙ্গে মিশ্রণের ফলে এক সমৃদ্ধ জনশ্রুতিমূলক সংস্কৃতির অধিকারী হইয়াছে ইহা কেবল মাত্র তাহা দ্বারাই সৃষ্টি হইতে পারে— যে জাতির সাংস্কৃতিক জীবন দৃঢ়সংবদ্ধ নহে, তাহা দ্বারা ইহা কদাচ সৃষ্ট হয় না।"

গীতিকা ছোটোগল্পের মতো একটিমাত্র কাহিনি অনুসরণ করে অগ্রসর হয়, এখানেই মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এর মূলগত তফাৎ। মঙ্গলকাব্যে, একটি কেন্দ্রীয় কাহিনিধারা থাকলেও মহাকাব্যের মতোই অসংখ্য শাখা ও উপকাহিনির ভারে কাব্যটি ঢিলেঢালা ও মন্থরগামী হয়ে পড়ে। কিন্তু গীতিকায় সকল বাহুল্য সততার ও সতর্কতার সঙ্গে বর্জন করা হয়।

গীতিকা নিরক্ষর সমাজের মৌখিক সাহিত্য। কণ্ঠস্থ করে রাখার সুবিধার জন্য এতে ধ্রুবপদ বা ধুয়ার ব্যবহার আছে। ধ্রুবপদটি অনেক সময় গীত বিষয়ের অন্তর্গত নাও হতে পারে। ইংরেজি ও জার্মান গীতিকায় ধুয়া ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন থাকলেও সমালোচকরা এটিকে গীতিকার মুখ্য বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকার করেন না। কেবল স্মৃতির মধ্যে ধরে রাখা হয় বলে নতুন নতুন গায়কের মুখে পড়ে গীতিকার প্রাচীন রূপটি হারিয়ে যায়, এর গল্প কখনও উন্নত, কখনও বিকৃত হয়। শ্রোতাদের চাহিদা অনুযায়ী গল্পটির পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াও চলতে থাকে। ফলে এই জাতীয় সৃষ্টিতে ব্যক্তি বিশেষের স্রষ্টা-পরিচয় ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে গিয়ে সমাজের রুচি ও মানসিকতার পরিচয়টি ফুটে ওঠে। তখন এটিকে সমাজের ঐক্যবদ্ধ রচনা বলেই মনে হয়।

গীতিকা জাতীয় রচনা কবে ঠিক আরম্ভ হয় তা আজও গবেষণার বিষয়, তবে মোটামুটিভাবে সবাই একমত যে "culturally the ballad everywhere is post epic." দেখা যায় কোনো কোনো গীতিকার বিষয়বস্তু epic থেকে নেওয়া। গীতিকার উদ্ভব যখনই হোক না কেন এই কথা সকলেই মানেন যে, এজাতীয় সৃষ্টির মধ্যে কেবলমাত্র একটি বিশেষ সময়ের প্রকাশ নয়, বরং তা দেশ কালোত্তীর্ণ শাশ্বত মানব-অনুভবের ছবিটিই প্রকাশ করে।

৩.২.১ ভারতীয় গীতিকা সাহিত্য

ভারতীয় গীতিকাগুলিতে মোটামুটিভাবে ইউরোপীয় গীতিকার সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ রক্ষিত। তবে একটি ক্ষেত্রে ভারতীয় গীতিকার সঙ্গে অন্য গীতিকার পার্থক্য

সুস্পষ্ট, ভারতীয় গীতিকাগুলি বর্ণনা-প্রধান (Naration based), ইউরোপীয় গীতিকা ঘটনা-প্রধান (Action based)। আসলে ভারতীয় সাহিত্যে চিরকালই ঘটনা প্রবাহের পাশাপাশি প্রতিবেশ চিত্রণের ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। ভারতীয় গীতিকা অনেকটা epic ধর্মী, কাহিনি অনেক সময় গৌণ হয়। পারিপার্শ্বিক বর্ণনাই প্রাধান্য লাভ করে। বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত গীতিকাগুলিও ভারতীয় গীতিকার এই বর্ণনাত্মক ভঙ্গিটিকেই ধরে রেখেছে।

ভারতীয় গীতিকাসমূহের এই বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে পাশ্চাত্য গীতিকাগুলির সঙ্গে তার কোনো বিশেষ পার্থক্য থাকে না। তবে, পূর্বের প্রসঙ্গ ধরে বলা যাতে পারে যে, গীতিকাগুলি প্রথম উদ্ভবের সময় হয়তো কাহিনিই প্রধান ছিল। ব্যবসায়ী গায়েনদের হাতে পড়ে পরবর্তীতে আনুষঙ্গিক বর্ণনাগুলি মূল কাহিনির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

৩.৩ মৈমনসিংহ গীতিকা : সামগ্রিক পরিচিতি

আমরা গীতিকার সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও সাধারণ লক্ষণগুলি ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করেছি। এবার সামগ্রিকভাবে মৈমনসিংহ গীতিকার প্রাথমিক কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে আমরা মৈমনসিংহ গীতিকায় সমাজচিত্র, প্রকৃতির প্রভাব, নাট্যলক্ষণ, নারীপ্রেমের স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় প্রবেশ করব। মৈমনসিংহ গীতিকা গ্রন্থটি থেকে মহুয়া, কাজলরেখা, চন্দ্রাবতী, লীলা ও কঙ্ক, দেয়ানা মদিনা— এই ৫টি পালা আমাদের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই পাঠ্যতালিকার দিকে নজর রেখে আমরা আমাদের আলোচনা সাধারণভাবে এই ৫টি পালার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করব।

মৈমনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত পালাগুলি বাংলার লোকসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বাংলা লোক সাহিত্যের এক ঐশ্বর্যময় সৃষ্টি, বাংলা সংস্কৃতির এক স্বর্ণখনি— এই মৈমনসিংহ গীতিকা। এর ব্যাপক ও বিস্তৃত পটভূমিকা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে নদীমাতৃক বাংলাদেশ, ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকা, কাসাই, ধনু, আড়িয়ালখাঁ, মেঘনা, ফুলেশ্বরী প্রভৃতি নদ-নদী। বিস্তৃত ভাটি অঞ্চলই মৈমনসিংহ গীতিকার জন্মভূমি। যে সমাজব্যবস্থার মধ্য থেকে এই পালাগুলির উদ্ভব, তা ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে প্রবহমান চলিষ্ণু জীবনধারায় এসে মিশে গেছে। হিন্দু ও মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির বিশেষ কোনো প্রভাব এই পালাগুলির মধ্যে নেই। আদিতে কোচ রাজবংশী, গারো, হাজং ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর বাসভূমি মৈমনসিংহ অঞ্চলে সেন রাজবংশের আগেকার সময়কাল পর্যন্ত যে আঞ্চলিক চিন্তা, আদর্শ, সংস্কার ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তার একটি নিবিড় ও সংহত পরিচয় এই গীতিকাগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। মৈমনসিংহ গীতিকায় মূলত মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-আদর্শের পরিচয় রয়েছে। এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে আমরা বিভিন্ন পালাগানের নারীচরিত্রের স্বাধীন প্রেমচেতনা, সমাজ-শাসন ও নীতিবোধের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষকে দেখতে পাই। তবে একথা ঠিক যে, কেবল নিরবচ্ছিন্ন মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পরিচয় এর মধ্যে নেই, তার কারণ হয়তো যুগ যুগান্তের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ও পরিবর্তন।

এই গীতিকাগুলিতে আঙ্গিকের দিক খুবই সামান্য। কাহিনি বর্ণনার গতানুগতিক রীতির উপর ভিত্তি করেই রচিত এই পালাগুলি। নারী-প্রেম এক আশ্চর্য মহিমাময় রূপ নিয়ে আলোচ্য পালাগুলিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। অধিকাংশ গীতিকারই মুখ্য উপজীব্য

অভিশপ্ত ও ব্যর্থ প্রেম। প্রেমের গতি যে কত বিচিত্র ও জটিল, অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে বহিঃসংস্কারের সংঘাত যে কত প্রবল, তা-ই এই গীতিকাগুলিতে প্রকাশিত। গীতিকাগুলির জীবন ও চরিত্র বাস্তব, ভাষাও জীবন্ত, ঘটনা ক্রিয়াশীল, নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতে এগুলি উর্মি মুখর। এদিকে, লক্ষ রেখেই সম্ভবত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করেছেন যে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের অগ্রদূতের মধ্যে মৈমনসিংহ গীতিকার একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে।

মৈমনসিংহ গীতিকার মুখ্য উপজীব্য ব্যর্থ ও অভিশপ্ত প্রেম। নারীর প্রেমের শক্তি আশ্চর্য সুষমামণ্ডিত হয়ে আলোচ্য গীতিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। যে সমাজকাঠামোর উপর গীতিকাগুলি প্রতিষ্ঠিত, সে সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। সেজন্য আলোচ্য গীতিকাগুলিতে স্ত্রী চরিত্রই প্রাধান্য লাভ করেছে। আর গীতিকাগুলি প্রেমমূলক, তাই এই স্ত্রী-প্রাধান্য প্রেমের ক্ষেত্রেই দেখা গেল, অন্যক্ষেত্রে নয়। গীতিকাগুলির নামকরণ থেকেও বোঝা যায় যে এগুলি নায়িকা প্রধান। একটি বলিষ্ঠ নারীত্বের মর্যাদা গীতিকাগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। নারীর ব্যক্তিত্ব, স্বাধীন প্রেমচেতনা, আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধও এই গীতিকাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট। নায়িকাদের অতুলনীয় প্রেমশক্তি তাদের নারীধর্ম ও সতীত্বের মহিমাকে অতুলনীয় মর্যাদা দান করেছে। প্রেমের জন্য দুঃখভোগ, তিতিক্ষা এবং আত্মত্যাগ ও সর্বস্ব সমর্পন করে নারী যে আপন মহিমায় মহিয়সী হয়ে উঠতে পারে, এই গীতিকাগুলি তারই পরিচায়ক। পল্লিকবির সরল উদার দৃষ্টিতে শাশ্বত নারীর সংহত ও অনাবৃত রূপটি এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

মৈমনসিংহ গীতিকাগুলির অন্য একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য। এই পালাগুলিতে যে সব চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, তারা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সমাজনীতিই তারা অধিকার করেছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে বলেছেন— "ইহাদের যদি কোন পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে তাহা এই যে, ইহারা মানুষ।" এখানে উচ্চবর্ণের নায়ক তথাকথিত নিম্নবর্ণের নায়িকার জন্য প্রাণ বিসর্জন করে। যেখানে চরিত্রগুলির সামাজিক পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, সেখানেও বিশিষ্ট কোনো সমাজের দ্বারা তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়নি। ধর্ম ও সমাজ নিরপেক্ষ শাশ্বত মানবিক বৃত্তি দ্বারাই এদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে গীতিকাগুলির বহিরঙ্গ পরিচয়ের মধ্যে কোথাও কোথাও হিন্দু মুসলমানের ধর্ম-প্রভাব প্রচ্ছন্নভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে। তবে এই পরিচয় বাইরের মাত্র, অন্তরের পরিচয় নয়।

৩.৪ মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রতিফলিত সমাজচিত্র

মৈমনসিংহ গীতিকা বাংলা লোকসাহিত্যের বিচিত্র বিশাল ভাণ্ডারের এক অপরূপ সৃষ্টি। পল্লিকবির লেখনীতে নরনারীর প্রেম সম্পর্কের স্বরূপ আশ্চর্য সুষমামণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। নারী-প্রেমের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য, এর ত্যাগ বিদ্রোহ ও সহিষ্ণুতা নিয়ে এখানে উপস্থাপিত। গীতিকার গতি দ্রুত, পরিসর সংক্ষিপ্ত, বিবৃতির অবকাশ এখানে নেই। গীতিকায় ব্যক্তিজীবনের পরিচয় পূর্ণাঙ্গ নয়, জীবনের কতকগুলি বিশেষ ঘটনার উপর তীব্র আলোকপাত করেই তা রচিত হয়। তবু আলোচ্য গীতিকাগুলিতে পূর্ববঙ্গের, বিশেষ করে মৈমনসিংহ অঞ্চলের গ্রামীণ সমাজজীবনের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি, সমাজ জীবনের ঐতিহাসিক পরিচয় দান নয়। তবু সামাজিক জীবনের চেহারাটা যদি সাহিত্যে উঁকি না দেয়, তবে রসের আবেদন সম্পূর্ণ ও সাবলীল হয়ে উঠতে পারে না। তাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে সমকালীন রাষ্ট্রজীবন ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মৈমনসিংহ গীতিকায়ও এই সত্য আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে মৈমনসিংহ, পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের একটা জেলা। এখানে পূর্ববাংলার সমগ্র বাঙালি জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় না, কারণ মৈমনসিংহ গীতিকাগুলি সম্পূর্ণভাবে আঞ্চলিক গাথা, তাই এখানে পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলের সমকালীন জীবনের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

মৈমনসিংহ গীতিকায় মানবপ্রেমের একটি সার্বজনীন আবেদন থাকলেও এর আঞ্চলিক আবেদনটি অধিকতর প্রত্যক্ষ। কারণ এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এই গাথাগুলির প্রতি পদে যুক্ত হয়ে আছে। তবে মৈমনসিংহ গীতিকার কাল নির্ধারণ দুরূহ ব্যাপার। কারণ গীতিকা মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্গত। মানুষের মুখে মুখে ফেরা গানগুলি সংগ্রহ করেই তা পালা আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে প্রাপ্ত গাথাগুলি দেখে মনে হয় তুর্কি আগমনের বহু পরে, সেন রাজত্বের সময়ই সম্ভবত এই পালাগুলির উৎপত্তি।

পূর্ব মৈমনসিংহের সাধারণ জনসমাজ কোচ প্রভৃতি আর্যেতর জাতি দ্বারা গঠিত। ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জাতির বোড়ো শাখার অন্তর্গত গারো, হাজং, রাজবংশী প্রভৃতি শাখাই এই অঞ্চলের মৌলিক মানবসমাজ গঠন করেছে। মৈমনসিংহ জেলার সমতল 'ভাটি প্রদেশ, এর বাংলা ভাষাভাষী হাজংদের সমাজ থেকে মৈমনসিংহ গীতিকার অপূর্ব পালাগুলির অভিনয়ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে, লোকসাহিত্যের গবেষকগণ তাই মনে করেন। এই মানবগোষ্ঠী মাতৃতান্ত্রিক, তাই স্ত্রী প্রধান। মৈমনসিংহ গীতিকার আখ্যানগুলিতে পুরুষের তুলনায় নারী চরিত্রগুলিই অধিকতর সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত হয়েছে।

মৈমনসিংহ গীতিকার সমাজের স্ত্রী প্রাধান্যের ঐতিহাসিকতাকে গীতিকাগুলি সমর্থন করে। এখানে নারীর স্বাধীন প্রেমের অধিকার সামাজিকভাবে স্বীকৃত। এই অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বাস, কিন্তু হিন্দু সমাজ যেমন সমাজের অনুশাসন দেখিয়ে চন্দ্রাবতীর অথবা মহুয়ার প্রেমের গলা টিপে ধরেনি, তেমনি মদিনাকেও মুসলমান সমাজ পর্দানশিন করে রাখেনি। এই হিন্দু সমাজে তখনও ব্রাহ্মণ্য শাসন এবং বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলীন্য প্রথার তীব্রতা সংঘাত তৈরি করেনি। তাই ব্রাহ্মণ নদেরচাঁদ নিম্নবর্ণের কন্যা মহুয়ার জন্য আত্মোৎসর্গ করে। মৈমনসিংহ গীতিকার চরিত্রগুলির পরিচয় ধর্মনিরপেক্ষ। তারা হিন্দু সমাজকে স্বীকার করেনি, মুসলমানের বিধানও অস্বীকার করেছে। তাদের পরিচয় এই—তারা মানুষ, হৃদয়বান মানুষ।

আলোচ্য গীতিকাগুলিতে হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রমের কঠোরতা ও বাল্য বিবাহের বাধ্য-বাধকতা নেই। মহুয়া বা চন্দ্রাবতীর পিতার মধ্যে কন্যাকে বিয়ে দেবার ব্যস্ততা ও উৎকণ্ঠা আছে, কিন্তু গৌরীদান প্রথার যন্ত্রণা নেই। কেউই মেয়েকে গঙ্গাযাত্রী বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দেননি, ধীরে সুস্থে আদর্শ সুন্দর সুস্বাস্থ্যবান এবং অবশ্যই বিদ্বান যুবকদের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে চেয়েছেন। চাঁদ বিনোদ কুলে শীলে উন্নত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম অবস্থায় মলুয়াকে পায়নি, পরিশ্রম করে বিত্ত অর্জনের পরই মলুয়ার পিতা তাকে কন্যা সম্প্রদান করেছেন।

নারীর স্বাধীন প্রেমও এখানে স্বীকৃত। চন্দ্রাবতীর পিতা কন্যার সুখের নিমিত্ত দ্বিতীয়বার কন্যার বিয়ের সম্বন্ধ করার উদ্যোগ করেছিলেন, কিন্তু কন্যার অমতে জোর করে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেননি। সমস্ত বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়েছেন,

"শিবপূজা কর আর লেখ রামায়ণে।"

হুমরা মহুয়ার প্রেমের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি, তবু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা দেখে সে নদের চাঁদ ও মহুয়াকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল এবং লাভের কথা চিন্তা করেই সুজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে মহুয়ার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল।

তবে সামাজিক অনুদারতার অল্পবিস্তর পরিচয় এখানে আছে। মলুয়া মুসলমান দেওয়ানের হাবেলি থেকে সুকৌশলে তার নারীধর্ম রক্ষা করে পালিয়ে এসেছে, কিন্তু সমাজ তাকে গ্রহণ করেনি। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মলুয়া তার প্রেমের একমুখীনতা ও সতীত্বের পরিচয় দিয়ে গেছে। লীলা ও কঙ্ক পালায় ব্রাহ্মণ্য শাসনের প্রভাব বড়ো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কঙ্ক চণ্ডালগৃহে প্রতিপালিত হলেও জন্মসূত্রে সে ছিল ব্রাহ্মণ। তাই গুরু গর্গ যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করে যখন তাকে সমাজে তুলতে চেয়েছেন ব্রাহ্মণ কুলপতিরা তখন সে প্রস্তাবকে সহজভাবে মেনে নেননি, বরং বিরোধিতা করেছেন। এঁদের চক্রান্তেই লীলা ও কঙ্ক পালার এক মর্মান্তিক tragic পরিণতি সূচিত হয়েছে।

কিন্তু ধর্মীয় সংস্কার ও গোঁড়ামির পরিচয় থাকলেও সেটা বাইরের দিক। আসলে গীতিকাগুলির মূল উপজীব্য নারীর প্রেমের সৌন্দর্য, সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতা। প্রণয়ে ব্যর্থকাম হয়ে নারী তখন আজীবন কুমারী ব্রত পালন করত। চন্দ্রাবতীতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

গীতিকাগুলিতে মানুষের জীবিকার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় শিকার এবং কৃষিকাজই মৈমনসিংহ গীতিকার সমাজে জীবনধারণের মুখ্য উপায়। দেওয়ানা মদিনা পালায় কৃষিকাজের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়— হিন্দুরাও কৃষিকাজ করতেন, কমলা উপাখ্যানে তার পরিচয় পাই।

প্রস্তরযুগ থেকে শিকার মানুষের একটা অন্যতম বৃত্তি। বিনোদের 'কুড়া' শিকারের মধ্যে এই ব্যাধবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষকরা গরু মহিষ পালন করত। মৈমনসিংহ অঞ্চলের অধিকাংশ কৃষিযোগ্য জমি আছে জলের তলায়, জলময় ক্ষেতচাষে মহিষ অধিক উপযোগী। তাই মহিষ পালনের পরিচয় বেশ স্পষ্ট। কমলা উপাখ্যানে জনৈক কৃষক বেশ কয়েকটা মহিষের মালিক ছিল বলেই তাকে মহিষাল বলা হয়েছে। মহুয়াতে আছে "ঘরে আছে মহিষের দই রে বন্ধু খাইবা তিনো বেলা।।" আমন বা সালির ফসল ভালো হত। সালি ধানের উল্লেখ বহু পালায় আছে।

দেয়ানা মদিনা পালায়ও ধানচাষের উল্লেখ আছে। যাযাবর বেদে জীবনের উল্লেখ আছে মহুয়াতে। যাযাবররাও প্রয়োজন মতো কৃষিকাজ করত। বড়োবড়ো বাড়িতে শান বা পাথরের তৈরি বাঁধানো ঘাট থাকত। তবে আধুনিক কালের মতো স্নানাগার ছিল না। যে ঘাটে মহুয়ার সঙ্গে নদের চাঁদ বা বিনোদের সঙ্গে মলুয়ার সাক্ষাৎ হয়, যেখানে কোনো স্নানাগারের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। স্নানাগার ছিল না বলেই স্নানরত মলুয়াকে

জঙ্গলের আড়াল থেকে দেখে দুষ্ট কাজি বাসনাতাড়িত হয়ে উঠেছিল। ধনী লোকের বাড়িতে ১২টি দরজা বিশিষ্ট অথবা বর্হিদ্বার বিশিষ্ট ঘর থাকত।

খাওয়া-দাওয়ার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না মৈমনসিংহের গাথাগুলিতে। গীতিকায় সে সুযোগও সামান্য। কিন্তু শবরি কলা একটা চিত্তাকর্ষক দ্রব্য, চিড়া আর কলার ফলাহার তখন ছিল, পান-চুন, খয়ের, তামুক, টিক্কা ইত্যাদি ব্যবহারের পরিচয় আছে।

বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সে সমাজের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেছে। এখনও সে সকল ক্রিয়া কর্ম কোনো কোনো স্থানে অপরিবর্তিতভাবে পালিত হয়। যেমন— নান্দিমুখের মাটিকাটা, বিবাহ উৎসবে গীত, পাড়া ঘুরে সোহাগ মাগা, বরকন্যার ক্ষৌরী, গাষ্টঘিলা মাজন (উদ্বর্তন ভেদ), হলুদ মাখা, 'মুখচান্দিকে' (মুখচন্দ্রিকা), পাশাখেলা, ফুলশয্যা ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালিত হওয়ার খবর পাওয়া যায় পালাগুলি থেকে। এছাড়া আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, পানখিল, অধিবাস ইত্যাদির প্রচলন ছিল। অন্ধবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত কিছু আচার পালনের খবরও পাওয়া যায়।

পূজা পার্বণের মধ্যে দুর্গাপূজা, মনসাপূজা ইত্যাদি অর্থাৎ প্রায় বারোমাসে তেরো পার্বণের প্রভাব লক্ষ করা যায়। মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য দেবদেবীর তুলনায় মনসার প্রভাবই সে অঞ্চলে বেশি ছিল, ব্রতেরও উল্লেখ রয়েছে— "কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিক ব্রত পুত্রের লাগিয়া," এছাড়া নরবলি প্রথা, কালীপূজা, বনদুর্গার এবং ডরাই নামক এক গ্রাম্যদেবী, যিনি এখনও ভদ্রসমাজে গৃহীত হননি— তাঁর পূজার উল্লেখ আছে— "মইষ দিয়া পূজা দিল দেবী ডরাইরে।" মলুয়া পালার বন্দনা অংশে তুলসীর উল্লেখ থাকলেও বৈষ্ণবীয় প্রভাবের তুলনায় ধর্মপূজার প্রভাব বেশি বলে মনে হয়। লক্ষ্মীপূজার প্রচলন ছিল, ছিল ষষ্ঠীপূজার প্রথা। ধান কাটতে হলে 'বাতার ডুগল' দিয়ে লক্ষ্মীর আসন বাঁধার এক আশ্চর্য প্রচলন ছিল। হাঁচি, টিকটিকি, কাকের ডাক ইত্যাদির উপর বিশ্বাস ছিল। শ্যাওড়া গাছের ডালে দেবতার অধিষ্ঠান এ বিশ্বাস তৎকালে ছিল।

এই গীতিকাগুলির মাধ্যমে জানা যায় সেকালে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার সর্বত্রই ছিল। আবার হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্প্রীতির খবরও জানা যায়। 'দেওয়ান সাহেবের' অত্যাচারের কথা অনেক স্থানে আছে— তবে তা সাম্প্রদায়িক অত্যাচার নয়, দুর্বলের প্রতি সবলের আস্ফালন, ব্যভিচারীর ব্যভিচার, হিন্দু বা মুসলমানের ধর্ম বা জাতিগত কোনো ঘটনা নয়। একদিকে যেরূপ অত্যাচারী কাজি, দেওয়ান জাহাঙ্গীর, দেওয়ান ভাবনা— অপরদিকে তেমনি বিশ্বাসঘাতক, অত্যাচারী পরস্ত্রী-লিপ্সু হিন্দু কুলতিলক হীরণ সাধু ও মগাধিপতি রাংচাপুরের আবু রাজার নির্মম মূর্তি আমরা এই গীতিকাগুলিতে দেখতে পাই।

এই গীতিকাগুলির মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের জনসাধারণের জীবন্ত ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগের ভাষা সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃতের বেশি নিকটবর্তী ছিল। কিছু কথ্য শব্দের উদাহরণ— হস্তী—আন্তি, বর্ষা—বাস্যা, মিঠে—মিডা, শ্রাবণ—শাওন, শিকার—শিগার, বজ্রপাত—ঠাডা, বিদ্যুৎচমক—ঝিলকি ইত্যাদি। এখনও মৈমনসিংহ অঞ্চলে এগুলি ব্যবহৃত হয়।

বস্তুত শস্যশ্যামলা বঙ্গের নদীমাতৃক পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলের প্রাত্যহিক ধারাভাষ্য দেবার তাগিদ না থাকলেও এই গীতিকাগুলিতে মৈমনসিংহ অঞ্চলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবন ছায়াপাত করেছে অবধারিতভাবে। এই গীতিকাগুলিতে একটি বিশিষ্ট অঞ্চল তার সমস্ত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনাড়ম্বর এবং অনাবিলভাবে ধরা পড়েছে।

৩.৫ মৈমনসিংহ গীতিকার নাট্যলক্ষণ

নাটক উপন্যাসের মতো আধুনিক শিল্পমাধ্যম নয়। নাট্যতত্ত্ববিদদের মতে মানুষের আদিম কৃত্য থেকেই নাটকের উৎপত্তি। বাংলা সাহিত্যের উষালগ্নের নিদর্শন চর্যার গানগুলিতেও 'বুদ্ধ নাটক'-এর উল্লেখ আছে। অতএব মৈমনসিংহ গীতিকাগুলিও প্রাচীন ঐতিহ্যসূত্রে নাট্যলক্ষণাক্রান্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

নাটক প্রাণ পায় মঞ্চে। এই মঞ্চ নির্ভরতার জন্য নাটকে বর্ণনার তুলনায় সংলাপের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। পাত্রপাত্রীর কথোপকথন এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নাটকের কাহিনি উপস্থাপিত হয়। নাটকের চরিতার্থতা নাট্য বা থিয়েটারে, যার কাজ সমাগত সমস্ত দর্শকের কাছে একসঙ্গে নির্দিষ্ট একটি সময়সীমার মধ্যে নিজের আবেদন পৌঁছে দেওয়া; তাই তাকে হতে হয় সংহত, আবেগের ওঠা-পড়ায় সদাস্পন্দমান। একেই বলা যায় নাটকীয়তা, এই নাটকীয়তাই মৈমনসিংহ গীতিকায় আমাদের অম্বিষ্ট।

নাটক রচিত হয় মঞ্চাভিনয়ের জন্য— অর্থাৎ নাটকের যা প্রাথমিক শর্ত, মৈমনসিংহ গীতিকাতে তা অনেকাংশেই রক্ষিত হয়েছে। কারণ গীতিকার উপস্থাপনরীতি অনেকটাই নাটকীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত। দর্শকের সামনে কোনো পালাকে উপস্থাপন করার সময় কথক যে সব সময় নিরাবেগ বর্ণনাকারীর ভূমিকা পালন করতেন তা নয়, মানবচিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতাতে তিনি নিশ্চয়ই বর্ণিত চরিত্র সমূহের ভাবভঙ্গি প্রকাশ করতেন। আমাদের লোকনাট্যেও এই রীতির প্রচলন আছে। লোকায়ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মৈমনসিংহ গীতিকাগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। এদিক থেকে মৈমনসিংহ গীতিকা অবশ্যই নাট্যলক্ষণাক্রান্ত।

নাটকে দর্শক-শ্রোতার কৌতূহলকে ধরে রাখার জন্য ব্যবহৃত action বা ক্রিয়া, tension বা উৎকণ্ঠা, conflict বা দ্বন্দ্ব— এই তিনিরে ব্যবহার মৈমনসিংহ গীতিকাগুলিতেও আছে। আর যেহেতু প্রচলিত আখ্যান বা কিংবদন্তী অবলম্বনে পালাগুলি গড়ে উঠেছিল, তাই এর কাহিনিভাগ শ্রোতাদের কাছে অজানা নয়। গল্পের টান তাদের কাছে প্রধান ছিল না। তাই গল্প দিয়ে নয়, পালাকারগণ শ্রোতাদের আবিষ্ট করে রাখতেন গল্পের অতিরিক্ত বিন্যাসের নাটকীয়তা দিয়ে।

গীতিকার সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এগুলিতে বিশেষ নাটকীয় মুহূর্তগুলির উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়, অর্থাৎ বর্ণনার দ্রুতিই পালাগুলিতে অবিরত ক্রিয়া বা action তৈরি করছে, অমোঘ পারম্পর্যে একেকটি ক্রিয়া কাহিনিকে এগিয়ে দিচ্ছে জটিলতর উৎকণ্ঠা— বিস্ময়-সংঘাতময় পরবর্তী ক্রিয়ার দিকে। মহুয়া পালায় যেমন বেদের দল মহুয়াকে চুরি করার পর থেকে শুরু হয় উৎকণ্ঠা, মহুয়া নদের চাঁদের প্রেম প্রসঙ্গে যে

উৎকণ্ঠা মর্মস্পর্শী. এই প্রেমিক যুগলের বিপরীতে হুমরা ও তার দলবল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তৈরি হয় নাটকীয় সংঘাত ও দ্বন্দ্ব, শেষে মহুয়া ও নদের চাঁদের নাটকীয় মৃত্যু, সংঘাতের অবসান। অন্য পালাগুলিতেও নাটকীয় দ্বন্দ্ব, সংঘাত, ক্রিয়া, উৎকণ্ঠা ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এই ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য সব কবির ক্ষেত্রে সমান নয়।

এই গীতিকাগুলির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল কথোপকথন বা প্রশ্নোত্তরের সহায়তায় কাহিনির সম্প্রসারণ। নাটকে যেরূপ উপস্থাপিত চরিত্রগুলির বক্তব্য তাদের সংলাপের মাধ্যমেই প্রকাশিত, গীতিকাতেও চরিত্রগুলির উক্তি প্রত্যুক্তির মাধ্যমে ঘটনাপ্রবাহ এগিয়ে গেছে। নাটকের মতো এখানেও বিবৃতির কোনো স্থান নেই। বেশিরভাগ গীতিকার ক্ষেত্রেই পালাকার প্রত্যক্ষ বর্ণনাকারীর ভূমিকা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে চরিত্রগুলিকে সরাসরি হাজির করেছেন পাঠক-শ্রোতার কাছে— যা নিঃসন্দেহে নাটকীয় তাৎপর্যযুক্ত।

অতএব এই আলোচনার নিরিখে মৈমনসিংহ গীতিকাকে অবশ্যই নাট্য লক্ষণাক্রান্ত বলে অভিহিত করা যায়।

৩.৬ মৈমনসিংহ গীতিকার উপন্যাস লক্ষণ

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের পূর্বসূচনার দিক দিয়ে মৈমনসিংহ গীতিকার স্থান সর্বোচ্চ বলে দাবি করা হয়েছে। এ দাবি যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তা গীতিকার চরিত্রগুলির সমালোচনা করে দেখলেই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। এখানে একটি মাত্র কথা উল্লেখ করলেই চলবে যে, আধুনিক উপন্যাস সৃষ্টি হবার আগে লোককথা বা folk-tale ও গীতিকার মধ্য দিয়েই মানবিক জীবনের বাস্তব কাহিনি বর্ণনা করা হত। এদের মধ্যে লোককথার উপর একটু কল্পজগতের আবরণ থাকত। মানবিক সুখ-দুঃখের কাহিনি এদের মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে প্রকাশ পেয়েছে— রাক্ষস-খোক্কস ও সবাক পশুপাখির চরিত্র অনেক সময় অদৃষ্ট ও তাদের চরিত্রের স্থান গ্রহণ করেছে। সে তুলনায় গীতিকার মধ্য দিয়ে মানবিক সুখ-দুঃখের অনুভূতি অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে রূপায়িত হয়েছে। অতএব লৌকিক কথাসাহিত্য অপেক্ষাও গীতিকা আধুনিক উপন্যাসের অধিকতর নিকটবর্তী। মধ্যযুগের আখ্যায়িকা কাব্যের অন্যতম শাখা মঙ্গলকাব্যের ভিতর দিয়েও মানবিক অনুভূতি অনেক সময় রূপলাভ করেছে সত্য, কিন্তু সেখানে অলৌকিক দেবত্বকে সামনে রেখে কিংবা উপলক্ষে করে তা রূপায়িত হয়েছে, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তা প্রকাশ করা যায়নি। কিন্তু গীতিকায় তার স্বাধীন বিকাশ কোনোভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। সেজন্য আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পূর্বসূচনার দিক দিয়ে গীতিকার দাবিই সর্বোচ্চ স্বীকৃত। তবুও একথা সত্য যে, গীতিকাগুলির মধ্য দিয়ে বাংলা উপন্যাস রচনার যে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল, তার পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের ধারায় সেটা দেখা যায় না। কেননা, সমসাময়িক বাংলার শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে এই লোকসাহিত্যের কোনো যোগ ছিল না। তার সাহিত্যসাধনা লোকসাহিত্যের সহজ ও জাতীয় ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি কৃত্রিম পথ অনুসরণ করে চলেছিল। তারপর খ্রিস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে যে বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি হয়, তা প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবজাত এবং নব প্রতিষ্ঠিত নাগরিক জীবনই হল তার ভিত্তিভূমি। এর ফলে প্রায় প্রত্যেক দেশেই যেমন নিজস্ব লোককথা কিংবা গীতিকার

ধারাকে অনুসরণ করেই আধুনিক উপন্যাস বিকাশ লাভ করেছে, বাংলাদেশে তা হতে পারেনি। জাতি ও সম্প্রাদয়গত বিভিন্ন বিভাগ দ্বারা বাংলার সমাজ বহুকাল যাবৎ খণ্ডিত। বিশেষত এদেশে উচ্চতর সমাজ এবং নিম্নতর সমাজের মধ্যে স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যের ব্যবধান রয়েছে, সেজন্যই এর চণ্ডীমণ্ডপের সাহিত্য ও উন্মুক্ত মাঠের সাহিত্যের মধ্যেও গোড়া থেকেই পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপের কৃত্রিম ধারাতেই ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবিগণের সহায়তায় নবপ্রতিষ্ঠিত নাগরিক দরবারের সিংহদ্বার পর্যন্ত পৌঁছবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল বাংলা সাহিত্য। উন্মুক্ত মাঠের সাহিত্য পল্লির মাঠে-মাঠেই বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে। কোনো সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করে আধুনিক সাহিত্য-সংস্কৃতির অলংকার স্বরূপ হতে পারেনি। সেজন্য বাংলার লোককথা ও গীতিকার মধ্যে বাংলা উপন্যাসের সূচনা দেখা দিয়েছিল সত্য, কিন্তু তার দ্বারা আধুনিক উপন্যাস পুষ্টি লাভ করতে পারেনি।

উপন্যাসে যুক্ত হয়েছে আধুনিকতার ও নাগরিকতার অনুষঙ্গ, তা কেবলমাত্র পাঠ্য— কখনও শ্রবণযোগ্য শিল্প নয়। আধুনিক জীবনের সব জটিলতা প্রকাশ করতে চায় এই উপন্যাস, এইজন্য এর শৈলী ও বিষয়ের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা যায়। গীতিকার ইতিহাস আলাদা, বঙ্গে উপন্যাস সৃষ্টির বহু আগেই তার জন্ম প্রত্যন্ত অঞ্চলে। রচনার একটি বিশেষ শৈলীকে মেনে নেওয়া হয় সেখানে, বিষয়েও উপন্যাসের মতো বৈচিত্র্য নিয়ে খেলা করে না গীতিকা। এর চেয়েও বড়ো কথা, গীতিকার প্রকাশভঙ্গি; যাতে (যদিও তা আজ পদ্যে লিখিত আকার লাভ করেছে), সমবেত শ্রোতারা সেখানে বেশ প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং দেখা যায় এদের মধ্যে সংগত পার্থক্য আছে।

এই পার্থক্য স্বীকার করেও বলা যায়, মৈমনসিংহ গীতিকায় উপন্যাসের পূর্বছায়া একেবারে দুর্লক্ষ্য নয় এবং মধ্যযুগের অন্যান্য আখ্যানকাব্যের তুলনায় বরং একটু বেশিই। প্রথমেই লক্ষ করা যায় এর ধর্মনিরপেক্ষতা, মাত্র একটি বিশেষ ধর্মমত প্রচার করা এর উদ্দেশ্য নয়। তাই এই ধারা পুরোপুরি দৈবমহিমা রহিত বাস্তব রক্তমাংসের মানুষের জীবনালেখ্য। এই মানুষগুলো যতটুকু সক্রিয় ও দ্বন্দ্ববহুল তা আধুনিক উপন্যাসেরই পূর্বলক্ষণজাত। দ্বিতীয়ত বড়ো পটে মানব-সম্পর্ককে বিচার করতে গিয়ে উপন্যাসে অলৌকিকতার ব্যবহার কখনও ঘটেনি এমন নয়; বরং বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্ব থেকেই বহুবার এর প্রয়োগ দেখা যায়। আধুনিক উপন্যাসের অনুরাগী পাঠক অলৌকিকতাকে সযত্নে পরিহার করেছে— যে পাঠক মধ্যযুগীয় সাহিত্যে এই অসম্ভাব্যতাকে মেনে নিয়েছিল। এদিক থেকে গীতিকাগুলি বাংলা উপন্যাসের সমীপবর্তী; কারণ মধ্যযুগীয় সাহিত্যে এই গীতিকাগুলিই অলৌকিকতাকে যথাসম্ভব বর্জন করেছে।

তৃতীয়ত, ধর্মানুগত্য থেকে মুক্ত বলেই গীতিকা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় ব্যক্তির সামাজিক প্রেক্ষাপটকে স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করেছে। যদিও উপন্যাসের তুলনায় গীতিকায় বিষয়-বৈচিত্র্য কম, শৈলীও প্রথাগত তবু কোনো প্রাতিষ্ঠানিকতায় তা আবদ্ধ নয়। পালায় পালায় ভিন্নতা সেখানে অনেক বেশি, চরিত্রগুলিও জীবনঘনিষ্ট। এমন কি একাধিক চরিত্র ইতিহাস-স্বীকৃত। এদিক থেকেও উপন্যাসের পূর্বলক্ষণ এগুলিতে প্রস্ফুটিত।

মৈমনসিংহ গীতিকাগুলি উপন্যাস অবশ্যই নয়, এমনকি এগুলিকে উপন্যাসের পূর্বসূরি বলাও হয়তো অনুচিত, তবু এই দুই সাহিত্য-ধারার মধ্যে দূরাগত আত্মীয়তার কিছু অস্পষ্ট চিহ্ন নিঃসন্দেহে বর্তমান।

৩.৭ মৈমনসিংহ গীতিকায় নারী-প্রেমের স্বরূপ

বাংলার লোকসাহিত্যের বিশাল সম্ভারের মধ্যে মৈমনসিংহ গীতিকাগুলি এক অপরূপ সৃষ্টি। সংস্কারমুক্ত পল্লিকবি সবটুকু আবেগ উজাড় করে অপূর্ব দরদ নিয়ে আশ্চর্য সুন্দর প্রেমের কাহিনিগুলি বর্ণনা করেছেন। গীতিকার সংক্ষিপ্ত পরিসরে নরনারীর প্রেম সম্পর্কের একটি সুন্দর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। মৈমনসিংহ গীতিকায় বিশ্বের আদর্শ গীতিকাগুলির মতো প্রেমই মূল উপজীব্য। এই প্রেম ব্যর্থ ও অভিশপ্ত। প্রেমের গতি যে কত বিচিত্র ও জটিল, অন্তঃপ্রবৃত্তির সঙ্গে বহিঃসংস্কারের সংঘাত যে কত প্রবল, তা-ই গীতিকাগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ধর্ম-সংস্কারের সঙ্গে প্রবৃত্তির সংঘাতই প্রেমের ট্র্যাজিক পরিণতির কেন্দ্রীয় কারণ। প্রাজ্ঞ সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গীতিকার প্রেমের এই স্বরূপ-ধর্ম নির্ণয় করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—

"আমাদের বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যেমন একটা অসংস্কৃত আরণ্য উগ্রতা, ঘন বিন্যস্ত তরুলতার দুর্ভেদ্য জটিলতা, খাল-বিল-জলাভূমি—পার্বত্যনদীর দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সংকুলতা আছে, সেইরূপ আমাদের অন্তরেও নম্র কমনীয়তা ও ধর্মানুরাগের সহিত একটা দুর্দমনীয় তেজস্বিতা, দৃপ্ত আত্মসম্মানবোধ ও আবেগের অন্ধ মাদকতা ছিল। আমাদের ধমনীতে যে অনার্য রক্ত প্রবাহিত ছিল, তাহাই আর্য সভ্যতা ও ধর্মসংস্কৃতির প্রভাব উল্লঙ্ঘন করিয়া এইরূপ উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'ময়মনসিংহ-গীতিকা'য় আমরা এই আরণ্য বহিঃপ্রকাশ ও অন্তঃপ্রকৃতির সাক্ষাৎ পাই, যাহা বঙ্গসাহিত্যের অন্যত্র সুদুর্লভ।"

পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলের মাতৃতান্ত্রিক বোড়ো, হাজং, গারো, রাজবংশী সমাজের জীবনচর্যা ও সামাজিক পরিবেশ গীতিকাগুলিকে খানিকটা প্রভাবিত করেছে। তাই পুরুষের প্রণয় নয়, নারী-প্রেমের বিচিত্র সুন্দর প্রকাশেই পল্লিকবিরা অধিকতর মনোযোগের পরিচয় দিয়েছেন। নারীর প্রেম শতদল এখানে প্রতিটি পাপড়ি মেলে ধরেছে।

নারীর এই প্রেমচেতনা স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত ও সংস্কারমুক্ত। বল্লাল সেন প্রবর্তিত গৌরীদান, আচার-বিচারের চুলচেরা সংস্কার এখানে বড়ো হয়ে ওঠেনি। মৈমনসিংহ গীতিকার নারীচরিত্রগুলি প্রেমের ক্ষেত্রে অনেকটা স্বাধীন। পুরুষের মতামত না নিয়েই কুমারী নারী তার পছন্দমতো দয়িত নির্বাচন করে গোপনে তার গলায় মালা পরিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ মৈমনসিংহ গীতিকায় নারীর প্রেমের অধিকার সামাজিকভাবেই স্বীকৃত এ কথা বলা যায়। অবশ্যে নারীর স্বাধীন প্রেমের স্বীকৃতি মানে নারীর স্বৈরাচার প্রবৃত্তির স্বীকৃতি নয়। কুমারী নারীর যে প্রেম বিবাহে পরিণতি লাভ করে, সেই প্রেমই এখানে স্বীকৃত। তাই এখানে পরিণত বয়সেই বিয়ের অধিকারী হয় নারী। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "পূর্ব মৈমনসিংহের গীতিকাগুলি প্রধানতঃ পরিণত বয়স্কা কুমারীর স্বাধীন প্রেমের অধিকার ও ব্যক্তিগত হৃদয়-বেদনা লইয়াই রচিত। ইহাদের এই প্রেরণা হিন্দু-মসলমান সমাজ-নিরপেক্ষ।"

প্রেম আসে হৃদয়ের পথ ধরে, কোনো ধর্ম সংস্কারের নিয়ম নীতি শাসিত নির্দিষ্ট পথ ধরে নয়। এর জন্ম আচার্য বা মৌলবির মস্তিষ্কে নয়; বেদের অনুশাসন, কোরান ইত্যাদির সূত্র ধরে এই প্রেম জন্ম নেয় না। প্রেম আসে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা থেকে। মানুষের এই চিরন্তন প্রবৃত্তি কষ্টকে বরণ করেই আবির্ভূত হয়, এতেই এর পরম তৃপ্তি। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভালোবাসা আদায় করা যায় না। আর যখন প্রেম আসে, তখন

তা ঋষিবচনের ধার ধারে না। মৈমনসিংহ গীতিকায় এই বিধিনিষেধহীন প্রেমের দুর্জয় শক্তি ও আত্মমর্যাদা অসংখ্য নারীচরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। মহুয়া নদের চাঁদকে ভালোবেসেছে, এই প্রেম তার হৃদয়ে আপনা থেকেই জাত হয়েছে। তাই সেই প্রেমের শক্তিও অতুলনীয়। এই শক্তিতেই মহুয়া অসুস্থ নদের চাঁদকে ও নিজের সতীত্বকে রক্ষা করেছে সমস্ত দুর্ভাগ্য ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে একা সংগ্রাম করে। চন্দ্রার মতো ধর্মশীলা নারীও হৃদয়জাত প্রেমের বলে বিয়ের প্রস্তাবের বহু পূর্বে জয়চন্দ্রকে স্বামীরূপে হৃদয়ে বরণ করেছে। এই প্রেমের একমুখীতা ও পবিত্রতা রক্ষা করতে সে তার হৃদয়কে পাষাণে পরিণত করার সাধনা করেছে। মলুয়া, কাজলরেখা এই সহজাত প্রেমের শক্তিতেই একর পর এক দুর্ভাগ্যকে সহজভাবে বরণ করে নিয়েছে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মলুয়া, মদিনা এই প্রেমের ধর্ম রক্ষা করে বিজয়শঙ্খ বাজিয়েছে। নব্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও পৌরোহিত্যের প্রভাবে প্রেমের এই শাশ্বত মূর্তির সৌন্দর্য আবিষ্কার সম্ভব হয়নি বলে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন।

একনিষ্ঠতাই প্রেমের ধর্ম। মৈমনসিংহ গীতিকার নারীচরিত্রগুলি সেই ধর্মই রক্ষা করেছে। এর প্রতিটি নায়িকা চরিত্রই যথার্থ অর্থে একচারিণী। প্রেমের প্রতি নিষ্ঠা ও সতীত্ব সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি, একের পায়ে আত্মসমর্পণই নারীধর্ম— আলোচ্য গীতিকাগুলিতে আশ্চর্য বলিষ্ঠতা নিয়ে তা আত্মপ্রকাশ করেছে। হয় মৃত্যুকে বরণ করতে হবে অথবা সুজন খেলোয়াড়কে স্বামীরূপে বরণ করতে হবে। এই নিষ্ঠুর পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে মহুয়া নির্ভীকভাবেই হুমরার প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে বলেছে—

> "আমার বন্ধু চান্দ-সুরুজ কাঞ্চা সোনা জ্বলে।
> তাহার কাছে সুজন বাদ্যা জ্যোনি যেমন জ্বলে।।
> সোনার তরুয়া বন্ধু একবার দেখ।
> আমার চক্ষু তুমি নিয়া নয়ান ভইরা দেখ।।"

হুমরার সে চোখ ছিল না বলেই সে নিষ্ঠুরভাবে নদের চাঁদকে হত্যার কঠোর আদেশ দিয়েছে।

একনিষ্ঠ প্রেমের সাগরেই প্রস্ফুটিত হয় সতীত্ব-শতদল। এই প্রেমই সতীত্বকে রক্ষা করে, একে রক্ষা করার জন্য সমাজশক্তির প্রয়োজন হয় না। বরং সমাজ-মূল্যবোধকে রক্ষা করে এই প্রেমের মূল্যবোধ। এই একনিষ্ঠতার গুণে মৈমনসিংহ গীতিকার নারী চরিত্রগুলি যে শক্তি অর্জন করেছে, দুর্বৃত্তের হাত থেকে সেই শক্তিই তাকে রক্ষা করেছে। আত্মশক্তিতে বলীয়ান মলুয়া, কাজলরেখা প্রমুখ চরিত্রে এরই পরিচয় পাই। মলুয়া গরীব বিনোদের স্ত্রী, যখন অনশনে অর্ধাহারে সে দিনাতিপাত করছে, কাজি তখন তাকে হীরা সোনার অলঙ্কারে সাজিয়ে দেবার ধৃষ্ট প্রস্তাব করে, মলুয়া তা প্রত্যাখান করেছে ক্রোধভরে। সে বলেছে—

> "আন্ধাইরে কাটিব আমি দুঃখের দিবা রাতি।
> কাজীরে কহিও তার মুখে মারি লাথি।।
>
> * * *
>
> ভিক্ষা করি খাই যদি দুয়ারে দুয়ারে।
> কড়ার আশা নাহি করি দুশমন কাজীর ধারে।"

এই প্রত্যাখানের শক্তি প্রেমের নিষ্ঠা থেকেই জাত। গতানুগতিক সমাজবিধি দ্বারা যে সতীত্ববোধ জাগ্রত হয় তার শক্তি থেকে এর শক্তি অনেক প্রবল। যে জন্য গীতিকার নায়িকাগণ দীর্ঘদিন পরপুরুষের ঘরে বন্দিনী থেকেও একমাত্র প্রেমের শক্তিতে নিজেদের সতীত্ব ও নারীধর্ম অটুট রাখতে পেরেছে। এই শক্তিতেই চন্দ্রাবতী জয়ানন্দের কঠিন আঘাতকে সহজভাবে নিয়ে ভগবৎ সাধনায় একান্তে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছে।

গীতিকাগুলিতে নারীর এই অতুলনীয় শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেমের জন্য দুঃখ, তিতিক্ষা, আত্মত্যাগ, সব সমর্পন করে নারী যে কী অসীম মহিমা লাভ করতে পারে, গীতিকাগুলি তারই পরিচায়ক। পল্লিকবির সহজ-সরল দৃষ্টিতে শাশ্বত নারী-প্রেমের এই অনাবৃত রূপটি এখানে প্রকাশ পেয়েছে, কোনো প্রকার কৃত্রিমতায় আচ্ছন্ন হয়নি। মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রেমের আদর্শ উন্নত, তাই নিরক্ষর পল্লিকবির হাতে পড়েও প্রেমোপাখ্যানগুলি শালীনতা বজায় রেখেছে, মঙ্গলকাব্যের মতো আদিরসের বিকৃতি এগুলিতে নেই। এর রুচিবোধ এবং নৈতিক আবহাওয়া উন্নত।

মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রেমের অর্থ মানবধর্ম। এখানে উচ্চবর্ণের নায়ক তথাকথিত নিম্নবর্ণের পরিবারের জন্য জীবন উৎসর্গ করে। গীতিকাগুলির সকল প্রেমিক চরিত্রই কোনো সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। ধর্ম ও সমাজ নিরপেক্ষ শাশ্বত মানবিক বৃত্তি দ্বারাই তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত। এরা হিন্দুর সমাজনীতি যেমন স্বীকার করেনি, মুসলমানের সমাজনীতিও অস্বীকার করেছে। অতএব 'ইহাদের যদি কোন পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে তাহা এই যে, ইহারা মানুষ'।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সমস্ত সামাজিক অনুশাসনকে স্বীকার করেই নারীচরিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তাই নারীর জননী রূপটিই সেখানে অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকায় অঙ্কিত হয়েছে নারীর প্রেমিকা সত্তার চিত্র। এই চরিত্রগুলি ত্যাগে উজ্জ্বল, সহিষ্ণুতায় উজ্জ্বল, সংযমে উজ্জ্বল। তবে এই সৌন্দর্য ও সংযমের অন্তরালে তাদের এক দুর্জয় শক্তির পরিচয় প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। সে শক্তি চরিত্রগুলির স্বাধীন প্রেম-সত্তাকে অবলম্বন করেই বিকাশ লাভ করেছে। পাতিব্রাত্যে মৈমনসিংহ গীতিকার প্রেম দুর্জয়, আগ্রাসনের প্রতিরোধে সে দুর্নিবার। এই পাতিব্রাত্যের শক্তিতেই এরা মহিয়সী, অতুলনীয় গৌরবের অধিকারিণী হতে পেরেছে।

মৈমনসিংহ গীতিকার অধিকাংশ প্রেমই ব্যর্থ বা অভিশপ্ত। 'কেন প্রেম নাহি পায় আপনার পথ'— এই জিজ্ঞাসাই গীতিকাগুলির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিরহেই প্রেমের সৌন্দর্য ও শিল্পসার্থকতা। পল্লিকবির এই উপলব্ধিই অপরিতৃপ্ত মানবহৃদয়ের অশান্ত ক্রন্দনে গীতিকার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেছে। এই ট্র্যাজেডি আরও মর্মস্পর্শী হয়েছে এখানেই কেন না এখানে মৃত্যু বা ব্যর্থতার মধ্যে কোনো পারত্রিক কল্যাণকামনা নেই। মৈমনসিংহ গীতিকার প্রেম মঙ্গলকাব্য বা বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে স্বর্গ অথবা বৈকুণ্ঠ কামনা করে না, ইহ জীবনেই ভোগের পাত্র থেকে জীবনরস নিঃশেষে পান করে যেতে চায়; তাই মলুয়া, মদিনা, চন্দ্রা বা লীলার বিরহে কেবলই প্রিয়-বিচ্ছিন্ন বাস্তব মানুষের হৃদয়বেদনার প্রকাশ ঘটেছে। এখানে ভাবসম্মিলনের কোনো পরিবেশ তৈরি হয়নি।

সামগ্রিক আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি মৈমনসিংহ গীতিকায় নারী-প্রেমের এক শাশ্বত সত্য প্রকাশিত। এই প্রেম সমাজনীতির নির্দিষ্ট পথ ধরে আসে না, অথবা তা আচার্য- মৌলবির মস্তিষ্ক প্রসূত নয়, তা আসে হৃদয়ের সহজাত পথ ধরেই। তাই এই প্রেম সমাজ ও ধর্ম-নিরপেক্ষ। সমালোচকের ভাষায়— "জাতিবিচার, কুলশীল, পদমর্যাদা সমস্তই প্রেমরত্নাকরের অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে।" এই প্রেম সম্পূর্ণ মানবিক; ঐহিক সুখভোগই এর চাহিদা। এই প্রেম স্বতঃস্ফূর্ত শালীন একনিষ্ঠ এবং ফুলের মতোই পবিত্র। শালীনতা ও পবিত্রতা— নারীধর্ম ও সতীত্ববোধ অক্ষুণ্ণ রাখতে এই প্রেমই হয়ে ওঠে দুর্জয়, অতুলনীয় শক্তির অধিকারী। এই প্রেমের একনিষ্ঠার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মৈমনসিংহ গীতিকার নারীচরিত্রগুলি সকল দুঃখ-দুর্দশা, দুর্ভোগ-যন্ত্রণা স্বীকার করে নিয়েছে; এরই শক্তিতে কুচক্রীর জৈব বাসনার বিরুদ্ধে অবলা নারী একাকী সংগ্রাম করে তার নারীধর্মকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এই একনিষ্ঠ, সমাজনিরপেক্ষ, স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম এবং আত্মমর্যাদার শক্তি ও পবিত্রতায় আলোচ্য গীতিকার নারীচরিত্রগুলি বিশ্বসাহিত্যের চিরন্তন প্রেমিকা চরিত্রগুলির সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছে।

৩.৮ মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রকৃতির প্রভাব

মানুষের জীবনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক নিবিড় যোগ রয়েছে। মানুষ ও প্রকৃতি পরস্পরের পরিপূরক, অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই প্রকৃতি ব্যতীত সাহিত্য— খণ্ডিত সাহিত্য। যে সাহিত্য জীবনকে অখণ্ডভাবে প্রকাশ করে সেখানে মানুষ ও প্রকৃতি একসূত্রে গাঁথা পড়ে। আলোচ্য গীতিকাগুলিতে মানুষ-প্রকৃতি অচ্ছেদ্য সূত্রে বাঁধা পড়েছে। এই কাহিনিগুলির রূপ বর্ণনায়, ঘটনার ইঙ্গিতময়তায়, বিবৃতিতে এবং প্রেমের গভীর বিচিত্র মানস ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রকাশে পল্লি-প্রকৃতির সর্বতোমুখী দ্যোতনাশক্তি এক আশ্চর্য সুসংহতির সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে।

এই গীতিকাগুলির পালাকার এবং চরিত্র প্রকৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এই সম্পৃক্তি যেমন শারীরিক, তেমনি মানসিকও বটে। তাই প্রায় প্রতিটি পালাতেই প্রকৃতি ব্যবহৃত হয়েছে পটভূমিকা রূপে।

পালাগুলির প্রধান আকর্ষণ মানব মানবীর প্রেম। এই প্রেম প্রকাশিত ও বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রকৃতি এক বড়ো সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। মলুয়ার সঙ্গে বিনোদের দেখা হয় যে পুকুরঘাটে, সে পুকুর 'ঝাড় জঙ্গলে ঘেরা। চইরদিগে কলাগাছ মান্দার গাছের বেড়া'। জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর আলাপও চাঁপা, নাগকেশরে আকীর্ণ এক পুকুরধারের ফুলবাগানে। কঙ্ক ও লীলার প্রেম প্রকাশের ক্ষেত্রেও নদীরঘাট পশ্চাৎপট রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। লক্ষণীয় যে, খেলার আসরে প্রথম সাক্ষাৎ হলেও, মহুয়া নদের চাঁদের হৃদয় বিনিময় কিন্তু এক নদীর ঘাটেই। নদের চাঁদের কাছে নিজের অনিকেত অস্তিত্বকে তুলে ধরতে গিয়ে যাযাবরকন্যা মহুয়া প্রকৃতি থেকেই উপমা চয়ন করে—

"নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভসুদর ভাই।
সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই।।"

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রকৃতি কেবল পশ্চাৎপট হিসাবেই ব্যবহৃত হচ্ছে না, তা মিশে গেছে পাত্রপাত্রীদের মানসিক নানা টানাপোড়েনের মধ্যেও। এ যেন পরস্পরের

প্রাণরহস্যের ও জীবনলীলার পারস্পরিক অনুপ্রবেশে। উপমান-উপমেয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এই অন্তরঙ্গ সাদৃশ্যরসে বিগলিত হয়ে এক অবিচ্ছিন্ন ঐক্যে বিলীন হয়েছে। নদের চাঁদের বিবাহের প্রস্তাবে লজ্জিত মহুয়া কৃত্রিম কোপে বলে—

'লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জ নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর।।'

কিন্তু নদের চাঁদ তো ইতিমধ্যেই মরেছে এবং মজেছে। সে মহুয়ার প্রেমের বন্যায় ডুবে মরতে চায়। মহুয়া তার কাছে আর বস্তু রূপে নয়, একটা সুগভীর ভাব রূপে প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে। তাই সে বলে কলস আর দড়ির কী দরকার, 'তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি।'

চরিত্র আর প্রকৃতির মধ্যে এই পারস্পরিক অন্বয় এতই স্বাভাবিক যে, অনেক সময় একটি প্রকৃতি বর্ণনার পাশাপাশিই স্থান পায় কোনো চরিত্রের মানস প্রতিক্রিয়া, যাদের মধ্যে কোনো অন্তরঙ্গ যোগসূত্র নেই। যেমন ধান রাঙা হয়ে ওঠা এবং নদের চাঁদের মাঝরাতে জেগে ওঠার একটি চিত্র—

"আগ রাঙ্গিয়া সাইলের ধান
উঠ্যাছে পাকিয়া
মধ্য রাত্রে নদ্যার চান
উঠিল জাগিয়া।"

প্রকৃতি ও মানুষের এই পাশাপাশি বিন্যাস চরিত্রগুলিকে একটা উদার প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছে।

বিভিন্ন উপমা সংগ্রহেও পল্লিকবিরা প্রকৃতির দ্বারস্থ হয়েছেন। নিকট প্রকৃতি থেকে আহরিত এই উপমাগুলি এসেছে লোকসাহিত্যের সাধারণ ভাণ্ডার থেকে। লক্ষণীয় যে চরিত্রগুলির জীবনে সংঘটিত ঘটনার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপমাগুলির ব্যঞ্জনাও পরিবর্তিত হয়েছে। নায়িকার রূপ বর্ণনায় ফুলের প্রসঙ্গ এসেছে বারবার, কিন্তু তাদের দুর্দশার মুহূর্তে শুকিয়ে যায় সে ফুল। মহুয়ার সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেন—

"হাট্টীয়া না যাইতে কইন্যার পায়ে পরে চুল।
মুখেতে ফুট্টা উঠে কনক চাম্পার ফুল।।"

কিন্তু দুঃখের দিন যখন ঘন হয়ে আসে, তখন কবির উপমাও আকাশের ভয়াবহ সমাচ্ছন্নতায় পৌঁছায়।—

"ডুবিল আসমানের তারা চান্দে না যায় দেখা।
সুনালী চান্নীর রাইত আবে পড়ল ঢাকা।।"

তখনই মহুয়া আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে। জয়ানন্দ যখন মন্দিরের দরজায় করাঘাত করতে থাকে, বাইরে তখন তুমুল ঝড়; মনে হয় যেন জয়ানন্দ-চন্দ্রাবতী এই দুই নর-নারীর হৃদয়ের আলোড়নকে প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়েছে বহিঃপ্রকৃতি। লীলা ও কঙ্ক পালাটিতেও প্রকৃতি এবং মানবসত্তার একাত্মতার একাধিক চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলিতে বিশ্বপ্রকৃতি তার সার্বিক অস্তিত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং ফলস্বরূপ এই পালাগুলির চরিত্রসমূহও এক বৃহৎ উদার প্রাকৃতিক পটে বিন্যস্ত হয়েছে।

৩.৯ গীতিকা ও রূপকথা

এবার আমরা একটি বিশেষ প্রসঙ্গ আলোচনা করব। তা হচ্ছে গীতিকার সঙ্গে রূপকথার তুলনা-প্রতিতুলনা। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা প্রথমে রূপকথার সংজ্ঞা নির্ধারণ করব, চিহ্নিত করব তার গোত্রলক্ষণ। সেইসূত্রে আমরা গীতিকা ও রূপকথার পার্থক্যগুলিও আলোচনা করব এবং সেই মানদণ্ডে আমাদের আলোচ্য মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলি কতটুকু রূপকথার লক্ষণাক্রান্ত, সেই প্রসঙ্গ আলোচনা করব।

পূর্ববঙ্গ গীতিকার অন্তর্গত অনেকগুলি পালাতেই 'গীতিকা' ও 'রূপকথা'ধর্মী জীবনের উপাদান কাহিনির অন্তর্গত রোমান্সরস সহযোগে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। মৈমনসিংহ গীতিকা মারফৎ আমরা লোকসাহিত্যের যে নতুন রাজ্যে উপনীত হই, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন রোমান্সরসেরই আয়োজন। প্রেম তার প্রধান থিম। এই প্রেমের জন্য আত্মত্যাগের কথাই এগুলির উপজীব্য। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতময় বহু প্রতিকূল অবস্থাকে মেনে নেওয়া কিংবা সেই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম, জাতিধর্ম নির্বিশেষে নর-নারীর কাহিনি, অশ্রুজল ও দীর্ঘশ্বাসের ট্র্যাজিক মাধুর্য— এ সবই পর্যাপ্তভাবে মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলিতে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। লক্ষণীয় যে মৈমনসিংহ গীতিকার মধ্যেই আমরা রূপকথার মালঞ্চমালা, শঙ্খমালা, কাঞ্চনমালা এবং পুষ্পমালার কথা পেয়েছি। এই নামগুলি এবং এদের চরিত্রসংস্থানও রূপকথার অনুষঙ্গবহ। রূপকথাধর্মী রচনাগুলিকে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন "গীতিকথা"। রূপকথার বিশেষত্ব এই যে, তার সমস্ত গল্পবস্তু রূপকধর্মী। শিশুমনোরঞ্জক সেই রূপকার্থের অন্তরালে যে কথাবস্তু কয়েকটি চিরপরিচিত অনুষঙ্গের মাধ্যমে একটি বিশেষ কাহিনিধারার জন্ম দিয়েছে— তারই নাম রূপকথা। এই রূপকথা দেশ-কাল নিরপেক্ষ। এখানেও প্রেম এবং বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম, সংকটাপন্ন ও সংকটোত্তীর্ণ মানসিকতার পরিচয় নানা স্নিগ্ধ সুকুমার ভাববাহী চিত্রানুষঙ্গে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। যেমন রাক্ষসের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ বিগ্রহের যে অতিশায়িত কল্পনা রূপকথার এক পরিচিত আখ্যান, তা শিশু মনের বিস্ময় অবলম্বনে একটা বিশেষ রূপ প্রাপ্ত হয়েছে, তার মধ্যে ভয়ানকের সংস্থান যদিও বা সম্ভব, তবু সে ভয়ানকের সীমানা কখনোই বীভৎসের সংস্পর্শে সংকুচিত ও ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে না। রাজকুমার তার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে বীরদর্পে রাক্ষসপুরীতে প্রবেশ করে এবং ছলে-বলে-কৌশলে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে তার বিজয় অভিযানকে চরিতার্থ করার জন্য স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। লক্ষ করার বিষয় যে রূপকথার বিষয়বিন্যাস এমনই যে তাকে উপাখ্যানধর্মী বলাই সঙ্গত। দীনেশচন্দ্র সেনও তাই বলেছেন। অপর পক্ষে গীতিকার স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব সম্পর্কে প্রথমেই বলতে হয় ইংরেজি Ballad-এর আদর্শ এই পালাগুলিতে লক্ষ করা যায়। Narrative Flok Song বা Ballad মূলত আখ্যায়িকাধর্মী। আমাদের পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলিও তাই। গীতিকায় সাধারণত জোর দেওয়া হয় কাহিনির অন্তর্গত একটি প্রধান সংকটময় মুহূর্তের প্রতি। ফলে গীতিকাধর্মী রচনায় স্বভাবতই নাটকীয় উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্যের অবকাশ থাকে। শ্রোতার মনে গীতিকার কাহিনি পরম বিস্ময়, সুগভীর কারুণ্য সৃষ্টি করে। রূপকথা কথিত হয়, এবং গীতিকা গান করা হয়।

গীতিকা এবং রূপকথার মধ্যে আরও কিছু প্রকৃতিগত প্রভেদ রয়েছে। গীতিকা সাধারণত বিয়োগাত্মক, কিন্তু রূপকথায় অন্তে মিলন প্রদর্শিত হয়, রূপকথায়

অলৌকিকতার একটা বড়ো স্থান আছে। তাছাড়া রূপকথার ক্ষেত্রে মনুষ্যেতর পশুপাখির উপর মানবিক গুণাবলি আরোপ করা হয় এবং ঘটনা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এদের একটা বড়ো ভূমিকা থাকে। অবাস্তব কষ্টকল্পিত কাহিনি-উপকাহিনিও রূপকথায় নির্দ্বিধায় স্থান পেতে পারে। গীতিকায় বর্ণনার দ্রুতি থাকলেও ঘটনাপ্রবাহের কার্যকারণ সম্পর্কসূত্র বজায় থাকে, কিন্তু রূপকথায় কার্যকারণের সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। গীতিকা যেহেতু গীত হয় তাই এক্ষেত্রে ছন্দ এক বড়ো ভূমিকা পালন করে, কিন্তু রূপকথায় পদ্যছন্দ অপরিহার্য নয়— তা গদ্যেও রচিত হতে পারে।

এই আলোচনার মানদণ্ডে আমাদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত গীতিকাগুলি বিচার করলে দেখা যায় যে দেয়ানা-মদিনা পালাটি আংশিকভাবে রূপকথাধর্মী। লোকসাহিত্য বিশেষজ্ঞ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে আলোচ্য পালাটিকে রূপকথা ও গীতিকার মিশ্রণযুক্ত রচনা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এই গীতিকার কাহিনিতে স্পষ্ট দুটি ভাগ লক্ষ করা যায়— প্রথম অংশটি রূপকথার বৈশিষ্ট্যবহ এবং দ্বিতীয় অংশে গীতিকার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত। প্রধান নারীচরিত্র মদিনা— তার প্রেম ও পাতিব্রত্য, স্বামীর জন্য তার প্রতীক্ষা, পর জীবনের একনিষ্ঠতা এবং পরিশেষে ট্র্যাজিক জীবনাবসান, এই বঞ্চিতা নারীর জীবনকে কেন্দ্র করে এক করুণরসের সৃষ্টি করেছে। চরিত্রটির সংগ্রামশীল জীবন মূলত গীতিকাধর্মী। অন্যদিকে রূপকথার সুয়োরানী-দুয়োরানি প্রসঙ্গের সঙ্গে তুলনীয় আলাল-দুলালের সৎ মা প্রসঙ্গটি। দুই পুত্রের নির্বাসন, দুলাল ভাইকে আলালের অন্বেষণ— ইত্যাদিও রূপকথার অনুষঙ্গবাহী।

কাজলরেখা পালাটিতে রূপকথা-সুলভ উপাদানের বাহুল্য লক্ষ করা যায়। অন্যান্য গীতিকাগুলি যেখানে বিয়োগাত্মক, কাজলরেখা সেখানে মিলনান্তক। এই পালায় অলৌকিক ঘটনার উদাহরণও প্রচুর। এখানে দেখা যায় বাক্‌শক্তিসম্পন্ন শুকপাখির নির্দেশে মানবজীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সন্ন্যাসী প্রদত্ত আম্রভক্ষণে হীরাধরের পত্নীর গর্ভধারণ, সূচ রাজকুমারের মৃত্যু মাতৃগর্ভে হওয়া সত্ত্বেও দেবতার বরে তার পুনর্জন্ম, কালজরেখার জীবনরক্ষার্থে সমুদ্রে চড়া পড়ে যাওয়া ইত্যাদি অলৌকিক কল্পজগতের কার্যকারণ সম্পর্কশূন্য ঘটনা রূপকথার বৈশিষ্ট্যকেই পরিস্ফুট ও পুষ্ট করে তুলেছে। অন্যান্য গীতিকাগুলির সঙ্গে এই পালার অন্য আর-একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হল, গীতিকায় যেখানে প্রাক্‌বিবাহ প্রেম স্বীকৃতি পেয়েছে, এই পালায় তা নয়; এখানে দেখি মৃত ব্যক্তিকেই যুক্তিহীনভাবে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া পালাটিতে পদ্যের সঙ্গে গদ্যের সংমিশ্রণের বিষয়টিও লক্ষণীয়। এই সমস্ত বিষয়ের নিরিখে পালাটিকে অনেকে রূপকথা বলে অভিহিত করেছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও কাজলরেখাকে গীতিকার মর্যাদা দিতে চাননি, তিনি এই পালাকে 'গীতিকথা' আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

৩.১০ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমরা মৈমনসিংহ গীতিকার আলোচনা শেষ করেছি। বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনার শেষে আমরা দেখলাম যে, মৈমনসিংহ গীতিকা ব্যালাড শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ব্যালাডের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য আমরা চিহ্নিত করেছি তার সবগুলিই কমবেশি মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলিতে বর্তমান। এই পালাগুলিতে বিধৃত সমাজ-পরিবেশের ওপর আর্য-

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কোনো প্রভাব নেই। সহজ, সরল অনাড়ম্বর পল্লিজীবন তার সৌন্দর্যসহ পালাগুলিতে ধরা দিয়েছে।

নারীর প্রেমের এক অপরূপ মহিমা ও শক্তিমত্তা এগুলিতে ধরা পড়েছে। প্রেমের জন্য আত্মত্যাগের উদাহরণ পালাগুলিতে সুলভ। বাহ্য প্রকৃতিও যেন পালাগুলির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পালাগুলির চরিত্র, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে একাত্মতা তৈরি করেছে।

পালাগুলি নাট্যগুণে সমৃদ্ধ। নাট্য-সুলভ ক্রিয়া-দ্বন্দ্ব-সংঘাত এগুলিতে আছে। উপন্যাসের সম্ভাবনাও এগুলিতে আছে। মৈমনসিংহ গীতিকার দু-একটি পালায় ধরা পড়েছে রূপকথাধর্মিতা। সেগুলিকে সমালোচকগণ গীতিকা না বলে গীতিকথা আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

৩.১১ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

ধ্রুবপদ : পাঁচালি প্রভৃতি গানে যে অংশ পুনঃ উচ্চারিত হয়।

Epic : মহাকাব্য

গৌরীদান : আট বছর থেকে আট বছর এগারো মাস উনত্রিশ দিন পর্যন্ত বয়সী মেয়ের বিবাহদান।

আমন : একজাতীয় ধানের নাম, যে ধান হেমন্তকালে পাকে।

মৌলবি : ইসলামি শাস্ত্রে কৃতবিদ্য বা অধ্যাপক; ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞ।

ট্র্যাজেডি : বিয়োগাত্মক কাহিনি।

প্রস্তর যুগ : যে যুগে মানুষের হাতিয়ার ছিল পাথর ও পাথরের তৈরি অস্ত্র।

বল্লাল সেন : বঙ্গের সেনবংশীয় প্রসিদ্ধ রাজা। আচার, বিনয়, বিদ্যা অনুসারে তিনি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তন করেন। দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর নামে দুটি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা।

৩.১২ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

১। 'মহুয়া' পালাটিতে বেদে-চরিত্রের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে কিনা আলোচনা করুন।

২। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও 'চন্দ্রাবতী' পালাটির নাটকীয় গুণধর্ম অনস্বীকার্য চমৎকারিত্বে কাহিনিকে মণ্ডিত করেছে। আলোচনা করুণ।

৩। 'কাজলরেখা' পালাটি অবলম্বন করে রূপকথা গীতিকায় কতখানি একাত্ম হতে পারে, আলোচনা করুন।

৪। রূপকথা ও গীতিকার পার্থক্য নির্ধারণ করে 'কাজলরেখা' পালাটি সত্যই কোন পর্যায়ে পড়ে আলোচনা করুন।

৫। রোমান্টিসিজমের স্বরূপ কী? এই স্বরূপের দিকে লক্ষ রেখে 'মহুয়া' পালায় যথেষ্ট রোমান্টিসিজম প্রকাশ পেয়েছে কিনা দেখাবার চেষ্টা করুন।

৬। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র স্বকীয়তা কোথায় সম্যক আলোচনা করুন।

৭। মৈমনসিংহ গীতিকায় রোমান্টিক প্রেমানুভূতির একটা বাস্তবসম্মত রূপ পাওয়া যায় বলেই এই গীতিকায় কতকটা আধুনিকতার লক্ষণ দেখা যায়। আলোচনা করুন।

৮। মৈমনসিংহ গীতিকার অন্তর্ভুক্ত এবং আপনাদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত কোন পালাগানে প্রেম ও ত্যাগের বাণী কুশলতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে? দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা করুন।

৯। মৈমনসিংহ গীতিকা মধ্যযুগের সমাজ ও চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্য চিত্রশালা। — এই মন্তব্যের তাৎপর্য আলোচনা করুন।

১০। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র নায়িকাদের আচরণে আদিবাসী সমাজের নারীর যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তা পাঠ্য যে কোনো দুটি পালাগান থেকে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে লিখুন।

১১। 'কঙ্ক ও লীলা' পালাগানে পল্লিকবির বিরহ-দুঃখ বর্ণনার যে অসাধারণত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তা দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যক্ত করুন।

১২। 'দেয়ানা-মদিনা' পালায় তৎকালীন সমাজের পরিচয় কতখানি আছে, স্পষ্ট করে লিখুন।

১৩। 'চন্দ্রাবতী' পালায় একটি নারীর স্বাভাবিক জীবন ও তার বিবর্তন বেশ নিপুণতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে কিনা বিচার করুন।

১৪। 'মহুয়া' পালাটির কোথায় কোথায় কাব্যিক উৎকর্ষ বিশেষ প্রকাশ পেয়েছে দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন।

১৫। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র বহু পালায় নারীপ্রেমের এক শাশ্বত সত্য প্রকাশ পেয়েছে। কী সে সত্য বিশ্লেষণ করুন।

১৬। 'কাজলরেখা' পালাটির উৎকর্ষ বিচার করুন।

১৭। মৈমনসিংহ গীতিকা'র পালাগুলোয় প্রকৃতি ও মানবহৃদয় যেন এক আশ্চর্য সুরসঙ্গতিতে একাত্ম হয়ে পরস্পরের পরিপূরকরূপে প্রতিভাত হয়েছে। আপনার পঠিত পালাগুলি অবলম্বনে মন্তব্যটি বিশদ করুন।

১৮। বাঙালি সমাজের অনেক উপাদান যে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'-য় বিকীর্ণ রয়েছে তা আলোচনা করে দেখান।

১৯। 'লীলা ও কঙ্ক' পালায় রোমান্টিসিজমের সর্বথা প্রকাশ— দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

২০। লোকসাহিত্যের অন্তর্গত গীতিকার লক্ষণগুলি কী, বুঝিয়ে দিন। সেই প্রসঙ্গে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র আপনার পঠিত পালাগুলির মূল্যায়ন করুন।

২১। 'লীলা ও কঙ্ক' পালায় কোথায় কোথায় কাব্যিক উৎকর্ষ আছে, বিশ্লেষণ করে দেখান।

২২। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র আপনার পঠিত পালাগুলি থেকে অন্তত পাঁচটি উদাহরণযোগ্য অংশ লিখুন এবং সেগুলি উদাহরণযোগ্য কেন বুঝিয়ে দিন।

২৩। 'দেয়ানা-মদিনা' পালায় দুর্বৃত্ত চরিত্রটি ব্যক্তিবিশেষ, না শ্রেণিগত প্রতিনিধি বুঝিয়ে দিন।

২৪। 'লীলা ও কঙ্ক' গীতিকাটি অবলম্বন করে এতে প্রতিফলিত লোকসাহিত্যের লক্ষণগুলো বিচার করুন।

২৫। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন/টীকা লিখুন—

(ক) গীতিকার প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে নির্দেশ করুন।

(খ) টীকা লিখুন— পালঙ সই, কঙ্কণ দাসী, ধর্মমতী শুক।

(গ) মৈমনসিংহ গীতিকার ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(ঘ) মহুয়া পালায় প্রকৃতির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(ঙ) "কোথায় পাইবাম কলসী কইন্যা কোথায় পাইবাম দড়ি। তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুইব্যা মরি।"— তাৎপর্য নির্দেশ করুন।

৩.১৩ প্রসঙ্গ পুস্তক (References/Suggested Readings)

১। মৈমনসিংহ গীতিকা—- সম্পাঃ দীনেশচন্দ্র সেন।

২। বাংলার লোকসাহিত্য— আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৩। গীতিকা ঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য— বরুণকুমার চক্রবর্তী।

৪। মৈমনসিংহ গীতিকা— সম্পাঃ সুখময় মুখোপাধ্যায়।

* * *

চতুর্থ বিভাগ
রামেশ্বরের "শিবায়ন কাব্য"

বিষয় বিন্যাস ঃ

৪.০ ভূমিকা (Introduction)
৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
৪.২ শিবায়ন ঃ সংজ্ঞা বিষয়বস্তু ও কবি পরিচিতি
৪.২.১ শিবায়ন কাব্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ
৪.২.২ মঙ্গলকাব্য থেকে শিবায়ন কাব্যের পার্থক্য
৪.২.৩ শিবায়ন কাব্যের কবিকুল
৪.২.৪ রামেশ্বর ভট্টাচার্যের আত্মপরিচয় ও কাব্যের রচনাকাল
৪.২.৫ শিবায়ন কাব্যের বিষয়বস্তু
৪.৩ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা
৪.৩.১ চাষপালা
৪.৩.২ মৎস্যধরা পালা
৪.৩.৩ শঙ্খপরা বা গোসাপালা
৪.৪ চরিত্র বিশ্লেষণ
৪.৪.১ শিব
৪.৪.২ পার্বতী চরিত্র
৪.৪.৩ নারদ চরিত্র
৪.৪.৪ ভীম
৪.৫ শিবায়ন কাব্যের লৌকিক অংশের কাহিনি সূত্র
৪.৬ শিবায়ন কাব্যে সমাজচিত্র
৪.৭ শিবায়ন কাব্যের ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, প্রবচন
৪.৮ 'শিবায়ন' কাব্যে রামেশ্বরের ভণিতা প্রয়োগের বিশেষত্ব
৪.৯ প্রাসঙ্গিক টীকা
৪.১০ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ (Summing Up)
৪.১১ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি
৪.১২ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৪.০ ভূমিকা (Introduction)

'ধান ভানতে শিবের গীত'— বাংলাদেশে প্রচলিত এই বিশেষ উক্তিটি ধানের সঙ্গে শিবের স্পষ্ট সম্পর্ককে তুলে ধরে। বাংলাসাহিত্যের সমস্ত মঙ্গলকাব্যে শিবের একটি প্রধান জায়গা থাকলেও শুধুমাত্র শিবকে কেন্দ্র করে রচিত 'শিবায়ন' কাব্যে শিবের একটি বিশেষ চরিত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। বেদে শিব সংহারের দেবতা, উগ্র রুদ্র। এই রুদ্রকে প্রসন্ন করার প্রার্থনা বেদে উচ্চারিত। পরবর্তীতে তিনি মহান ও পরম প্রশান্ত বলে বন্দিত। ঋগবেদে, যজুর্বেদে, অথর্ববেদে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে, শতপথ ব্রাহ্মণে এই

শিব নানাভাবে উপস্থিত। পরবর্তীকালে রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশে শিবকে নানা ভূমিকায় আমরা দেখি। এই শিব মধ্যযুগে এসে ধর্মীয় ও সামাজিক বিবর্তনে কৃষক শিবে পরিণত হয়ে গেছেন। এই কৃষক শিবের কাহিনি নিয়েই 'শিবায়ন' কাব্য রচিত। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিব সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন' কাব্য এই ধারার শ্রেষ্ঠ কাব্য। এই কাব্যে শিবায়ন কাব্যধারার সব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। কবির মূল বাসভূমি ছিল মেদিনীপুর জেলার যদুপুর গ্রামে। পরে কবি কর্ণগড়ে চলে আসেন। তাঁর কাব্যের সমস্ত সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ পুঁথি জন্মভূমি যদুপুর অথবা কর্মভূমি কর্ণগড়ের নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। এই কাব্য প্রথম প্রকাশ করেন সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রের স্বত্বাধিকারীগণ। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের সম্পাদনায় ১২৬০ সালে এটি প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়বার শ্রী ঈশানচন্দ্র বসুর সম্পাদনায় ১২৯৩ সালে বঙ্গবাসী মুদ্রণযন্ত্র থেকে প্রকাশিত হয়। তৃতীয়বার এই কাব্যে 'শ্রী শ্রী শিব-সঙ্কীর্ত্তন' নামে হিতবাদী কার্যালয় থেকে ১৩০৬ সালে প্রকাশিত হয়। চতুর্থবার ১৩১০ সালে বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে পূর্বপ্রকাশিত শিবায়ন কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। পঞ্চমবার শিবায়ন কাব্যের প্রকাশের কৃতিত্ব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। শ্রী যোগিলাল হালদারের সম্পাদনায় ১৩৬৪ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যকে ত্রুটি মুক্ত করে প্রকাশের চেষ্টা করেন শ্রী পঞ্চানন চক্রবর্তী। তাঁর সম্পাদনায় কাব্যটি ১৩৭১ সালে প্রকাশিত লাভ করে। রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর কাব্যে কালজ্ঞাপক যে হেঁয়ালীপূর্ণ ভাষার শ্লোক দিয়ে গেছেন তা থেকে অনুমান করা যায় বাংলা ১১১৮ সাল অর্থাৎ ১৬৩২ শকাব্দ বা ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে কবি এই কাব্যটি রচনা করেন। কবি কাব্যে জন্ম সালের কোনো ইঙ্গিত দিয়ে জাননি। তবে কবির গুরু চন্দ্রচূড় চক্রবর্তীর বংশধর পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর রোজনামচা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি কবি আনুমানিক ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহন করেন। এই রোজনামচায় কবির মৃত্যুর সময়কাল স্পষ্টভাষায় উল্লেখিত। সেখান থেকে আমরা জানতে পারি যশোমন্তের মৃত্যুর পূর্বে ১৭৪৪ খিস্টাব্দে কবি লোকান্তরিত হন। কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্যের পুঁথি আবিষ্কার ও প্রকাশের ফলে আমরা এই কাব্যধারার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করতে পারি। মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক ধারা থেকে শিব বিষয়ক কাহিনি যে ভিন্ন খাতে বহে যেতে পারে রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্য তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পরবর্তী পর্যায়ে 'শিবায়ন' কাব্যের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের নানা বৈচিত্র্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

শিবকে কেন্দ্র করে রচিত 'শিবায়ন' কাব্য মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের এক বিশেষ কাব্যধারা। এই কাব্যধারার সূচনা হয় সপ্তদশ শতকে। অষ্টাদশ শতকের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের হাতে এর পূর্ণ বিকাশ। 'শিবায়ন' কাব্য ব্যতীত মধ্যযুগের কাব্য আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই বিভাগে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন' কাব্যের চাষপালা অংশের বিস্তারিত আলাচনা করা হবে। 'শিবায়ন' কাব্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ, এই শাখার কবিকুল, অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এই কাব্যধারার পার্থক্য, রামেশ্বর ভট্টাচার্যের পরিচয়, কাব্যের রচনাকাল প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে এই কাব্যের লৌকিক অংশের অন্তর্ভুক্ত

বিভিন্ন পালার বিষয়বস্তু, চরিত্র, সমাজচিত্র, কাব্যের লৌকিক অংশের নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে কাব্যের আরো নানা দিক বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গীতে তুলে ধরা হবে। এককথায় রামেশ্বরের কাব্যের সার্বিক মূল্যায়ন তুলে ধরাই এই বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য।

৪.২ শিবায়ন ঃ সংজ্ঞা বিষয়বস্তু ও কবি পরিচিতি

এই অধ্যায়ে প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলো হল শিবায়ন কাব্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ, অন্যান্য মঙ্গলকাব্য থেকে শিবায়ন কাব্যের পার্থক্য, শিবায়ন কাব্যের কবিকুল, কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের পরিচয় ও কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিব সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন' কাব্যের রচনাকাল। এই সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল।

৪.২.১ শিবায়ন কাব্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য কাব্যধারা হচ্ছে শিবায়ন। মধ্যযুগের সাহিত্য রচনার কেন্দ্রে রয়েছে ধর্ম। ধর্মীয় দেব-দেবীকেই এই সময়ের কবিরা তাঁদের রচনায় প্রধান স্থান দিয়েছেন। এই সময়ে মঙ্গলকাব্যের ধারা বাংলা সাহিত্যে একটি বিশাল স্থান অধিকার করে আছে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃতি। বিশেষ ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক কারণে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব। এই মঙ্গলকাব্যধারার কাহিনিতে কোনো নির্দিষ্ট দেবতা বা দেবীর প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। মনসা, চণ্ডী, ধর্ম প্রভৃতি দেবতারা এই কাব্যগুলোর প্রধান জায়গা জুড়ে আছেন। দেবাদিদেব শিবকেও কেন্দ্রে রেখে এক ধরনের সাহিত্য রচনার প্রয়াস মধ্যযুগে লক্ষ করা যায়। শিবকেন্দ্রিক এই ধরনের রচনা শিবায়ন কাব্যরূপে পরিচিত।

শিবায়ন কাব্যের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শুধুমাত্র শিবের প্রসঙ্গ থাকলেই সেই কাব্যটি 'শিবায়ন' কাব্য হয়ে উঠতে পারে না। বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে পুরাণের ধারায় প্রবাহিত হয়ে মধ্যযুগে এসে শিবের বিভিন্ন রূপ আমাদের চোখে পড়ে। বেদের রুদ্র, পুরাণের শিব ক্রমবিবর্তনের পথে মধ্যযুগে বাংলাদেশে কৃষক শিবে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। শিবায়ন কাব্যে এই কৃষক শিবের প্রাধান্য আমরা দেখতে পাই।

শিবায়ন কাব্যধারার প্রধান কবিদের কাব্যে শিবের পৌরাণিক রূপ ও লৌকিক কৃষক রূপ উভয়ই কমবেশি বিদ্যমান। তবে লৌকিক কৃষক শিবের যথাযথ চিত্রাঙ্কনের মধ্যেই শিবায়ন কাব্যের বিশিষ্টতা নির্ভর করে। শিবায়ন কাব্যের প্রথম কবি শঙ্কর কবিচন্দ্রের কাব্যেই বাংলাসাহিত্যে কৃষক শিবের চরিত্র প্রথম ফুটে উঠেছে। তাঁর পরবর্তী কবি রামকৃষ্ণ রায় পৌরাণিক শিবের ওপরেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। লৌকিক শিবের উপস্থিতি সেখানে স্বল্পমাত্রায়। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যেই কৃষক শিবের যথাযথ চরিত্র আমরা ফুটে উঠতে দেখি। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যই এই শাখার শ্রেষ্ঠ কাব্য।

দরিদ্র শিবকে স্ত্রী পার্বতীই কৃষিকাজে প্ররোচিত করেন। শিব ইন্দ্রের নিকট থেকে জমি, কুবেরের নিকট থেকে বীজধান, নিজের শূল ভেঙে কৃষিকাজের সরঞ্জাম, বাহন বৃষ ও যমের নিকট থেকে মহিষ ধার করে কৃষিকাজ করতে মনস্থ করেন। যথারীতি অনুচর ভীমকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হন। শিব কৃষিক্ষেত্রে এসে সংসার ভুলে বসে আছেন। স্ত্রী পার্বতী কোনো উপায়ে শিবকে ফিরিয়ে নিতে না পেরে অবশেষে বাগদিনীবেশে স্বামীকে ফিরিয়ে নিতে আসেন। ছলনা করে স্বামীকে ভুলিয়ে তিনি কৈলাসে চলে যান। স্ত্রীর পিছু পিছু শিবও কৈলাসে গিয়ে উপস্থিত হন। তখন পার্বতী স্বামীর কাছে দুইবাই শঙ্খ চান। শিব শঙ্খ দিতে অক্ষম হয়ে স্ত্রীকে কটূক্তি করেন। পার্বতী অভিমান করে বাপের বাড়িতে চলে যান। শিব শাঁখারীর ছদ্মবেশে হিমালয়গৃহে গিয়ে অবশেষে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে কৈলাসে ফিরে আসেন। শিবায়ন কাব্যধারায় এটাই প্রচলিত লৌকিক শিবকাহিনি।

৪.২.২ মঙ্গলকাব্য থেকে শিবায়ন কাব্যের পার্থক্য

শিবায়ন ধারার কাব্যে শিবের কাহিনিই প্রধান। দেবতার প্রাধান্য দেখে মঙ্গল কাব্যের সঙ্গে এই কাব্যধারার সাদৃশ্যের কথা আমাদের মনে আসে। এছাড়া এই দুই কাব্যধারার আর একটি প্রধান মিল এই যে মঙ্গলকাব্য যেভাবে গীত হয়, শিবায়নও সেভাবে গীত হয়। শিবায়নের মধ্যে মঙ্গলরাগ ও মালসী রাগিনীর উল্লেখ আছে।

তবে মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে শিবায়নের সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্য অনেক বেশি। এই দুই কাব্যধারার প্রধান বৈসাদৃশ্যগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল।

১। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে দেবখণ্ড ও নরখণ্ড থাকে। দেবখণ্ডে পৌরাণিক দেবদেবীর কথা প্রাধান্য পায় আর নরখণ্ডে স্বর্গভ্রষ্ট দেবদেবীর মানব-মানবী রূপের কাহিনি প্রাধান্য পায়। শিবায়ন কাব্যে মঙ্গলকাব্যের এই নির্দিষ্ট খণ্ডবিভাগ নেই। পৌরাণিক অংশে দেব-দেবীর কাহিনি প্রাধান্য লাভ করলেও লৌকিক অংশে স্বর্গভ্রষ্ট কোনো দেব-দেবীকে পাওয়া যায় না।

২। মঙ্গলকাব্যে নির্দিষ্ট দেবতা বা দেবীর পূজা প্রচার মুখ্য, শিবায়নে পূজা প্রচারের কোনো প্রসঙ্গই নেই।

৩। মঙ্গলকাব্যে দেবতা বা দেবীর মহিমা প্রচার প্রধান। সেই দেবতা তাঁর ভক্তদের বরদান দিয়ে তাদের অভিষ্ট সিদ্ধ করেন। আবার এই দেবতাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কেউ যদি তাঁদের পূজো না করেন তা হলে তাকে অন্যায়ভাবে পীড়ন করতেও তাঁদের বাধে না। শিবায়ন কাব্যে কিন্তু শিবের মহিমা প্রচার প্রধান নয়। এই কাব্যধারার শিব মুহুর্মুহু বরদানে ভক্তকে ঐশ্বর্যবান করেননি বা অতিরিক্ত আক্রোশ বশে কাউকে অভিশাপেও জর্জরিত করেননি। শিবায়নের শিব সদানন্দময় উদাসীন।

৪। মঙ্গলকাব্যে সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু শিবায়ন কাব্যে কোনো বিশেষ ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা নেই।

৪.২.৩ শিবায়ন কাব্যের কবিকুল।

সপ্তদশ শতকে শিবায়ন কাব্যধারার উদ্ভব। এই শতকের দুজন কবির শিবায়ন কাব্য আমার পাই। এই দুজন কবি হলেন শঙ্কর কবিচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ রায়।

শঙ্কর কবিচন্দ্রের কাব্য প্রতিভা বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত। তিনি শিবায়ন ছাড়াও রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদও করেন। এছাড়া তিনি শীতলামঙ্গল কাব্যও রচনা করেন। সপ্তদশ শতকে মধ্যভাগে বিষ্ণুপুরের এক ব্রাহ্মণ বংশে কবির জন্ম। গবেষকরা মনে করেন ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তাঁর শিবায়ন কাব্য রচিত হয়। শঙ্করের শিবায়ন বা শিবমঙ্গলের সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায়নি। 'তাঁর মৰ্চ্ছধরা' (মৎস্যধরা) পালাটিই শুধু আবিষ্কৃত হয়েছে। গৌরী নিষ্কর্মা ভিক্ষোপজীবী বৃদ্ধ স্বামীর নিন্দা করলে শিব ভাগিনা ভীমকে সঙ্গে নিয়ে কৈলাস ত্যাগ করে চাষবাস করতে যান। এদিকে স্বামীর অবর্তমানে উতলা হয়ে গৌরী বাগদিনী বেশে মৎস্য ধরার ছলে শিবের ক্ষেত্রে উপস্থিত হন ও নানা কৌশলে শিবকে ভুলিয়ে কৈলাসে নিয়ে আসেন। গবেষকরা মনে করেন কৃষক শিবকে নিয়ে রচিত শিবায়ন কাব্যধারার এটি প্রথম কাব্যগ্রন্থ। পরবর্তীকালে রামেশ্বর এই গ্রন্থকে অনুসরণ করেছিলেন।

শিবায়নের পরবর্তী কবি রামকৃষ্ণ রায়। তিনি তাঁর শিববিষয়ক কাব্যকে কোথাও 'শিবমঙ্গল' কোথাও বা 'শিবায়ন' বলেছেন। হাওড়া জেলার আমতার নিকট দামোদরের তীরে অবস্থিত রসপুর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। কবির বংশধরদেব কাছে রক্ষিত দলিল-পত্রাদি থেকে অনুমান করা যায় কবির কাব্যটি ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়েছে। কবির কাব্যে বিভিন্ন সংস্কৃত পুরাণগ্রন্থের প্রভাব রয়েছে। তাঁর কাব্য মঙ্গলকাব্য অপেক্ষা পুরাণগ্রন্থের অধিক অনুগামী। তবে লৌকিক শিবায়ন শ্রেণির 'বঙ্গধামালি' এই কাব্যে কিছু কিছু লক্ষিত হয় বলে তাকে সহজেই শিবায়ন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। খাঁটি শিবায়নের ঢঙে হর-পার্বতীর দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা করেছেন। তবে সমস্ত কাব্য জুড়ে পৌরাণিক কাহিনির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

৪.২.৪ রামেশ্বর ভট্টাচার্যের আত্মপরিচয় ও কাব্যের রচনাকাল

শিবায়ন কাব্যধারার সর্বশ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় কবি হচ্ছেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর কাব্যে বিস্তৃতভাবে আত্মপরিচয় রেখে গেছেন। তার সূত্র ধরে গবেষকরা কবির জীবনী সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এ প্রসঙ্গে পঞ্চানন চক্রবর্তীর গবেষণাকর্ম উল্লেখযোগ্য। কবি তাঁর কাব্যে বহুবার জন্মভূমি যদুপুর গ্রামের উল্লেখ করেছেন। শিবায়ন কাব্য ছাড়া তাঁর 'সত্য নারায়ণের পাঁচালী' তেও কবি এই যদুপুর গ্রামের কথা বলেছেন। যদুপুর গ্রাম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার বরদা পরগণার অন্তর্ভুক্ত। পঞ্চানন চক্রবর্তী কবির পরিচয় জানতে যদুপুর গ্রামে গেছেন ও কবির বাস্তুভিটা, সমাধিক্ষেত্র, পঞ্চমুক্তির আসন, কর্ণগড়ের কবির পৃষ্ঠপোষক রাজার রাজপ্রসাদ প্রভৃতির আলোকচিত্র সংগ্রহ করে তাঁর সম্পাদিত কাব্যে প্রকাশে করেছেন। তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি এই যদুপুর গ্রামের সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনাসূত্র জড়িত। বরদা থেকে যদুপুর গ্রাম ছয়মাইল, কিন্তু মাঠের মধ্য দিয়ে বরদা-বর্ধমান পথে এটা চারমাইলের বেশি নয়। এই পথ দিয়ে রাজা শোভাসিংহ ও আফগান সর্দার রহিম

খাঁ বর্ধমান অভিযান করেছিলেন। যদুপুরের একটি বিশাল দীঘির পাশ দিয়ে এই রাস্তাটি গেছে। এই দীঘির সঙ্গে কবি রামেশ্বরের ব্যক্তিগত কিছু ঘটনা যুক্ত রয়েছে। কবির স্ত্রী সুমিত্রা অপূর্ব রূপলাবণ্যময়ী ছিলেন। একদিন সুমিত্রা ঐ দীঘিতে স্নান করতে গিয়েছিলেন। জমিদার শোভা সিংহ তখন ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সুমিত্রার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে জোর করে অশ্বের ওপর বসিয়ে নিয়ে যেতে চান। শেষ পর্যন্ত সুমিত্রার আত্মরক্ষার প্রয়াসে শোভা সিংহ তাঁকে ফেলে যেতে বাধ্য হন। রামেশ্বর এই ঘটনায় প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হন ও তাঁর তন্ত্রসাধনার স্থান পঞ্চমুণ্ডির আসনে এক মারণযজ্ঞের আয়োজন করেন। শোভাসিংহের স্ত্রী অজিতাসুন্দরী এই খবর পেয়ে রামেশ্বরের নিকট উপস্থিত হন এবং তার কাছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চান। রামেশ্বর এই মারণযজ্ঞ থেকে নিবৃত্ত হন এই শর্তে যে শোভাসিংহ যাতে আর কোনো রমণীর ওপর বলপ্রয়োগ না করেন। অজিতাসুন্দরী কবির কাছে এই বিষয়ে অঙ্গীকার করলেও স্বামীকে তিনি এ বিষয়ে স্বমতে আনতে পারেন না। শোভাসিংহ বরং স্ত্রীর ওপরে প্রচণ্ড রেগে যান ও স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন। এর কয়েক বছর পরই শোভা সিংহ নিহত হন। শোভাসিংহের পর তাঁর অনুজ হেমৎ সিং রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে শোভাসিংহকে নিয়ে রামেশ্বর একটি কবিতা লেখেন যেখানে তিনি রাবণ ও দুর্যোধনের সঙ্গে শোভাসিংহের তুলনা করেন। নিজের পাপের কারণেই শোভাসিংহের মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি এই কবিতায় স্পষ্ট করেই বলেন। অগ্রজকে নিয়ে এই ব্যঙ্গাত্মক কবিতায় হেমৎ সিংহ প্রচণ্ড ক্ষেপে যান এবং কবির ঘরদোর ভেঙে তাঁকে এই গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেন। যদুপুরের প্রবীন ব্যক্তিদের কাছ থেকে গবেষক পঞ্চানন চক্রবর্তী এই তথ্য সংগ্রহ করেন। কবি তাঁর শিবায়ন কাব্যে এই প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন এভাবে, 'পূর্ব্ববাস যদুপুরে হেমৎ সিং ভাঙ্গে যাবে'। এর সঙ্গে পঞ্চানন চক্রবর্তী আর একটি তথ্যের সংযোজন করেছেন। সেটাও লোকশ্রুতি থেকে সংগৃহীত। সিংহভ্রাতৃদ্বয়ের পূজিতা দেবী বিশালাক্ষ্মীর পূজা করতে অসম্মত হওয়ার জন্যে কবি তাঁদের অত্যাচারের শিকার হন। অত্যাচারিত কবি অতঃপর কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং রামসিংহ কবিকে তাঁর রাজসভায় পুরাণ পাঠক হিসেবে নিযুক্ত করেন। তিনি কবিকে কেশপুর থানার অযোধ্যনগর গ্রামে বাসগৃহও নির্মাণ করিয়ে দেন। রামসিংহের পুত্র যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে কবির প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। যশোবন্ত সিংহ রাজা হওয়ার পর কবিবন্ধু রামেশ্বরকে শিবায়ন কাব্য রচনা করতে অনুরোধ করেন। যশোবন্তের রাজসভাকবি রামেশ্বর সুহৃদের ইচ্ছানুসারে ও নিজের অন্তরের তাগিদে শিবায়ন কাব্য রচনা করেন।

শিবায়ন কাব্যে রামেশ্বর তাঁর বংশ পরিচয় বিস্তারিতভাবে দিয়েছেন। তাঁর শিবায়ন থেকে আমরা জানতে পারি কবির পূর্বপুরুষ ছিলেন মহর্ষি ভট্টনারায়ণ। কবির প্রপিতামহ নারায়ণ চক্রবর্তী, পিতামহ গোবর্দ্ধন চক্রবর্তী, পিতা লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য। আদিতে কবির পূর্বপুরুষদের বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধি ছিল। পরবর্তীকালে কবির প্রপিতামহ, পিতামহ চক্র বা রাজ্যের স্বামী বা পণ্ডিতরূপে চক্রবর্তী উপাধি গ্রহণ করেন। কবির পিতা সর্বদর্শনের অধ্যাপকরূপে খ্যাতি লাভ করে ভট্টাচার্য উপাধি লাভ করেন। সেই ধারা অনুসরণ করে কবি ও তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের সকলে ভট্টাচার্য উপাধি ব্যবহার করতেন। কবির মাতার নাম ছিল রূপবতী। কবি সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী নামের দুই পত্নী ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শম্ভুরাম। তাঁর তিনবোন যথাক্রমে গৌরী, পার্বতী ও সরস্বতী।

ছয় ভাগিনেয়ের মধ্যে কবি দুর্গাচরণের নাম উল্লেখ করেছেন। ভাগিনাতনয় কৃষ্ণরামের কথাও আমরা কবির আত্মপরিচয় অংশে থেকে জানতে পারি। নিজের পরিবারের পণ্ডিত বাইরে কবি তাঁর গুরু চন্দ্রচূড় চক্রবর্তীর কথা তাঁর কাব্যে বার বার উল্লেখ করেছেন। আবার তাঁর দুই পরম সুহৃদ পরমানন্দ ও হৃদয়রামের কথা উল্লেখ করতেও কবি ভুলেননি। সর্বোপরি যাঁদের কথা পরম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে কবি তাঁর কাব্যে বহুবার উল্লেখ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন কর্ণগাড়ের তাঁর আশ্রয় দাতা রাজা রামসিংহ ও তাঁর পুত্র পরম সুহৃদ যশোবন্ত সিংহ। পরিবার ও আপনজন পরিবেষ্টিত কবির এই সার্বিক পরিচয় আমরা তাঁর কাব্যে থেকে সহজেই পেয়ে থাকি।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিব সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন কাব্যের রচনাকাল মধ্যযুগের অধিকাংশ কবিই হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষায় তাঁদের কাব্যের রচনাকাল উল্লেখ করেছেন। রামেশ্বর ভট্টাচার্যও তার ব্যতিক্রম নন। বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত ও প্রকাশিত রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যের নানা পুঁথিতে এই হেঁয়ালিপূর্ণ শ্লোকের উল্লেখ আমরা পাই। গ্রন্থ রচনার কাল সম্পর্কে ১২৬০ সালে সংবাদপূর্ণ চন্দ্রোদয় যন্ত্রে শিবায়ন গ্রন্থে আমরা পাই—

শিবগীতা কত কথা করিয়া বর্ণন।
নাথের অষ্টাহ হল নূতন কীর্তন।।
শাকে হলে চন্দ্রকলা রাম করতলে।
বাম হৈল বিধিকান্ত পড়িল অনলে।।
সেই কালে শিবের সঙ্গিত হল সারা।

অবনীত আসি যেন অমৃতের ধারা।। (মূল গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতার অভাবে এই উদ্ধৃত অংশটি পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত 'রামেশ্বর ঘটনাবলী' বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম সংস্করণ ১৩৭১-এর ভূমিকা থেকে নেওয়া হয়েছে। পৃষ্ঠা-৭৪)

বঙ্গবাসী প্রেস থেকে ১২৯৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত শিবায়ন কাব্যে রচনাকাল সম্পর্কীত শ্লোকের একটু ভিন্ন রূপ আমরা দেখি—

শিবান্বিতা কতকথা করিয়া বর্ণন।
নাথের অষ্টাহ হৈল নূতন কীর্তন।।
শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম কল্য কোলে।
বাম হৈল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে।।
সেইকালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা।
অবনীতে আইল যেন অমৃতের ধারা।। (তদেব, পৃঃ ৭৪)

পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত অগ্রহায়ণ ১৩৭১-এ প্রকাশিত গ্রন্থে আমরা উপরোক্ত দ্বিতীয় শ্লোকেরই উল্লেখ পাই—

"শিবান্বিতা কত তথা করিয়া বর্ণন।
নাথের অষ্টাহ কৈল ভূতলে কীর্তন।।
শাকে হল্য চন্দ্রকলা রাম কৈল কোলে।

বাম হল্য বিভিকান্ত পড়িল অনলে।।
সেইকালে শিবের সঙ্গীত হল সারা।
অবনীতে আইল যেন অমৃতের ধারা।। (শিবায়ন, পৃঃ ৫০৪).

প্রথমে বঙ্গবাসী প্রেম ও পঞ্চানন চক্রবর্তীর কাব্যের শ্লোকের ব্যাখ্যা করে শিবায়ন কাব্যেরক রচনাকাল নির্ণয় করা যেতে পারে। 'শাকে হল্য চন্দ্রকলা রাম কৈল কোলে' পংক্তিটির মধ্যে 'শাক' শব্দটির অর্থ হ'ল শকাব্দ। 'চন্দ্রকলা' অর্থে ১৬ রাম বলতে ৩ রাম— ভৃগুরাম, দাশরথি রাম এবং বলরাম, কৈল্যকোলে অর্থাৎ 'কোলে' নিতে দুই হাতের দরকার অর্থ ধরা যেতে পারে। আচার্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি প্রথম পংক্তির হেঁয়ালিপূর্ণ শব্দাবলির এই অর্থ নির্ণয় করে দ্বিতীয় পংক্তি 'বাম হৈল বিধিকান্ত পড়িল অনলে' অবলম্বনে অঙ্কের প্রচলিত বামা গতি না ধরে দক্ষিণা গতি ধরে ১৬৩২ শকাব্দ নির্ণয় করেছেন। শকাব্দের সঙ্গে ৭৮ যোগ করলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। এই হিসেবে শিবায়ন কাব্যের রচনাকাল ১৬৩২ শকাব্দ+৭৮=১৭১০ খ্রিস্টাব্দ। সুকুমার সেনও যোগেশচন্দ্র রায়ের সঙ্গে একই মত পোষণ করে বলেন— "শিবায়ন রচনা শেষ হইয়াছিল ১৬৩২ শকাব্দে (১৭১০-১১)। (সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৭৮৭) আবার ভিন্ন পুঁথির 'রাম করতলে' অর্থে করতল (কর) ২ বসিয়ে একই খ্রিস্টাব্দ নির্ণয় করা যেতে পারে। এই হেঁয়ালিপূর্ণ শ্লোকার্থ ছাড়াও আমরা ইতিহাস অনুসরণেও প্রায় একই খ্রিস্টাব্দ পেয়ে থাকি। মেদেনীপুরের ইতিহাস রচয়িতা রাজা মহেন্দ্রলাল খান তাঁর 'The History of the Midnapur Raj' গ্রন্থে রাজা রামসিংহের মৃত্যুর পর রাজা যশোবন্ত সিংহের ১১১৮ বঙ্গাব্দে সিংহাসনে আরোহণের উল্লেখ করেছেন। ১১১৮ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৬৩২ শকাব্দ বা ১৭১১ খ্রিস্টাব্দ। কবির কাব্য থেকে আমরা জানতে পারি যশোবন্ত সিংহের রাজসভায় কবি তাঁর শিবায়ন কাব্য রচনা করেন—

যশোবন্ত সিংহ সিংহবাহিনীর দাস।
সে রাজসভায় হৈল সঙ্গীত প্রকাশ।। (শিবায়ন, পৃঃ ৫০৫)

সুতরাং কবির কাব্যের রচনাকাল ১৭১০-১১ খ্রিস্টাব্দ ধরতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকে না।

৪.২.৫ শিবায়ন কাব্যের বিষয়বস্তু

শিবায়ন কাব্য শিবচরিত্রকে কেন্দ্র করে রচিত। শিবকেন্দ্রিক এই কাব্যখানির দুটো অংশ লক্ষ করা যায়। প্রথম অংশে আছে পৌরাণিক শিবের আখ্যান, দ্বিতীয় অংশে আছে কৃষক শিবের আখ্যান। মঙ্গল কাব্যের মতো দেবখণ্ড ও নরখণ্ডে বিভক্ত কাব্য এটি নয়।

শিবায়ন কাব্যখানি সাতপালায় বিভক্ত। প্রত্যেক দিন ও রাত্রিতে এক পালা গীত হওয়াই রীতি। সাত দিবসীয় এই পালাগুলোর নাম হল—

১। প্রথম দিবসীয় নিশাকালে স্বপ্নপালা আরম্ভ।
২। দ্বিতীয় দিবসীয় দিবাপালা দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ।

৩। দ্বিতীয় দিবসীয় নিশাপালা আরম্ভ।
৪। তৃতীয় দিবসীয় দিবাপালা ধূলাখেলা আরম্ভ।
৫। তৃতীয় দিবসীয় নিশা বিবাহপালা আরম্ভ।
৬। চতুর্থ দিবসীয় দিবাপালা আরম্ভ।
৭। চতুর্থ দিবসীয় নিশাপালা আরম্ভ।
৮। পঞ্চম দিবসীয় দিবাপালা আরম্ভ।
৯। পঞ্চম দিবসীয় নিশাপালা।
১০। ষষ্ঠদিবসীয় দিবাপালা আরম্ভ।
১১। ষষ্ঠদিবসীয় নিশাপালা আরম্ভ।
১২। সপ্তম দিবসীয় দিবাপালা আরম্ভ।
১৩। সপ্তম দিবসীয় নিশাপালা আরম্ভ।
১৪। অথ জাগরণ পালা।

উপরিউক্ত বিভিন্ন শিরোনাম দিয়ে রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর কাব্যখানিকে সাতটি পালায় বিভক্ত করেছেন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো এই কাব্যেও গণেশবন্দনা, সদাশিব বন্দনা, ভগবতী বন্দনা, চৈতন্য বন্দনা, দিগবন্দনা দিয়ে গ্রন্থের সূচনা হয়েছে। এর পরেই পুরাণাশ্রিত শিবকাহিনি আরম্ভ হয়েছে। প্রথম পালা 'প্রথম দিবসীয় নিশাকালে স্থাপনাপালা আরম্ভ'-এ পুরাণানুযায়ী সৃষ্টি বর্ণনা করা হয়েছে। নৈমিষারণ্যে সূত প্রতি মুনিগণের প্রশ্ন, ব্যাসশিষ্য সূতমুনির কথারম্ভ, সৃষ্টির দেবতা, সৃষ্টি প্রকরণ, পৃথিব্যাদির উৎপত্তি— এই বিষয়গুলো বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রথম দিবসীয় নিশাপালা সমাপ্ত হয়েছে। 'দ্বিতীয় দিবসীয় দিবাপালা দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ' —এই পালাটিতে দক্ষযজ্ঞ, শিবসন্নিধানে নারদের গমন, দক্ষযজ্ঞে সতীর গমনোদ্যোগে শিব-সতী সংবাদ, সতীর দক্ষালয়ে গমন, নন্দীকর্তৃক শিবমাহাত্ম্য কথন এবং সতীর দেহত্যাগ বর্ণিত হয়েছে। সতীর মৃত্যুতে নন্দীর ক্রোধ ও দক্ষসেনার সঙ্গে সংগ্রাম, দক্ষসেনার সঙ্গে বীরভদ্রের সংগ্রাম, বীরভদ্র কর্তৃক দক্ষসেনা ধ্বংস, দক্ষযজ্ঞ নাশ, দক্ষের ছাগমুণ্ড— এই বিষয়গুলো দ্বিতীয় দিবসীয় নিশাপালার বর্ণিতব্য বিষয়। 'তৃতীয় দিবসীয় দিবাপালা ধূলাখেলা আরম্ভ' অংশে হিমালয়ে গৌরীর জন্ম, গৌরীর বাল্যলীলা, গৌরীর পুত্তলিকা বিবাহ, পুত্তলী বরকন্যা বিদায়, ক্রীড়াচ্ছলে গৌরীর শিবসেবা, গৌরীর বিবাহ সম্বন্ধ, হিমালয় গৃহে শিবের আগমন, কামদেব ভস্ম, রতিবিলাপ, রতি সরস্বতী সংবাদ দিয়ে ধূলাখেলা তৃতীয় পালা সমাপ্ত হয়েছে। 'তৃতীয় দিবসীয় নিশা বিবাহপালা আরম্ভ' অংশের বর্ণিতব্য বিষয় হচ্ছে শিবের বরযাত্রা, গৌরীর গন্ধাধিবাস, এয়োগণের নাম, স্ত্রী আচার, মেনকা বিলাপ, মহেশের মদনমূর্তি ধারণ, মহেশের মোহন মূর্তির প্রশংসা, শাশুড়িদের জামাই নিন্দা, কন্যা সম্প্রদান, হরগৌরীর যৌতুক। চতুর্থ দিবসীয় দিবাপালায় রয়েছে ভিক্ষাপালা ও কুচনীর পালা। এখানে শিবের কোচের নগরে গমন, শিবের ভিক্ষা, শিবের ভিক্ষাদ্রব্য নিয়ে কার্তিক গণেশের কোন্দল, গৌরীর রন্ধন, পিতা-পুত্রের ভোজন, দেবীর ভোজন, কৈলাশপুরীর শোভা, হরগৌরীর কলহ, শিবের ঝুলি থেকে রত্নপ্রাপ্তি বর্ণিত হয়েছে। 'চতুর্থ দিবসীয় নিশাপালা আরম্ভ'— এই অংশ মূলত হরিনাম পালা। হরগৌরীর রঙ্গ, শিবকর্তৃক তত্ত্বকথা কথন, শিবকর্তৃক গৌরীমহিমা কথন, দিলীপ উপাখ্যান ও হরিনাম মাহাত্ম্য, হরিনাম মাহাত্ম্য ও রুক্মিণীর ব্রত, বিষ্ণু মাহাত্ম্য, জীবন্তী উপাখ্যান ও হরিনাম মাহাত্ম্য, বিষ্ণুদূত ও যমদূতের যুদ্ধ, যম ও যমদূতের কথোপকথন রামনাম মাহাত্ম্য,

শবর উপাখ্যান, শবরের বরপ্রাপ্তি দিয়ে এই পালা সমাপ্ত হয়েছে। 'পঞ্চম দিবসীয় দিবাপালা আরম্ভ'— এই পালাটিতে রুক্মিণীহরণ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। রুক্মিণীর বিবাহ বৃত্তান্ত, বৃদ্ধবিপ্র কর্তৃক রুক্মিণীর বার্তা নিবেদন, রুক্মিণী স্বয়ম্বরে শ্রীকৃষ্ণের বিদর্ভযাত্রা, রুক্মিণী বিবাহে নান্দীমুখাক্রিয়া, রুক্মিণী বিলাপ, শ্রীকৃষ্ণের বিদর্ভনগরে আগমন, অম্বিকার নিকটে রুক্মিণীর বরপ্রার্থনা, রুক্মিণীর রূপবর্ণন, রুক্মিণী হরণ, রাজগণের সঙ্গে যুদ্ধ, রুক্মিণীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাযাত্রা— এই পালায় এই বিষয়গুলোই প্রধান। 'পঞ্চম দিবসীয় নিশাপালায়' উষাহরণ পালা বর্ণিত হয়েছে। বাণরাজার উপাখ্যান দিয়ে পালটি শুরু। তারপর একে একে শিবের নিকট বাণরাজার যুদ্ধপ্রার্থনা, উষার স্বপ্নদর্শন ও অনিরুদ্ধ আনয়ন, উষা-অনিরুদ্ধের মিলন, দ্বাররক্ষক কর্তৃক বানের নিকট উষা-অনিরুদ্ধের সংবাদপ্রদান, দ্বারকায় গোবিন্দমন্দিরে শোক, যদুবৃন্দের বাণরাজার সঙ্গে যুদ্ধ, হরিহরের সংগ্রাম, মাহেশ্বর জ্বরের উদ্ভব, মহেশ্বরের স্তুতি, বাণের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ, শিব কর্তৃক কৃষ্ণের স্তব, বাণরাজার প্রতি আশীর্বাদ, উষা-অনিরুদ্ধের বিবাহ বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ দিবসীয় দিবাপালায় শিবরাত্রির ব্রতকথা রয়েছে। সেখানে বৃকাসুর উপাখ্যান, কৈলাসে হরগৌরী সংবাদ, শিবরাত্রিবিধি, ব্যাধের মৃগয়ায় গমন, ব্যাধের শিবপূজা, শিবদূত ও যমদূতের কথোপকথন যুদ্ধোগমন, শিবদূত ও যমদূতের যুদ্ধ, ব্যাধের শিবলোক প্রাপ্তি, শিবমন্দিরে যম ও নন্দীর কথোপকথন, শিবরাত্রি ব্রতের এই সমস্ত বিষয়বস্তু বর্ণনা করে শিবরাত্রি ব্রতপালা সমাপ্ত হয়েছে। এরপর একাদশী মাহাত্ম্য পালা বর্ণিত হয়েছে। এই ষষ্ঠদিবসীয় দিবাপালা পর্যন্ত অংশ আমরা পৌরাণিক খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। কিছু কিছু জায়গায় লৌকিক ভাবের প্রকাশ ঘটলেও এই অংশগুলিতে কবি প্রধানত পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, নন্দিকেশ্বর পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' প্রভৃতি পৌরাণিক ও ক্লাসিক সাহিত্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে কৃতবিদ্য এই কবির পুরাণে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তার পরিচয় পৌরাণিক খণ্ডে আমরা ফুটে উঠতে দেখি। কিন্তু পুরাণকে অত্যাধিক অনুসরণের ফলে এই অংশ তিনি কোনো মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেননি।

হরগৌরীর বিবাহের পর পৌরাণিক কাহিনির স্থান দখল করেছে কৃষিজীবন থেকে উত্থিত লৌকিক শিবের কাহিনি। ষষ্ঠদিবসীয় নিশাপালা থেকে লৌকিক পালা আরম্ভ। ষষ্ঠ দিবসীয় নিশাপালায় রয়েছে মূলত 'চাষপালা'। এই চাষপালায় ব্যবসায় বিচার, হরপার্বতীর কলহ, শূলের গুণবর্ণনা, কৃষির উদ্যোগ, ইন্দ্রের নিকট শিবের চাষভূমি গ্রহণ, চাষের সজ্জার নিমিত্ত শূলভঙ্গের চেষ্টা, চাষের সজ্জা প্রস্তুতকরণ, বীজধান্যের অন্বেষণ, কুবেরের নিকট বীজধান্য সংগ্রহ, শিবের চাষে গমন, শিবের কৃষিকাজ, ভীমের ভোজন, শিবের ক্ষেত্রে শস্যোৎপত্তি— এই বিষয়গুলো কবি বর্ণনা করেছেন। সপ্তম দিবসীয় দিবাপালায় মৎস্যধরা পালা বর্ণিত হয়েছে। এখানে রয়েছে নারদের কৈলাসগমন সজ্জা, নারদের কৈলাসযাত্রা, নারদের মন্ত্রণাদান, শিবের নিকট উঁস্তানি ও মশাপ্রেরণ, শিবের নিকট মশাপ্রেরণ, শিবের নিকট মাছি ও ডাঁশ প্রেরণ, মশার উপদ্রব, ভীমের সঙ্গে ভূতনাথের মন্ত্রণা, জোঁকের উপদ্রব— এই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা। সপ্তম দিবসীয় নিশাপালায় মহামায়ার বাগদিনী রূপ গ্রহণ, ভীমের সঙ্গে বাগদিনীর কলহ, বাগদিনীর রূপবর্ণন, বাগদিনীর পরিচয়, শিবের জলসিঞ্চন, বাগদিনীকে শিবের অঙ্গুরীদান, শিবের সঙ্গে বাগদিনীর বাক্‌বৈদগ্ধ্য, শিবকে ছলনাপূর্বক পার্বতীর প্রস্থান,

শিবের কৈলাসগমন বর্ণিত হয়েছে। 'অথ জাগরণ পালা'ই হচ্ছে এই গ্রন্থের সর্বশেষ পালা। এটি এই গ্রন্থের সবচেয়ে দীর্ঘপালা। এই পালাই শঙ্খপরা বা গোসাপালা। নারদ কর্তৃক গৌরীকে শঙ্খের নিমিত্ত মন্ত্রণাদান, শঙ্খের নিমিত্ত গৌরীর শিবসমীপে যাচিঞা, গৌরীকে ছলনা করতে নারদের পরামর্শ, শিবকর্তৃক গৌরীকে ছলনা, গৌরীর গমন পথে ঝড়বৃষ্টি, ঝড়বৃষ্টির মধ্যে অনাথমণ্ডপের নিকটে মাতাপুত্রের কথোপকথন, বৃদ্ধবেশী শিবের সঙ্গে গৌরীর সাক্ষাৎ, বৃদ্ধের সঙ্গে গৌরীর কথোপকথন, গৌরীর আত্মপরিচয় প্রদান, মায়ানদীসৃজন, দেবীর হিমালয়ে আগমন, হিমালয়ে শারদোৎসব, শঙ্করের শঙ্খনির্মাণ, শঙ্করের শাঁখারীবেশ ধারণ, শাঁখারীরূপে শিবের হিমালয়গৃহে গমন, শঙ্খের নিমিত্তে নারীগণের আগ্রহ, শাঁখারীর সঙ্গে মহামায়ার কথোপকথন, শাঁখারী কর্তৃক সতীধর্ম কথন, শঙ্খ পরিধান উদ্যোগ, পদ্মার সঙ্গে পার্বতীর মন্ত্রণা, শঙ্খ পরিধানের জন্যে পার্বতীর সজ্জা, পার্বতীর শঙ্খ পরিধান আরম্ভ, পার্বতীর দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ পরিধান, পার্বতীর করমর্দন, শাঁখারীর করমর্দন, শাঁখারীর পুরস্কার, পার্বতীর কালীমূর্তি ধারণ, শ্বশুরালয়ে সপুত্র শিবের ভোজন, বিশ্বকর্মা কর্তৃক পার্বতীর কাঁচলি নির্মাণ, ভবানীর বাসর সজ্জা, হরগৌরীর বাসর, বাসরে ভবানীর বাগদিনী বেশ, হরগৌরীর বাসর সম্পূর্ণ, হরগৌরীর কৈলাস গমন, বৃকোদরের শস্য আহরণ, ধান্যের নাম ও গীত সমাপ্তি— এ সব বিষয় বর্ণনার মধ্য দিয়ে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছে। লৌকিক অংশ পালায় কবির মৌলিকতার পরিচয় আমরা পাই।

৪.৩ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

এই অধ্যায়ে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিব-সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন' কাব্যের লৌকিক অংশের 'চাষপালা', 'মৎস্যধরা পালা' ও 'শঙ্খপরা বা গোসাপালা'র বিস্তারিত বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে ক্রমানুসারে সেই পালাগুলো আলোচনা করা হল।

৪.৩.১ চাষপালা

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্যের 'ষষ্ঠদিবসীয় নিশাপালা' থেকেই কৃষক শিবকে কেন্দ্র করি লৌকিক কাহিনি শুরু হয়েছে। এই লৌকিক কাহিনি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে চাষপালা, দ্বিতীয় অংশে মৎস্য ধরা পালা ও তৃতীয় অংশে 'শঙ্খপরা বা গোসা পালা' রয়েছে। প্রথম অংশের নাম চাষপালা হলেও বাকি দুটি অংশের সঙ্গে কৃষিকাজের প্রসঙ্গ কোথাও বেশিমাত্রায় বা কোথাও অল্পমাত্রায় জড়িয়ে আছে। তবে চাষপালা অংশে কৃষিকাজ প্রধান অংশ জুড়ে আছে।

চাষপালা অংশে প্রধান তিনটি চরিত্র শিব, পার্বতী ও ভীমের কার্যাবলীর মধ্যদিয়ে বাঙালি জীবনে কৃষিকাজের গুরুত্ব ও চাষপদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। ভিক্ষোপজীবী শিবের সঙ্গে হিমালয়কন্যা পার্বতীর বিয়ে হয়। দুই সন্তানের জন্মের পরেও শিব ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করতে নারাজ। সংসার অনভিজ্ঞ শিবকে পার্বতী ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করে কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে বলেন। চাষের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে পার্বতী বলেন—

চিন্তিলাম চন্দ্রচূড় চাষ বড় ধন।
চাষ চাষ বারেক বর্ত্তুক পরিজন।।
চাষী বিনা চাষের মহিমা কেবা জানে।

....

পরিজন পোষি চাষী শোধে সাধু রাজা।
লক্ষ্মী পুষী চাষী করে সভাকারে তাজা।। (শিবায়ন, পৃ.-৪৪৬)

কিন্তু শিব পার্বতীর এই পরামর্শ প্রথমে মানতে রাজী হন না তার প্রধান কারণ দুটি। প্রথমত, শিবের বংশ গৌরব, দ্বিতীয়ত, কৃষি কাজের পরিশ্রম। 'দেবতার পোদবৃত্তি বড়ই লঘুতা', (শিবায়, পৃ.-৪৪৬) ও "চাষ বলে ও'রে চাষী আগে তোকে খাব।. মোরে খাবি পশ্চাতে যদ্যপি ক্ষেত্রে হব।।" (শিবায়ন, পৃ.-৪৪৭) এই দুই উদ্ধৃতাংশের মধ্য দিয়ে শিবের কৃষিকাজ করার বিরুদ্ধে উপরিউক্ত কারণ দুটি স্পষ্ট হয়ে উঠিছে। তবে পার্বতীর যুক্তিতে শিব অতঃপর কৃষিকাজ করতে মনস্থ করেন। কিন্তু চাষের সরঞ্জাম তো তাঁর কিছুই নেই। চাষ করতে কৃষকের সহযোগী, হলের গরু, সাজের সরঞ্জাম, জমি, বীজধান এসবের দরকার। শিবের তো এসব কিছুই নেই। কীভাবে চাষের এইসব উপাদান সংগ্রহ করা হবে এ বিষয়ে পার্বতী শিবকে পরামর্শ দেন। শস্যাধিকারী হচ্ছেন কুবের, ভূমির মালিক হচ্ছেন ইন্দ্র, শিবের বৃষের সঙ্গে যমের মহিষের জোড় মিলিয়ে দিলে চাষের কোনো অসুবিধেই হবে না আর বলরামের লাঙ্গল রয়েছে চাষ করার জন্য। পার্বতীর এই পরামর্শগুলোর প্রথম তিনটি পরামর্শ শিব মেনে নিলেও বলরামের লাঙ্গলের কথা মেনে নিতে পারেন না। কারণ বলরামের বিশাল লাঙ্গল দ্বারা চাষ করা সম্ভব নয়। তখন পার্বতী শিবকে তাঁর শূল ভেঙে লাঙ্গল তৈরি করতে বলেন। পার্বতীর এহেন প্রস্তাব শিব মেনে নিতে পারেন না। তিনি পার্বতীর কাছে শূলের গুণপনা শুরু করে দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শূল ভেঙে লাঙ্গল তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর শিব নন্দীকে বৃষ সাজাতে বলেন। বৃষে চড়ে শিব ইন্দ্রপুরীতে গিয়ে উপস্থিত হল। সুরনারী ও সকল দেবতারা শিবকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। তারপর শিব ইন্দ্রকে ইন্দ্রপুরীতে আসার কারণ বর্ণনা করেন। ইন্দ্র হাসিমুখে পাট্টা লিখে শিবকে দেবীচকে ভূমি দিয়ে দেন। ইন্দ্রপুরী থেকে শিব যমের কাছে আসেন। যম সানন্দে চাষ করার জন্যে তাঁর মহিষটি তাঁকে ধরে এনে দেন। শিব কৈলাসে ফিরে আসেন। এসে বিশ্বকর্মাকে শূল ভেঙে চাষের সরঞ্জাম তৈরি করতে বলেন। অনেক কষ্ট করে বিশ্বকর্মা শূল ভেঙে লাঙ্গল, কোদাল, জোয়াল ইত্যাদি চাষের সরঞ্জাম তৈরি করে দেন। এখন শুধু বাকি বীজধান সংগ্রহ করা। শিবের প্রথমে কুবেরের কাছে বীজধান ধার করতে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। পার্বতীর পরামর্শে ভীমকে সঙ্গে নিয়ে কুবেরের কাছে যান ও কুবের তাঁকে প্রচুর বীজধান দিলে সেগুলো নিয়ে হর্ষচিত্তে কৈলাসে ফিরে আসেন। তার পর শিবের চাষ করার জন্যে দেবীচকে যাত্রা। দেবীচক কৈলাস থেকে অনেক দূরবর্তী। চাষক্ষেত্রের পাশে থেকেই তাঁকে চাষ করতে হবে। যাত্রার সময় উপস্থিত হলে দেবী উতলা হয়ে ওঠেন, স্বামীকে যেতে মানা করেন, কাজের লোক ভীমকে চাষের জন্যে কৃষিক্ষেত্রে পাঠাতে বলেন। কিন্তু কৃষক নিজে ক্ষেতের কাজ না করলে ভালো ফসল ফলানো সম্ভব নয়। তাই শিব কোনো মতে স্ত্রীকে বুঝিয়ে চাষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য অতঃপর কৃষিকাজের সুবিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। চাষপালা অংশের সম্পূর্ণটাই জুড়ে চাষের বর্ণনা।

মাঘমাসে শিব চাষ করার জন্যে যান। এই সময় প্রচুর বৃষ্টি হয়। শিব মহানন্দে চাষ শুরু করেন। দিনের প্রথমভাগে তিনি চাষ করলেন, বিকেলে আল বাঁধলেন, জল যাওয়ার জন্যে নালাও দিলেন। সন্ধ্যার সময় ভীমকে সঙ্গে নিয়ে আবাসে ফিরে এলেন। সারা দিনের পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত ভীম শিবের কাছে খেতে চায় ও শিব নিজের ও ভীমের খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এভাবে চৈত্রমাস পর্যন্ত শিব চৌদ্দবার জমি চাষ করেন, মই দিয়ে মাটি চূর্ণ করেন। উঁচুনীচু দেখে মাটি সমান করেন। বৈশাখ মাসে বীজ বপন করেন, ঘন হয়ে বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম হয়। ধান্য দেখে শিব মুগ্ধ হয়ে স্ত্রীপুত্র ভুলে থাকেন। আষাঢ় মাসে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়। তাতে ধান্যগাছ আরো শ্যামল শোভন হয়ে ওঠে। এদিকে 'ভরা ভাদর ও মাহ ভাদর'-এ পার্বতীর মন স্বামী বিরহে কাতর হয়ে পড়ে। সখী পদ্মাবতী বিরহ কাতরা পার্বতীকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন। দুজনে মিলে জল্পনা কল্পনা করতে থাকেন কীভাবে শিবকে তারা ঘরে ফিরিয়ে আনবেন। এদিকে নারদ কৈলাসে আসার জন্যে প্রস্তুতি শুরু করে দেন। চাষপালা অংশের এখানেই সমাপ্তি ঘটে।

৪.৩.২ মৎস্যধরা পালা

মৎস্যধরা পালা মূলত বাগদিনীবেশিনী পার্বতীর শিবকে নিয়ে মাছধরার কাহিনি নিয়ে রচিত। এই পালার কাহিনিতে গতিদান করেছে নারদ। চাষপালায় আমরা পার্বতীকে স্বামী বিরহে কাতর হতে দেখি। তিনি ও সখী পদ্মাবতী যখন শিবকে ফিরিয়ে আনার জন্যে চিন্তাভাবনা করছেন তখন নারদ উপস্থিত হয়ে পার্বতীকে স্বামীকে ফিরিয়ে আনার উপায় বলে দেন। নারদের উপদেশেই পার্বতীর শিবকে ছলনা ও তাঁকে নিয়ে মাছ ধরা।

'সপ্তম দিবসীয় দিবাপালা আরম্ভ' এই পালার অন্তর্ভুক্ত মৎস্যধরা পালা। 'নারদের কৈলাসগমন সজ্জা' দিয়ে এই পালার আরম্ভ। নারদের স্বভাববৈশিষ্ট্যই হচ্ছে কলহ তৈরি করা। তাই তিনি যখন জানতে পারেন কৈলাসে মহামায়া মহেশের জন্যে চিন্তান্বিত তখন তিনি তাঁর বাহন ঢেঁকিকে সুসজ্জিত করতে শুরু করেন। ঢেঁকিকে স্নান করিয়ে, কৌপীন পরিয়ে, নানা বেশভূষায়, আভরণে সাজিয়ে, নিজে কৌপীন পরে, জটায় রুদ্রাক্ষমালা দিয়ে, তিলক কেটে, গলায় তুলসীর মালা পরিধান করে, বীণা নিয়ে হরিনাম কীর্তন করতে করতে ঢেঁকিকে বাহন করে তিনি কৈলাসের উদ্দেশে যাত্রা করেন। নারদ ও তাঁর বাহন ঢেঁকি সর্বত্রই কলহ তৈরি করে পারঙ্গম। নারদ ও তাঁর বাহন ঢেঁকির বৈশিষ্ট্য কবি 'নারদের কৈলাস যাত্রা' অংশে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন—

> 'ঢক ঢক কর‍্যা ঢেঁকি উঠাইল বাগ।
> দুকাঠি বাজায়্যা চলে বলে লাগ লাগ।।
> পাড়াগাত্রেও পড়্যা গেল কন্দলের গুড়া।
> নগরের ভিতরে আলুইয়া দিল পুড়া।।
> ঝটপট ঝগড়ে বহিয়া গেল ঝড়।
> চল্যা যাইত্যে চৌদিগে চালের উড়ে খড়।।
> গুণবান পুরুষ প্রবেশে যেই পাড়া।
> বাপে পোয়ে গণ্ডগোল স্ত্রীপুরুষে ছাড়া। (শিবায়ন, পৃঃ ৪৫৮)

এই নারদ কৈলাসে এসে পার্বতীর কাছে জানতে চান শিব কোথায় গেছেন। পার্বতী শিবের চাষ করতে যাওয়ার কথা বলেন। নারদ পার্বতীকে ছলনা করতে গিয়ে হেঁট করে সহানুভূতি পূর্ণ ভাষায় পার্বতীকে বলেন শিব সেখানে চাষ করার পরিবর্তে বহু নারীর সঙ্গে দিন কটাচ্ছেন। কবির ভাষায় নারদের বক্তব্য—

> "আগো মামী মামা ত মজিল আদিরসে।
> রাখিতে নারিলে তুমি আপনার রসে।।
> মামাকে কর‍্যাছে বশ গোটা দশ মায়্যা।
> রাত্রিদিন মামা তার পাছে বুলে ধায়্যা।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৫৮)

সঙ্গে শিবের কার্যকলাপের বিস্তারিত বর্ণনা। সেই মেয়েদের মধ্যে এক মেয়ে মোহিনী মায়ায় শিবকে বশীভূত করে তার প্রায় বুকে পা দিয়ে চেপে শিবকে মৃতপ্রায় করে রেখেছে। এছাড়া রাত-দিন তো শিবের কুচিনী পাড়ায় যাওয়া-আসা আছেই। নারদ দুঃখ করে পার্বতীক বলছেন অন্য মেয়ে হলে শিবকে ঘর থেকে বের করেই দিত। নারদের মুখে শিবের এই কার্যকলাপের কথা শুনে পার্বতীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। শিবের জন্যে কাতরবাক্যে বিলাপ করতে থাকেন। হতবুদ্ধি হয়ে শিবকে ঘরে ফিরিয়ে আনার তিনি কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। নিরুপায় হয়ে তিনি নারদের কাছে স্বামীকে ঘরে ফিরিয়ে আনার পরামর্শ চান। নারদ মহানন্দে পার্বতীকে পরামর্শ দেন। সেই পরামর্শের মধ্যে নিহিত আছে শিব-পার্বতীর কলহের বীজ। শিব কৈলাস্ ছেড়ে চাষভূমিতে আছেন। সেখানে প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি হলে শিব অবশ্যই ঘরে ফিরে আসবেন। তিনি পার্বতীকে বলেন আলকুশী গুঁড়াকে মন্ত্রপূত করে উডানি, মশা, মাছি, জলৌকা করে যদি তিনি এগুলোকে শিবের কৃষিক্ষেত্রে পাঠান, তাহলে তাদের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে শিব ঘরে ফিরে আসবেন। তবুও যদি শিব না আসেন তবে পার্বতী নিজে বাগদিনী বেশ ধারণ করে সেখানে যাবেন, শিবকে নিজের ধান ভেঙে তাকে দিয়ে জল সেঁচাবেন, মাছ ধরাবেন, তারপর মোহবাণ মেরে তার একমাত্র মানিক্য অঙ্গুরীয় নিয়ে তাকে মোহাসক্ত করে কৈলাসে ফিরে আসবেন। তখন শিব বাধ্য হয়ে কৈলাসে ফিরে আসবেন। পরবর্তীতে পার্বতীকে কী করতে হবে নারদ তাকে সেই পরামর্শ দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেন।

নারদের পরামর্শমতো দেবী পার্বতী আলকুশী গুড়ো এনে মন্ত্র পড়ে সেগুলোতে প্রাণসঞ্চার করে উডানি ও মশা করে পৃথিবীতে শিবের চাষক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেন। আকাশ কুয়াশার মতো আচ্ছন্ন করে গুণগুণ গান করে উডানি শিবের চাষক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। ক্ষীণতনু হলেও এই উডানি হাতীর মতো জন্তুকে পরাভূত করতে পারে। পৃথিবীতে এসেই শিব, ভীম, হালের দুটো জন্তুকে উডানি কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলল। অনেক চিন্তা করে শিব উডানি দূর করার উপায় বের করলেন। সারাশরীরে সকলে তেল লেপন করলেন। শরীরে তেলের জন্যে উডানি আর কামড় দিতে পারল না। উডানির ব্যর্থতায় পার্বতী অতঃপর মশা পাঠান। সেই মশা এসে দিনের বেলায় বাঁশবনে আশ্রয় গ্রহণ করল। তাদের উদ্দেশ্য সন্ধ্যার সময় শিবের আস্থানায় গিয়ে তাদের সকলকে কামড়ে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা। একই দিনে আলকুশী গুঁড়ো থেকে মন্ত্রদ্বারা মাছি ও ডাঁশ তৈরি করে পার্বতী তাদের শিবের সমীপে পাঠান। কীভাবে তারা শিবের ওপর আক্রমণ করবে তা বিস্তারিকভাবে শিখিয়ে দেন পার্বতী। পার্বতীর নির্দেশ

মেনে মাছি, ডাঁশ শিব, ভীম ও তাদের বৃষ ও মহিষের ওপর অত্যাচর শুরু করে। শিবের সমস্ত শরীর কামড়ে ফুলিয়ে দিল। ভীম মাছির হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য ধানবনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বৃদ্ধ বৃষ পালাতে গিয়ে কাদার মধ্যে পা আটকে পড়ে থাকল। কাক তার শরীর ঠুকরে ঘা করে তুলল। সেই ঘার মধ্যে কৃমি হল, কাক সেই ঘাকে ঠুকরে আরো গভীর করে তুলল। নিজেকে বাঁচাতে বৃষ হোগলের বনে গিয়ে লুকিয়ে থাকল। মহাদেব অবশেষে এই যন্ত্রণা থেকে বাঁচার পথ বের করলেন। সকলে শরীরে ঘি মেখে মাছি ও ডাঁশের উপদ্রব থেকে রক্ষা পেলেন। রসুন তেল মেখে দিয়ে চাষের পশুদুটোর ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা দূর করে দিলেন। সারাদিন মাছি ও ডাঁশের দুর্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করে যখন শিব তার অনুচর ও হালের বৃষ ও মহিষকে নিয়ে সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরে আসেন তখন শুরু হয় মশার উপদ্রব। বাঁশবন থেকে সন্ধ্যার সময় মশা শিবের আলয়ে এসে তাঁর ওপর অত্যাচার শুরু করে দেয়। মশার কামড়ে ভীম, বৃষ ও মহিষের সঙ্গে শিবের প্রাণান্তকর অবস্থা দেখা দেয়। মশার কামড় ও উড়ার শব্দে তাদের রাতের ঘুম উবে যায়। শিব এরও প্রতিকার করেন। তুষ দিয়ে খড়ে আগুন জ্বালিয়ে শিব ধোঁয়া দিলেন। ধোঁয়ার জ্বালায় অস্থির হয়ে মশা পালিয়ে গেল। শিব তাঁর অনুচরসহ শান্তিলাভ করলেন।

এসব উপদ্রবে অনুচর ভীম সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। পরদিন প্রাতে ঘুম থেকে উঠে ভীম শিবের কাছে কৈলাসে চলে যাওয়ার বায়না করল। শিব তাকে আদর করে বললেন এখনও নিড়ান বাকি আছে। কতদিন থেকে নিড়ান সমাপ্ত করে তাঁরা কৈলাসে ফিরে যাবেন। কিছুদিন পরেই নিড়ান শুরু হল। সমস্ত চাষক্ষেত্রই আগাছায় পরিপূর্ণ। পার্বতী একথা জানতে পেরে জল-স্থলে উভয় জায়গায়ই জোঁক পঠিয়ে দিলেন— স্থলে 'ছিনো' জোঁক ও জলে 'হাথ্যা' জোঁক। শিব অনুচর ভীমকে নিয়ে ক্ষেতে নিড়ান দিচ্ছেন। জোঁকের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে নিঃশব্দে শরীর থেকে রক্ত টেনে খাওয়া। বছরের মতো নিড়ান শেষ করে শিব যখন নিজের শরীরের দিকে তাকান তখন দেখেন তার হাত পায়ে প্রায় পাঁচ-ছ হাজার জোঁক রক্ত শুষে খাচ্ছে। তিনি সেগুলো যতই হাত দিয়ে টেনে সরাতে যান সেগুলো পিছলে আরো সরে যায়। শিব দেখেন ভীমেরও সর্বশরীরে জোঁক। শিব চিন্তা করে প্রতিকার বের করেন। চুন ও নুনে মিশ্রিত করে তিনি জোঁকের ওপর ঘষে দিলেন। জোঁকে এতে বিব্রত হয়ে শরীর থেকে ঝরে পড়ে যায়। ইতিমধ্যে ভাদ্র ও আশ্বিন মাস চলে যায়। কার্তিক মাস আসে। ডাক সংক্রান্তি দিনে শিব ক্ষেতে নল পুঁতে দেন। ধীরে ধীরে শিবের শস্যক্ষেত্রে ধান্যের ফুল দেখা দেয়। ধান্য ফুলে আসে। শিব ধান্য দেখে মুগ্ধ হয়ে পার্বতীকে ভুলে রইলেন। এতসব প্রতিকূলতায়ও শিব কৈলাসে ফিরে না গেলে পার্বতী নারদের পরামর্শমতো বাগদিনী বেশ ধারণ করে শিবের শস্যক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন সখী পদ্মাকে। সুন্দর ফুলে আসা ধানেরক্ষেত দেখে পার্বতী শিবের তাকে ভুলে যাওয়ার কারণ সহজেই খুঁজে পান। বাগদিনী বেশিনী পার্বতী অতঃপর ধানক্ষেত্রে ধানভেঙে মাছ ধরতে থাকেন। পার্বতীর এই ধান ভাঙার দৃশ্য প্রথমে ভীমের চোখে পড়ে। ধান ভাঙা দেখে ভীম বাগদিনীর ওপর প্রচণ্ড ক্ষেপে ওঠে। শিব কষ্ট করে চাষ করেছেন আর এই সামান্য বাগদিনী এসে কিনা সেই ধানগাছ ভেঙে মাছ ধরছে। ভীম বাগদিনীর সঙ্গে কলহ শুরু করে দেয়। বাগদিনীও কম নয়, সেও প্রত্যুত্তরে ভীমকে গালি-গালাজ করতে থাকে। মহাক্রোধে ভীম বাগদিনীকে মারতে যায়। বাগদিনীও সামান্য ভয় পায়

না। দাঁত কড়মড় করে, কটমট চেয়ে বাগদিনীর প্রকাণ্ড চড় উঠানোর ভঙ্গি দেখেই ভীম প্রচণ্ড ভয় পায়। দৌড়ে পালিয়ে সে শিবের কাছে এসে উপস্থিত হয়। শিবকে বিস্তারিতভাবে বাগদিনীর ধানগাছ ভেঙে মাছ ধরার কথা বলে। সঙ্গে বাগদিনীর অপরূপ রূপের কথাও জুড়ে দেয়। রূপের বর্ণনা শুনে শিব ভীমকে বলেন, তাঁর মনে হচ্ছে, এই নারী বাগদিনী নয়, পার্বতী। কিন্তু ভীম যুক্তিসহ এই সন্দেহকে দূর করে দেয়—

"ভীম বলে কিবা বল মামী গৌর এ যে কাল
আমি কি মামীকে চিনি নাঞি।
মামীর বয়েস বাড়া মামী ঢেঙ্গা এযে গেঁড়া
তবে কেন ডরাল্যে গোঁসাঞি। (শিবায়ন, পৃঃ ৪৬৬)

ভীমের যুক্তি মেনে নিয়ে শিব ধান্যক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হন। এসে অপরূপ রূপবতী বাগদিনীকে দেখেন। বাগদিনী কটাক্ষশরে শিবকে অস্থির করে তুলেন। শিব দেখেন বাগদিনী সত্যিই ধানগাছ ভেঙে মাছ ধরে ক্ষেতে বসে আছে। কিন্তু কামবাণে মোহিত শিব বাগদিনীকে কিছুই বলতে পারেন না। বরং তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বাগদিনীর কাছে প্রথমেই শিব তার পরিচয় জানতে চান। সেই পরিচয় জানার মধ্যে শিবের ব্যগ্রতা প্রকাশ পায়। বাগদিনী প্রত্যুত্তরে তার প্রকৃত পরিচয় দেয়। তার স্বামী শিব দুল্যা চৌধুরী, শিখরপুরে তাদের বাড়ি। স্বামী বৃদ্ধ ও দরিদ্র। স্ত্রীর প্রতি আসক্তিহীন তার বৃদ্ধ স্বামী স্ত্রীকে ছেড়ে বিদেশে চলে গেছে। মাঠে মাঠে বিভিন্ন জলাশয়ে মাছ ধরে হাটে মাছ বিক্রি করে তার দিন চলে। পিতার নাম হেম দোলুই, মায়ের নাম মেনকা, তার নিজের নাম গৌরী। তার কোনো কন্যাসন্তান নেই দুই পুত্রসন্তান আছে কার্তিক ও গণেশ। বাগদিনীবেশিনী পার্বতী তাঁর প্রকৃত পরিচয়ই দিলেন। কিন্তু মদনের পরাক্রমে মোহিত হয়ে শিব সেই পরিচয়ের কিছুই বুঝতে পারেননি। তিনি বরং স্বামী পরিত্যক্তা এই নারীর সঙ্গে নিজের সাযুল্য খুঁজে পান, তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করতে যান। তখন বাগদিনী শিবের কাছে তাঁর স্ত্রীর দোষের কথা জানতে চান। মোহাচ্ছন্ন শিব বাগদিনী বেশিনী পার্বতীর কাছেই পার্বতীর নিন্দা করতে থাকেন। তার স্ত্রী পার্বতী বাগদিনীর মতো নন। আর বাগদিনী যদি শিবকে দয়া করেন তাহলে শিব স্ত্রীকে ছেড়ে তাকে নিয়ে ঘর করবেন। বাগদিনীরূপিনী মহামায়ার শিবের এই কথায় গা জ্বলে ওঠে। তিনি বলেন ধর্মপত্নীকে ছেড়ে শিব একজন বাগদিনীর সঙ্গে থাকবেন এটাতো খুব লজ্জার বিষয়। শিব উদাহরণ দিয়ে বলেন অনেকেই এরকম পরনারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, তাঁরা তো লজ্জিত হননি,তবে শিব কেন একারণে লজ্জিত হবেন। বাগদিনী বলে শিবের তো রূপগুণ যৌবন কিছুই নেই, তাহলে বাগদিনী কেন তাঁকে স্বামী বলে বরণ করবে। তবে বাগদিনী কিছু শর্ত সাপেক্ষে তাতে রাজি হাত পারেন। শিব যদি তার সেই কথা অনুসারে চলেন তবে বাগদিনী তাঁকে বিয়ে করতে পারবে। বাগদিনীর প্রথম শর্ত হল শিবকে পার্বতীকে ভাত-কাপড় দিয়ে ভরণপোষণ করতে হবে। তাকে অজ্ঞাতকুলশীল বলে কখনও মনে করতে পারবেন না। সকলকে ছেড়ে তাকেই আপন বলে গ্রহণ করতে হবে। তাঁকে ভালবাসলে সে তারজন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারবে। বাগদিনী বলছে যে অত্যন্ত গুণবতী, তার গুণে স্বামী তার প্রতি মুগ্ধ থাকে। নিজের গুণপনার কথা বলতে গিয়ে সে বলে স্বামীর সঙ্গে যে অভিন্নভাবে বাস করে। পতিব্রতা নারীর গুণেই তার স্বামীর মৃত্যু নেই, বিষ

খেয়েও সে আবার প্রাণ ফিরে পায়। এই কথা শুনে শিব বলেন পার্বতীরও এই গুণগুলো রয়েছে। পার্বতীকে হারিয়ে তিনি পার্বতীর মতোই গুণবতী নারীকে পেয়েছেন। বাগদিনীর দ্বিতীয় শর্ত হল যে সে জাতিবৃত্তি ছাড়া থাকতে পারবে না। তার শিবপ্রীতির প্রথম কাজই হবে শিবের হাতে 'খোলা' দেওয়া, শিবকে দিয়ে জলসিঞ্চন করানো, মাথায় করে মাছ বহন করিয়ে নিয়ে যাওয়া। বাগদিনী হাটে মাছ বিক্রি করবে ও শিব কড়ি গুণবেন। বাগদিনীর প্রথম শর্ত মেনে নিলেও এই মাছধরা বৃত্তি মেনে নিতে শিবের কষ্ট হল। তাই তিনি বলেন শিবকে বিয়ে করে বাগদিনীর তো আর হাটে মাছ বিক্রি করার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি রাজ রাজেশ্বরী হয়ে খাটে বসে থাকলেই পারেন। বাগদিনী বলে কথায় তো কোনো কাজ হবে না। কথায় যদি কাজ হত তা হলে তিনি বুড়ো শিবকে বিয়ে করবেন কেন। বাগদিনীর এই কথা শুনে শিব খুবই মনোকষ্ট পেলেন। তিনি খোলা নিয়ে জলসিঞ্চন করতে যান। বাগদিনী শিবের প্রশংসা করতে লাগলেন। শিব সেই প্রশংসা শুনে দ্বিগুণ শক্তিতে জলসিঞ্চন করতে থাকেন। শিব জলসঞ্চন করেন আর বাগদিনী কৌতুক করে জলের বাঁধ কেটে দিতে থাকে। শিব আর জল শেষ করতে পারছেন না। বাগদিনী বলে এমন পুরুষকে সে বিয়ে করবে না যে সামান্য জল সেঁচতে পারে না। শিব প্রচণ্ড কোপে সমস্ত জলসিঞ্চন করে ফেলেন। বাগদিনী জাল পেতে জলের ওপরে ভেসে থাকা মৎস্য ধরতে থাকে। সেই বিভিন্ন ধরণের মাছগুলো হল পাবদা, পুটি, পাঙ্গাস, চিতল, চিঙ্গড়ী, ধানখলি, মৌরলা, টেঙ্গরা, খলিসা, সোল, কত্‌লা, মৃগাল প্রভৃতি। মনে মনে বাগদিনী বুদ্ধি করতে থাকে যে কীভাবে শিবকে ত্যাগ করে যাবে। বাগদিনী শামুক, গুগলি, ব্যাঙ প্রভৃতি দিয়ে পাত্র ভরতে থাকে। শিব বাগদিনীকে এগুলোর নেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে বাগদিনী বলেন শিবের সঙ্গে বাগদিনীও এগুলো খাবে বলেই সে নিচ্ছে। অখাদ্যের প্রতি বাগদিনীর এই আকর্ষণ অরুচিকর হলেও মোহগ্রস্ত শিব বাগদিনীকে আলিঙ্গন দিতে যান। বাগদিনী বলে আগে শিবকে মূল্য বাবদ বাগদিনীকে কিছু দিতে হবে, তাহলেই বাগদিনী তার যৌবনকে শিবের হাতে সমর্পণ করবে। শিব তাকে চাষের সমস্ত শস্য দিয়ে দিতে চান। বাগদিনী কিন্তু শিবের কাছে তাঁর অঙ্গুরীয়টি চান। শিব রাজি না হলেও কথার ছলনায় বাগদিনী শিবের কাছ থেকে সেই অঙ্গুরীয়টি নিয়ে যান। শিব তখন বাগদিনীকে আলিঙ্গনে পেতে আকুল হয়ে উঠলে বাগদিনী বলে তার সমস্ত শরীর কাদায় নোংরা হয়ে আছে। সে নোংরাগুলো ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে আসছে, ততক্ষণে শিব যেন বাসর নির্মাণ করে থাকেন। শিব বাগদিনীকে বিশ্বাস করতে পারেন না, সুযোগ পেলে বাগদিনী তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে পারে দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে শিব বাগদিনীকে একথা জানান। বাগদিনী বলে বহু তপস্যার ফলে সে পশুপতিকে স্বামীরূপে পেয়েছে, তাঁকে সে তো কখনও ছেড়ে যেতে পারবে না। কথার ছলে শিবকে প্রতারণা করে বাগদিনীবেশিনী সখী পদ্মাসহ কৈলাসে ফিরে যান। এদিকে শিব বরসজ্জা ধারণ করে বাসর নির্মাণ করে বাগদিনীর জন্যে প্রতীক্ষা করছেন; কিন্তু বাগদিনী তো আর ফিরে আসে না। বিরহব্যাকুল শিব ভীমের সঙ্গে বাগদিনীকে সমস্ত ধান্যক্ষেত্রে খুঁজতে থাকেন। কিন্তু তাকে কোথাও খুঁজে পান না। অধোমুখ হয়ে শিব বসে থাকেন।

অতঃপর শিব কৈলাসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ভীমকে বৃষ সাজাতে বলেন। শিব ও ভীম যথাক্রমে বৃষ ও মহিষে আরোহণ করে কৈলাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। কৈলাসে উপনীত হয়েই শিব শিঙাতে ফুঁ দেন। শিবের শিঙার সেই ফুঁ শুনে

সমস্ত শিবলোক আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে। কার্তিক-গণেশও পিতাকে দেখতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পার্বতী গালি দিয়ে তাদেরকে শিবের কাছে যেতে বারণ করেন। তাদের পিতা তো বাগ্দি হয়ে গেছে, সেই নীচু জাতের কাছে তাদের যাওয়ার দরকার নেই। শিবকে ছুঁতে তাঁর ছেলেদের তিনি বারণ করে দেন। দরজা আগলে তিনি দাঁড়িয়ে থআকেন। শিব হেসে পার্বতীকে ভুলিয়ে ঘরে যেতে চান। পার্বতী বলেন বাগ্দি হয়ে লজ্জা-শরম হারিয়ে শিব এখন পার্বতীর কাছে আসতে চাইছেন। বাগদিনীর কাছেই এখন শিব চলে যেতে পারেন। শিব বাগদিনী নারীর কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। পার্বতী বলেন যে নারী শিবকে দিয়ে শস্যক্ষেত্রের জল সিঞ্চন করিয়ে মাছ ধরিয়েছে সেই হচ্ছে বাগদিনী। সমস্ত শস্যক্ষেত্রে তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে না পেয়ে এখন তিনি পার্বতীর কাছে এসেছেন। শিব পার্বতীর কথাগুলোকে অস্বীকার করতে থাকেন। শিব-পার্বতীর কলহের সময় সেখানে নারদ এসে উপস্থিত হন। নারদকে শিব-পার্বতী বিস্তারিতভাবে সব কথা জানান। নারদ শিবের দোষ মেনে না নেওয়ার ভান করেন। তিনি পার্বতীকে বলেন পার্বতী বাগদিনীর সঙ্গে শিবের সম্পর্ক কীভাবে জানতে পেরেছেন। পার্বতী নারদকে শিবকে তাঁর আঙটি কোথায় হারিয়েছেন জিজ্ঞেস করতে বলেন। নারদের প্রশ্নের উত্তরে শিব বলেন ধান নিড়াতে গিয়ে তিনি আঙটিটি হারিয়ে ফেলেছেন। আর একারণেই পার্বতী শিবের সঙ্গ পরিহার করতে চাইছেন। তখন পার্বতী শিবের আঙটিটি তার সামনে তুলে ধরেন। শিব লজ্জায় মাথা হেঁট করলেন। তখন নারদমুনি পার্বতীকে জিজ্ঞেস করলেন মামা যা ধান্যক্ষেত্রে হারিয়ে এলেন পার্বতী সেই আঙটিটি কী করে পেলেন। পার্বতী বলেন শিব যাকে আঙটিটি দিয়েছিলেন সেই পার্বতীকে আঙটিটি দিয়ে সব কথা বলে গেছে। নারদের সামনে লজ্জায় শিব বলেন কেন বা তিনি এখানে এলেন। শিব বুঝতে পারলেন এই সব কিছুই পার্বতীর কাজ এবং পার্বতী এই সব কিছুই করেছেন নারদের মন্ত্রণায়। শিব পার্বতীকে প্রতিফল দিতে মনস্থ করেন। তখন নারদ এসে আবার শিবকে এবিষয়ে মন্ত্রণা দিতে শুরু করেন। নারদ শিবকে বলেন তিনি পার্বতীকে শিবের কাছে শঙ্খ যাচঞা করার পরামর্শ দিবেন। শিব শঙ্খ দিতে অস্বীকার করে পার্বতীকে কটুকথা বলবেন। তখন পার্বতী পিত্রালয়ে যেতে বাধ্য হবেন। তখন শিব শাঁখারীর ছদ্মবেশে শঙ্খ নিয়ে সেখানে যাবেন, মূল্য না চেয়ে কৌশলে পার্বতীকে শঙ্খ পরিধান করাবেন। পরে পার্বতীর সঙ্গে শঙ্খের মূল্য নিয়ে কলহ শুরু করবেন। নারদ শিবকে এই কাজগুলো করার জন্যে উত্তেজিত করেন। শিবের মনে এভাবে কলহের বীজ সঞ্চার করে নারদ কৈলাশ থেকে প্রস্থান করেন। মৎস্যধরা পালার কাহিনি এখানেই শেষ হয়।

৪.৩.৩ শঙ্খপরা বা গোসাপালা

শঙ্খপরা পালার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে পার্বতীর শঙ্খপরার আকাঙ্ক্ষা, শিবের অক্ষমতা, পার্বতীর রাগ করে পিত্রালয়ে যাত্রা, শিবের শাঁখারি বেশে হিমালয়গৃহে গমন, শিবের পার্বতীকে শাঁখা পরিয়ে দেওয়া, শাঁখার মূল্য নিয়ে শিব পার্বতীর কলহ ও পরবর্তীতে উভয়ের মিলনের মধ্য দিয়ে কাহিনির সমাপ্তি। আবার পার্বতীর অভিমান বা 'গোসা' এই পালার প্রধান বিষয় চলে কবি একে 'গোসা' পালা বলেও অভিহিত করেছেন।

এই পালায়ও নারদের ভূমিকা মুখ্য। নারদ শিবকে পার্বতীকে প্রতিফল দেওয়ার মন্ত্রণা দিয়ে এসে এদিকে পার্বতীকে শিবের মানভঙ্গ করার মন্ত্রণা দেন। শিব স্ত্রী পার্বতীর কাছে নিজের কাজের জন্যে লজ্জিত হয়ে অভিমান করে বিল্ববৃক্ষ মূলে বসে আছেন। পার্বতী এহেন অবস্থায় নারদের কাছে স্বামীর মন পাওয়ার জন্যে পরামর্শ চান। নারদ বলেন শঙ্খ পরিধান করলে নারী স্বামীকে সহজেই বশ করতে পারে, সংসারের মঙ্গল হয়। আবার শঙ্খ পরিধান করলে পার্বতী সহজেই হরের চিত্ত হরণ করতে পারবেন। শিব তখন প্রেমাবশে স্ত্রীর পাশে পাশে থাকবেন, পার্বতীর রূপ-গুণে মুগ্ধ হয়ে শিব ত্রিনয়নে তাঁর দিকে চেয়ে থাকবেন। নারদের পরামর্শে পার্বতী অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে শিবের কাছে শঙ্খ যাচঞা করেন। পার্বতীর তো আর কোনো সাধ নেই, তিনি শুধু স্বামীর কাছে দুবাই শঙ্খই চান। স্বামীর পায়ে ধরে দুই বাই শঙ্খ ভিক্ষা করেন। কিন্তু শিব নারদের পরামর্শের কথা মনে রেখেছেন। এই উপলক্ষেই তিনি স্ত্রীকে পূর্বের অপমানের প্রতিফল দেবেন। তাই তিনি পার্বতীকে বলেন দারিদ্র্যের কারণে তিনি তাঁকে শঙ্খ দিতে অক্ষম। শিবের এই কথা অত্যন্ত বাস্তব সত্য। দরিদ্র্যের কারণেই তো তিনি চাষ করতে গিয়েছিলেন। শঙ্খ কেনার অর্থের জন্যে বুড়ো বৃষ বিক্রি করলে তাঁর নিজের জীবনে বিপত্তি দেখা দেবে। শিব প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে পার্বতীক বাপের বাড়িতে চলে যেতে বলেন।

"ভিখারীর ভার্য্যা হৈয়া ভূষণের সাধ।
কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ।।
বাপ বটে বড়লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাহ জনকের ঘরে।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৭৫)

স্বামী এই আচরণে পার্বতীর চোখে দশদিক অন্ধকার দেখেন, আবার প্রচণ্ড অপমান বোধ করেন। তাই রাগে কার্তিক-গণেশকে নিয়ে পিত্রালয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। পার্বতী যে সত্যিই চলে যাবেন এটা কিন্তু শিব বুঝতে পারেননি। তাই তিনি নিজের দিব্যি দিয়ে হাতে ধরে, রাস্তায় আড় হয়ে শুয়ে পড়ে পার্বতীকে আটকাতে চান। কিন্তু পার্বতী অভিমানে-অপমানে স্বামীর সব অনুরোধ-উপরোধকে অস্বীকার করে চলে যান। উপায়ান্তর না দেখে শিব নারদের কাছে পরামর্শের জন্যে যাত্রা করেন। নারদ তখন শিবকে পার্বতীকে ফিরিয়ে আনার উপায় বলে দেন। শিব সেই অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করেন।

নারদের পরামর্শ মতো শিব প্রথমে বাঘ হয়ে দেবী পার্বতীর পথ আটকাতে যান। বড়বনে বড়বাঘ হয়ে তিনি রাস্তায় বসে থাকেন। বিকট দর্শন সেই বাঘের পাবকের মতো দুটি চোখ, মুলোর মতো দুই পাটি দাঁত, কুড়িটি ধারালো নখে মাটি আঁচড়ানো দেখেও পার্বতী সামান্য ভয় পেলেন না। পার্বতীর বাহন বাঘ। এই বাঘকে দেখে পার্বতীর মনে হল নিজের স্বামী হয়ে শিব তাঁকে ত্যাগ করেছেন, জন্মের মতো তিনি বাপের বাড়িতে চলে যাচ্ছেন, কিন্তু বাঘ তাঁর জন্যে ব্যথিত হয়ে তাঁকে সাহায্যের জন্যে চলে এসেছে। পার্বতী তাকে বাহন করে তার ওপর চাপতে গেলে বাঘরূপী শিব অন্তর্ধান করেন। পার্বতীও এটা শিবের কর্ম বুঝতে পেরে বাঘ পালিয়ে যাওয়ায় পাতিব্রত্য রক্ষা করতে পেরেছেন ভেবে খুশি হলেন। প্রথম চেষ্টায় স্ত্রীকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হলে নারদের পরামর্শমতো শিব দ্বিতীয় প্রচেষ্টা শুরু হয়। এখানে ঝড় বৃষ্টির

মাধ্যমে শিব পার্বতীর পথ আটকাতে চান। তবে ইন্দ্র প্রথম ঝড়-বৃষ্টি দিতে রাজি হন না, কারণ পার্বতীর কোপের ভয় তার রয়েছে। শিব ইন্দ্রকে পার্বতী তুষ্ট থাকবেন বলে অভয় দিলেন। শিবের অভয়বাণী শুনে ইন্দ্র প্রবল বজ্রপাতের সঙ্গে বৃষ্টি নিয়ে এলেন। ঝড়বৃষ্টিতে সমস্ত জীবলোকের জীবন সংশয় দেখা দিল। পার্বতী দুই সন্তানকে নিয়ে বিপাকে পড়লেন। বিপদে পড়ে দুই সন্তান এই পরিস্থিতির জন্যে মাকে দুষতে থাকে। কারণ মায়ের পিতার সঙ্গে কলহের কারণে তাদের এই অবস্থা। স্বামীর কথা না শুনে তিনি পাপ করেছেন আর এই পাপের জন্যে আজ এই ঝড়বৃষ্টি। সন্তানের এই কথায় গৌরী আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলছেন, এখানে তাঁর কোনো দোষ নেই। তাঁদের পিতাই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। গুহ-গজানন কিন্তু তাঁদের মাকে পিতার কাছে ফিরে যেতে বলেন নতুবা বিপদে পিতাকে স্মরণ করতে বলেন। পার্বতী তখন স্বামীর কথা স্মরণ করেন। মূলত শিবের কৃপায়ই এই বিপদের সময় তাঁরা সামনে একটি অনাথমণ্ডপ দেখতে পেলেন। পার্বতী পুত্রসহ সেখানে আশ্রয় নিতে গিয়ে ঘরের ভিতরে শায়িত এক বৃদ্ধের বুকে পা দিলেন। পার্বতীর পদাঘাতে সেই বৃদ্ধ কাতরে উঠলেন। পার্বতী দেখলেন অস্থিচর্মসার দিগম্বর জটাধারী এক বৃদ্ধ মৃতপ্রায় হয়ে এখানে পড়ে আছেন। বহুবার জিজ্ঞেস করার পর সেই বৃদ্ধ বললেন তাঁর বুক ভেঙে গেছে। পার্বতী তখন তাঁর কাছে এই পাপকর্মের জন্যে ক্ষমাভিক্ষা চান। তারপর সেই বৃদ্ধকে বলেন একবার পা লেগে তাঁর পাপ হয়েছে, এই ছোট ঘরে ঘেঁষাঘেঁষি করে থেকে তাঁর আবারও এই পাপ হতে পারে। তাই পার্বতী সেই বৃদ্ধকে বাইরে চলে যেতে বলেন। সেই বৃদ্ধ বিপাকে পড়ে বলেন যে তিনি অথর্ব তাই বাইরে যেতে পারবেন না তিনি বৃদ্ধলোক, তাই বাইরের বাতাসে তিনি মরে যাবেন। পার্বতী যদি দয়া করে তাঁর পুত্রের পাশে তাঁকে স্থান দেন তাহলে তিনি তাঁর পদতলেই পড়ে থাকবেন। তারপর বৃদ্ধ তাঁর স্ত্রীর দুঃখকথা পার্বতীকে বলতে শুরু করেন। বৃদ্ধ হওয়ার জন্যে আহারে-বিহারে তিনি স্ত্রীকে খুশী করতে পারেন না। শরীরের বার্ধক্যর জন্য তিনি সবসময় শুয়ে থাকেন। বয়সের জন্যে তার বোধ-বুদ্ধি এখন হারিয়ে গেছে। এক বলতে তিনি আর এক শুনেন ও অন্য উত্তর দেন। এতে রাগ করে তাঁর স্ত্রীর বাপের বাড়িতে চলে গেছেন। সঙ্গে করে দুই পুত্রসন্তানকে নিয়ে গেছে। তাই এই বৃদ্ধের দুর্গতির সীমা নেই। বৃদ্ধ অতঃপর পার্বতীর পরিচয় জানতে চান। গৌরী তাঁর দুঃখের কথা এই বৃদ্ধকে জানান। তিনি সারাদিন স্বামীর ঘরে কাজ করেন, তবুও স্বামীর কাছ থেকে সামান্য সহানুভূতি পান না। সকলেই তার প্রশংসা করে কিন্তু স্বামী তার দিকে ফিরেও তাকায় না। পতিব্রতা এই নারী কারো অন্যায় কথা সহ্য করতে পারেন না। তাঁর এই প্রখরা হওয়ার জন্যেই স্বামী তাকে ত্যাগ করে গেছেন। তাঁর অপরাধ আর কিছুই নয়, তিনি স্বামীর কাছে হাতে পরার জন্যে শঙ্খ চেয়েছিলেন। আর এই সামান্য কারণেই তাঁর স্বামী তাকে পরিত্যাগ করেছেন। সেই দুঃখেই তিনি দুই পুত্রকে নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে যাচ্ছেন। তখন সেই বৃদ্ধ স্ত্রীকে আবার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। কিন্তু পার্বতী শঙ্খ না পেলে স্বামীর কাছে ফিরে যাবেন না সে কথা স্পষ্ট করে বলে দিলেন। স্বামী অপ্রিয় কাজ করেছেন সে কারণে পার্বতী তাকে ত্যাগ করেছেন। তখন সেই বৃদ্ধ পার্বতীকে বলেন মহৎলোকের কন্যা হলে সেই নারী স্বামীর কথা সহজেই মেনে নেয়। স্বামীকে ছেড়ে এই যুবতী নারী দুই সন্তানকে নিয়ে পথে বের হয়েছে, বৃদ্ধ বলেন তিনি যদি যুবক হতেন তা হলে তো এই নারীর সমূহ বিপদ হত। এই কথায় পতিব্রতা সতী

নারী পার্বতীর প্রচণ্ড রেগে যান। তিনি দুঃখ করে বলেন বৃদ্ধলোকের যন্ত্রণা আর তাঁর ঘুচল না। পতিব্রতা নারীর সতীত্ব কোনো পুরুষই নাশ করতে পারেন না। এমন বৃদ্ধকে তিনি ঘাড় ভেঙে রেখে দিতে পারেন। পার্বতীর রাগের কথা শুনে বৃদ্ধ চুপ হয়ে গেলেন। তারপর সকলে নিদ্রা গেলেন। সেই বৃদ্ধ অনিদ্র থেকে নিদ্রার ছলে পার্বতীর গায়ে এসে বার বার ঢলে পড়তে লাগলেন। রাগে পার্বতী সেই বৃদ্ধকে ঘর থেকে ঘাড়ধাক্কা মেরে বের করে দিলেন। শিব বাধ্য হয়ে রণে ভঙ্গ দিলেন।

শিব তারপর নারদের পরামর্শমতো মায়ানদী সৃষ্টি করে পার্বতীকে আটকাতে চাইলেন। পার্বতী ঝড়বৃষ্টি থামার পরে দুই পুত্রকে নিয়ে আবার পিত্রালয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। রাস্তায় দেখেন একটি বিশাল নদী। সেই নদী তাকে অতিক্রম করতে হবে। নদী জলভারে পরিপূর্ণ। পার্বতী দেখেন একজন বৃদ্ধ এক ভাঙা নৌকা নিয়ে মধ্য নদীতে রয়েছেন। পার্বতী ডেকে সেই বৃদ্ধকে নদী পার করে দিতে বলেন। সেই বৃদ্ধ নৌকা নিয়ে পারে এলে পার্বতী বলেন কাল এক বৃদ্ধকে আমি পেয়েছিলাম, তাকে আমি দুর্ব্যবহারের জন্যে তাড়িয়ে দিয়েছি। আজ আবার আরেকজনকে পেয়েছি। তুমি যদি আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার কর, তাহলে আমি তোমাকে নদীর জলে ডুবিয়ে দেব। বৃদ্ধ পার্বতীর কাছে পারের পারানি কড়ি চাইলে পার্বতী বললেন, আমার কাছ থেকে পারানির কড়ি নিয়ে কী করবে, বরং তুমি আমার কাছ থেকে আশীর্বাদ নাও। বৃদ্ধ রাজি হলেন। অতঃপর বৃদ্ধ বলেন তাঁর ভাঙা নৌকায় একসঙ্গে চারজন লোক ধরবে না। প্রথমে তিনি পার্বতীর দুই সন্তানকে অপর পারে রেখে আসবেন, পরে পার্বতীকে নিয়ে যাবেন। দুই ছেলেকে অপর পারে রেখে এসে সেই বৃদ্ধ মাঝি পার্বতীকে নৌকায় তুলেন। মাঝি তরতর করে নৌকা বেয়ে নিয়ে চললেন। মাঝখানে ঘূর্ণাবর্তে নৌকা ডুবুডুবু হয়ে যায়। পার্বতী ভয় পেয়ে মাঝিকে নৌকা সামলাতে বলেন। কিন্তু মাঝি নির্বিকার হয়ে বসে আছেন। কূলে থেকে পার্বতীর দুই সন্তান কান্না করতে শুরু করে। পার্বতী সন্তানদের অভয় দিয়ে বলেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। অগস্ত্য মুনি সমুদ্রের জল শোষণ করে নিতে পেরেছিলেন, পার্বতীও তাই করলেন। তিনি গণ্ডুষে নদীর সমস্ত জল গ্রাস করে ফেললেন। মাঝিরূপী শিব এই অবস্থা দেখে পালিয়ে গেলেন। পার্বতী বুঝতে পারেন এই সবই শিবের কাজ। তিনি শিবকে উদ্দেশ্য করে বলেন শিব পার্বতীতে 'বাটে' (রাস্তায়) বের করে দিয়ে তাঁর সঙ্গে বাটপাড়ি করছেন কেন? বাপের বাড়িতে শঙ্খ তিনি বিলক্ষণ পরবেন। তখন যদি শিব তাঁকে আনেন, তবে তিনি ফিরে আসবেন। এরপর দুর্গা দুই পুত্রকে নিয়ে দ্রুতবেগে রওয়ানা দিলেন। পথে দাবানলও তাঁর পিছু নিতে চাইল। কিন্তু দেবীর কাছে হার মানল। শিবের পার্বতীকে ঘরে ফিরিয়ে আনার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি ঘরে ফিরে গেলেন।

পার্বতী পদব্রজে দুই সন্তানকে নিয়ে পিত্রালয়ের উদ্দেশ্যে হাঁটছেন। এমন সময় তাঁর দুই সখী জয়া-বিজয়া সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। পার্বতী রাগ করে তাদেরকে বলেন তারা এতক্ষণ কোথায় ছিল। তারা বলল তারা পথ হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, এক বৃদ্ধ তাদেরকে পথ দেখিয়ে দিলেন। পার্বতী বললেন এই বৃদ্ধই এতক্ষণ তাঁকে বিড়ম্বনা করে গেছে। এমন সময়ে ইন্দ্রের সারথি মাতলি ইন্দ্রের রথ নিয়ে পার্বতীকে কাছে উপস্থিত হন। পার্বতী সেই রথে আরোহণ করে পিত্রালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

এতদিন পরে হিমালয়-মেনকা কন্যা উমাকে কাছে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠলেন। পার্বতী মা-বাবাকে প্রণাম করলেন। কন্যার গলায় ধরে মেনকা রোদন করতে শুরু করেন। এখানে এক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মায়ের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পিত্রালয়ে যে কন্যা অত্যন্ত আদরে বড় হয়ে উঠেছিল দরিদ্র স্বামীর ঘরে তার দুঃখের সীমা নেই। তাই মায়ের এই কষ্ট। কন্যাকে পেয়ে হিমালয় গৃহে শারদোৎসব শুরু হয়ে যায়। এদিকে পার্বতী বিহনে শিব আরো কাতর হয়ে ওঠেন। তাই যোগবলে তিনি দু বাহি দিব্য শঙ্খ নির্মাণ করেন। এই দুবাহি শঙ্খ অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত। চতুর্দশ ভুবন, ব্রহ্মা-বিষ্ণু, মহেশ্বর, কৃষ্ণলীলার নানা অংশ— গোপ, গোপী, গোকুল, গোপাল, পুতনা বধ, কৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ, কৃষ্ণের গোচারণ, বকাসুর বধ, কোথাও বৃন্দাবনে গোপনীরীদের সঙ্গে ক্রীড়া, দান খণ্ড, নৌকাখণ্ড, রাসলীলা, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ প্রভৃতি নানা বিষয় শিল্প কারুকার্যে সেই শঙ্খে চিত্রিত। অতঃপর শিব মাধব শাঁখারীর ছদ্মবেশে শঙ্খের চুপড়ি নিয়ে হিমালয় গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। গোলাঘাটে গিয়ে বকুলতলায় খড় বিছিয়ে দিব্যশাঁখা দিয়ে পসরা সাজিয়ে শিব দোকান সাজিয়ে বসেন। সেই দিব্যশঙ্খ দেখে নারীদের মধ্যে কোলাহল শুরু হয়ে যায়। পার্বতীর দাসী সেই কোলাহল শুনে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং শাঁখারীকে হিমালয়ের অন্তঃপুরে নিয়ে আসে। সেই শঙ্খ দেখে অন্তঃপুরের সব নারীরাই উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। শিবের শাশুড়ি স্থানীয়া মহিলারাও শাঁখারির প্রকৃত পরিচয় না জেনে তাঁর সঙ্গে কৌতুকালাপ শুরু করে দেন। শিব শাশুড়িদের সামনে হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। সাতজন বৃদ্ধা শাশুড়ি শাঁখারীর কাছে শঙ্খের মূল্য জানতে চান। শিব বলেন যে নারী এই শঙ্খ পরিধান করবে তার মুখ চেয়ে তিনি শঙ্খের মূল্য নির্ণয় করবেন। অতঃপর মহামায়ার সঙ্গে শাঁখারীবেশী শিবের কথোপকথন শুরু হয়। পার্বতী শাঁখারীর পরিচয় জানতে চান। শিব দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় তাঁর আত্মপরিচয় দেন। এরপর পার্বতী শাঁখারীর কাছে শঙ্খের মূল্য জানতে চান। শাঁখারী রহস্য করে বলেন 'অমূল্য শঙ্খের মূল্য আত্মসমর্পণ'। পার্বতী বলেন যে তাঁর অর্থের অভাব নেই, শাঁখারী যে মূল্য চাইবে তিনি তাই দেবেন। শাঁখারী বলেন তাঁর শঙ্খ মূল্য দিয়ে কেনা যাবে না, সেই শঙ্খের অশেষ গুণ। এই শঙ্খের প্রধান গুণ হল এই শঙ্খ পরিধান করলে নারী স্বামীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা থাকবে। শাঁখারী বলেন, এই শঙ্খের মূল্য তাই অর্থ দিয়ে শোধ করা যাবে না। শঙ্খ মাহাত্ম্যের মতো পার্বতীও তাঁর সতীমাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করেন। তাঁর সতীত্বের গুণে স্বামী বিষ খেয়েও বেঁচে ওঠেন। শাঁখারী তখন ধর্মের বিস্তৃত বিবরণ দেন। উভয়ের বাক্‌বিতণ্ডার পর শাঁখা পরার উদ্যোগ শুরু হয়। শাঁখা পরার সময় নারীকে স্নান করে পবিত্র হয়ে বেশভূষায় সুসজ্জিত হতে হয়। পার্বতীকে নানা বেশভূষায় তাঁর কিঙ্করীরা সুসজ্জিত করে দেন। সমস্ত বিশ্বভুবন পার্বতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে গেল। তারপর শঙ্খ পরিধান আরম্ভ হয়। যথাবিধি নিয়ম মেনে পূর্বদিকে মুখ করে পার্বতী শঙ্খ পরতে বসেন। পার্বতীর দিকে মুখ করে শাঁখারী তাঁর সামনে বসেন। গঙ্গাজলে ধুয়ে শঙ্খকে সোনার থালায় তুলে রাখা হয়। শঙ্খ পরিধানকালে পার্বতী অত্যন্ত কষ্ট পান। শাঁখারী ইচ্ছে করেই শাঁখা পরানোটা দীর্ঘস্থায়ী করেন। আসলে শিব এখানে পূর্বের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছেন। বাগদিনীর সঙ্গে সম্পর্কে পার্বতী শিবকে অপমান করেছিলেন। শিব এখন পরপুরুষ হয়ে পার্বতীর অঙ্গ স্পর্শ করে তার প্রতিশোধ নিলেন। শঙ্খ পরানোর পর পার্বতী শাঁখারীকে শঙ্খের মূল্য দিতে চাইলেন। সোনা-রূপা আরো নানাবিধ রত্ন তিনি শাঁখার

মূল্যস্বরূপ দিতে প্রস্তুত। মায়ের সঙ্গে সোনার থালায় সুসজ্জিত করে রত্ন এনে শাঁখারীকে বিদায় করতে চাইলেন। কিন্তু শাঁখারী এসব নিতে রাজি নয়। তিনি স্পষ্টভাষায় বলেন—

"দিবে বল্যা যৌবন যতনে নিলে শঙ্খ।
ইবে ধন দেখাহ ধনের নাহি রঙ্ক।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৯৬)

পার্বতী রাগে হাতে শাঁখা ভাঙতে যান। কিন্তু শিবের তৈরি শাঁখা তিনি ভাঙতে পারেন না। নানা চেষ্টায় শঙ্খ ভাঙতে না পেরে পার্বতী সখী পদ্মার পরামর্শে কালীমূর্তি ধারণ করেন। সেই কালীমূর্তির পদতলে শাঁখারী বেশ ত্যাগ করে শিব শবরূপে পতিত হয়। শিব-পার্বতীর মান-অভিমানের সমাপ্তি ঘটে। সমস্ত ত্রিভুবন তৃপ্ত হল। দেবগণ ও নারদ শিব-পার্বতীর স্তুতি করলেন। শিব সেদিন সপরিবারে শ্বশুরালয়ে থাকলেন, স্বপুত্র আহার করলেন। সেই ভোজনের বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে হাস্যরসের সঙ্গে দরিদ্র বাঙালির এক করুণ ছবিও ফুটে উঠেছে। স্বপুত্র শিব যেভাবে আহার করলেন, তাতে তাঁর ক্ষুধায় কাতর চরিত্রটি প্রধান হয়ে উঠেছে।

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটী সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি।।
....
উদর হইল পূর্ণ উঠিল উদ্‌গার।
অবশেষে গণ্ডূষ করিতে নারে আর।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৯৮)

এ চিত্র তো ক্ষুধার্ত মানুষের। এরপর পার্বতী ভোজন করেন। অতঃপর বিশ্বকর্মা পার্বতীর জন্যে কাঁচলি নির্মাণ করেন। হরগৌরীর মিলনের জন্যে বাসর তৈরি করা হয়। শিব কিন্তু পার্বতীর বাগদিনী রূপকে ভুলেননি। তিনি সহাস্যে পার্বতীকে বলেন—

হাসিয়া বলিল হর হল্য দোষ ক্ষেমা।
বাগদিনী বেশে আগে তৃপ্ত কর আমা।।
পশুপতি অনুমতি পায়্যা মহামায়া।
সেইরূপ বাগদিনী হল্য সেই কায়া।। (শিবায়ন, পৃঃ ৫০১)

হর-গৌরীর মিলন সম্পূর্ণ হয়। তারপর হিমালয়গৃহকে শোকসাগরে ভাসিয়ে শিব-পার্বতী ও দুই পুত্রকে নিয়ে কৈলাস ফিরে যান।

কাহিনি কিন্তু এখানে শেষ হয়নি। শিব পৃথিবীতে গিয়ে অনেক কষ্ট সহ্য করে যে ধান চাষ করেছিলেন, সেখানে ভীম গিয়ে দেখে মাত্র আড়াই হালা ধান হয়েছে। শিব ভীমকে সেই চাষের ক্ষেত্রে আগুন ধরিয়ে দিতে বলেন। সমস্ত শস্যক্ষেত্র পুড়ে গেল। বারো বছর পর শিব-পার্বতীসহ আবার পৃথিবীকে এলেন। ভীম বলল বারো বছর ধরে এখন শস্যক্ষেত্র আগুনে পুড়ছে। শিব দুর্গার দৃষ্টিপাতে আগুন নিভে যায়। পরিতৃপ্ত অগ্নি দেবতা আভির্ভূত হয়ে বললেন তাঁর আশীর্বাদে পৃথিবী এখন ধান্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। যে যে ধান্যে পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সেই ধান্যের বিস্তারিত বর্ণনা, কাব্যের রচনাকাল ও আত্মপরিচয়ের মধ্যে দিয়ে এই পালায় রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যের সমাপ্তি ঘটে।

৪.৪ চরিত্র বিশ্লেষণ

'শিবায়ন' কাব্যের লৌকিক অংশের প্রধান চরিত্র হচ্ছে শিব ও পার্বতী। তাছাড়া শিবের অনুচর ভীম ও নারদচরিত্র গুরুত্বপূর্ণ জায়গা জুড়ে আছেন। এছাড়া অপ্রধান চরিত্র রূপে আছে পার্বতীর সখী, হিমালয়গৃহের পুরনারীবৃন্দ। এখানে আমরা মূলত প্রধান চারটি চরিত্র নিয়েই আলোচনা করব।

৪.৪.১ শিব

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'চাষপালা' অংশে যে শিবকে আমরা পাই তিনি সম্পূর্ণ কৃষক শিব। দেবাদিদের শিবকে আমরা বৈদিক যুগ থেকেই পাই। ঋকবেদে তিনি প্রথমে উগ্রমূর্তি রুদ্র ও পরে সর্বাভিষ্ট-সিদ্ধিকামী, অতি মহান ও প্রশান্ত বলে বন্দিত। যজুর্বেদে তিনি নীলগ্রীব, শিতিকণ্ঠ। তাঁর মঙ্গলময় রূপ সেখানে আরো সুপ্রকাটিত। অথর্ববেদে ভব, সর্ব, পশুপতি, মহাদেব, ঈশান, রুদ্র, উগ্র নামে গণদেবতা এই রুদ্র শিবকে পাওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষেদ, শতপথ ব্রাহ্মণে নানা নামে আমরা এই শিবকে পাই। রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনিতেও শিব উপস্থিত। হরিবংশেও শিবের উল্লেখ আমরা পাই। মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিপুল পরিবর্তন আসে। শিবও নতুনভাবে পরিবর্তিত আকারে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নিজের জায়গা করে নেন। বৈদিক রুদ্র, পৌরাণিক ধ্যানযোগী নির্বাত নিষ্কম্প দীপশিখা রূপী রজতগিরিনিভ শিবশম্ভু মধ্যযুগে এসে গাঁজা ও ধুতুরাসেবী, পরদার আসক্ত কৃষক শিবে রূপান্তরিত হয়ে যান। গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর কোনো পার্থক্য থাকল না। তিনি সহজেই গ্রাম-দেবতায় পরিণত হয়ে যান। কৃষিভিত্তিক গ্রাম-জীবনে কৃষক দেবতার সঙ্গে এই শিব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন। রামেশ্বর তাঁর 'শিব সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন' কাব্যে এই কৃষক শিবের চিত্রই অঙ্কন করেছেন।

শিব-পার্বতীর বিবাহের পর থেকেই কৃষক শিবের চরিত্র বৈশিষ্ট্য শিবায়ন কাব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে। একা শিব এতকাল ভিক্ষাজীবী ছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর তাঁর সংসারে স্ত্রী পুত্র আছে। কিন্তু শিব সংসার সম্বন্ধে উদাসীন। পার্বতী বহু চিন্তা করে-শিবকে কৃষিকাজ করতে বলেন। কিন্তু এতদিনের আরামপ্রিয় শিব কৃষি কাজের মতো কঠিন কাজ করতে রাজি হন না। তাছাড়া শিবের মতে কৃষিকাজ নিম্নশ্রেণির মানুষের বৃত্তি। শিব বর্ণ শ্রেষ্ঠ হয়ে সেই হীনবৃত্তি গ্রহণ করতে পারবেন না। আসলে এখানে শিবের আলস্য পরায়ণ মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আবার তাঁর বংশগৌরবও এখানে কাজ করছে। তাই তিনি পার্বতীর কাছে চাষ সম্বন্ধে নানা কুযুক্তি তুলে ধরেন। চাষ করতে হলে শারীরিক কষ্টের সীমা থাকে না। তার মধ্যে চাষ করলেও অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ফসল নষ্ট করে দেয়। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে চাষী যদি ফসল ফলাতে পারে তাহলে জমিদার সব ফসল তুলে নিয়ে যায়। তাই শিব কৃষিকাজে তার অপারগতা পার্বতীকে জানিয়ে দেন। কিন্তু শিব পরিবারের কর্তা হলেও স্ত্রীর যুক্তিবুদ্ধির ওপরে নির্ভরশীল। এক সময় তিনি স্ত্রীর কথাই মেনে নেন। কিন্তু বুদ্ধির দুর্বলতায় তিনি বুঝতেই পারেন না কীভাবে তিনি চাষের সরঞ্জাম সংগ্রহ করবেন। এখানেও তিনি স্ত্রীর বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল। আবার স্ত্রীর সঙ্গে অযথা কলহ করতেও তাঁর বাধে না। পার্বতী শিবকে পরামর্শ দেন কুবেরের কাছ থেকে বীজধান, ইন্দ্রের নিকট থেকেই ভূমি, শিবের বৃষের সঙ্গে যমের মহিষ ও

বলরামের লাঙল আনতে। শিব বলরামের লাঙ্গল প্রসঙ্গে নিজের যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি মনে করেন সেই মহাবলশালী লাঙ্গল চাষের পক্ষে অনুপযোগী। তখন পার্বতী শূল ভেঙে ফাল তৈরি করতে বলেন। শূল শিবের অত্যন্ত প্রিয়। সেই শূল ভাঙার কথা শিব সহ্য করতে পারেন না। তাই তিনি সবিস্তারে শূলের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে বসেন। অবশেষে শিব স্ত্রীর বুদ্ধির ওপরই নির্ভর করতে বাধ্য হন। তিনি কৃষির উদযোগ শুরু করেন। স্ত্রীর পরমর্শ মতো তিনি প্রথমেই ভূমির জন্যে ইন্দ্রের কাছে যাত্রা করেন। ইন্দ্র তাঁকে পরম সমাদর করেন। কিন্তু শিবে নিজে সরাসরি ইন্দ্রের কাছে ভূমি যাচঞা করতে লজ্জা বোধ করেন। তিনি বলেন তাঁর স্ত্রী পার্বতী তাঁকে ইন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছেন। এখন ভূমি যাচঞা করতে গিয়ে শিবের লজ্জাশীলতা এক গ্রামের সহজ-সরল মানুষের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি ইন্দ্রকে বলেন তিনি তাঁকে ভূমি দিলে তিনি জমি চাষ করলে পার্বতীর অভিলাষ পূর্ণ হবে। শিবের কথায় ইন্দ্র তাঁকে ইচ্ছেমতো ভূমি নিতে বলেন। কিন্তু শিব সহজ-সরল হলেও সংসারবুদ্ধি সম্পন্ন। বাস্তব অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন ফসল হলে পর বহু জমিদার কৃষকদের জমি থেকে ফসল তুলে নিয়ে যান। তাই তিনি ইন্দ্রকে জমির পাট্টা লিখে দিতে বলেন। ইন্দ্র তাঁকে পাট্টা লিখে দিলে তিনি কৈলাসে ফিরে আসেন। তারপর স্ত্রীর পরামর্শ মতোই তিনি শূল ভেঙে কৃষিকাজের সাজসরঞ্জাম তৈরি করেন। তারপর বীজধান সংগ্রহের পালা। বীজধান আনতে কুবেরের কাছে যেতে হবে। কুবের ধনপতি। শিব দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তাই শিব কুবেরের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছেন। কেন না কুবের ভিখারী শিবকে বীজধান ঋণ নাও দিতে পারেন। এখানেও শিবের দারিদ্র ও বাস্তবজ্ঞান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি পার্বতীকে কুবেরের কাছে যেতে বলেন কারণ পার্বতী রাজার মেয়ে, তাঁকে কুবের সহজেই বীজধান ঋণ দেবেন। এখানে শিবচরিত্রে চাতুর্যের পরিচয়ও আমরা পাই। তিনি পার্বতীকে বলছেন তিনি ভিখারী, সারাজীবন ভিক্ষা করেই খেয়েছেন, কীভাবে কারো কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয় তা তিনি জানেন না। কিন্তু পার্বতী স্ত্রীলোক হয়ে ঋণ গ্রহণ করতে যেতে রাজি হন না। তখন শিব বাধ্য হয়ে নিজে কুবেরের কাছে যাত্রা করেন। শিব এখানে একা যাননি। কেন না বীজধান বহন করে নিয়ে আসতে হবে। তিনি অনুচর ভীমকে সঙ্গে নিয়ে যান। কুবের শিবকে ধান দেন। শিব সন্তুষ্ট হয়ে বীজধান নিয়ে ঘরে ফিরে আসেন।

চাষের সব সরঞ্জাম প্রস্তুত ও সংগ্রহ হওয়ার পরে ভিক্ষাজীবী শিবের আলস্য ও গৃহকাতরতা দূর হয়ে যায়। একজন যথার্থ কৃষকের মতো তিনি কৃষিকাজে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। অনুচর ভীমকে সঙ্গে নিয়ে চাষ করার জন্যে পৃথিবীর উদ্দেশে রওয়ানা হন। স্বামীকে বিদায় দিতে গিয়ে পার্বতী অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠলেও শিব এখানে কর্তব্যশীল। পার্বতী যতই বলেন শিবের কৃষিক্ষেত্রে যাওয়ার দরকার নেই, কাজের লোকই কৃষিকাজ করতে পারবে, শিব কিন্তু সে ব্যাপারে কোনো গুরুত্বই দেন না। শিব বলেন, গৃহস্থ ঘরে থাকলে কৃষিকাজ হয় না। এখানে বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন একজন কৃষকের বৈশিষ্ট্য শিবচরিত্রে ফুটে উঠেছে।

তারপর শিব অনুচর ভীমকে নিয়ে পৃথিবীর দেবীচক দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হন। মাঘমাসে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শিব চাষ শুরু করে দেন। এতদিন শিব চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও কৃষিকাজের অভিজ্ঞতা যে তাঁর পুরোমাত্রায় আছে তা তাঁর কৃষিকাজের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি। জমির আল বেঁধে দেওয়া, নালা করে দেওয়া, চৌদ্দবার

জমি চাষ করা, মই দেওয়া, নিড়ান দেওয়া, হালের মহিষ ও ষাঁড়ের যত্ন করা প্রভৃতি শিব ভৃত্য ভীমের সঙ্গে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করেছেন। শুধু তাই নয় শস্যক্ষেত্রে প্রতিকূলতাকে কীভাবে জয় করতে হয় শিব তাও জানেন। শস্যক্ষেত্রে ও লোকালয়ে মশা, মাছি, ডাঁশ, উঙানি ও জোঁকের উপদ্রব স্বাভাবিক ঘটনা। এদের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ও সব কৃষকের জানা থাকে। শিবের ক্ষেত্রে উঙানি এসে উপদ্রব শুরু করলে শরীরে তেল মেখে শিব উঙানি থেকে রক্ষা পান, মাছি এলে গায়ে ঘি মেখে মাছি তাড়াতে সক্ষম হন; তুষ, খড় জ্বালিয়ে ধোঁয়া দিয়ে মশা দূর করেন, চুনে নুনে ঘষে দিয়ে জোঁকের হাত থেকে নিজেকে বাঁচান। সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে কঠোর পরিশ্রম করে শিব ক্ষেত্রে ফসল ফলান। ফসল দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি স্ত্রী-পুত্রকে ভুলে থাকেন। এই অংশ পর্যন্ত শিব এক সাধারণ গৃহস্থ, কৃষক যিনি তাঁর দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। শিবের আরেকটি পরিচয় আছে, যেখানে তিনি পরনারী আসক্ত, লম্পট, দায়িত্বজ্ঞানহীন। বাগদিনীর সঙ্গে সম্পর্কে তাঁর এই স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাগদিনী এসে শিবের ধানগাছ নষ্ট করে মাছ ধরতে থাকলে ভীম তা সহ্য করতে পারে না। বাগদিনীকে তাড়াতে ব্যর্থ হয়ে ভীম শিবের কাছে এসে সে সম্বন্ধে নালিশ করে। শিব যাতে বাগদিনীর অন্যায় কাজের প্রতিকার করেন সেজন্য শিবের নারীর প্রতি আসক্তিকে কাজে লাগিয়ে সে শিবকে সেখানে যেতে প্ররোচিত করতে চায়। ভীম যখন শিবকে এসে বলে—

> "ধরে মৎস্য ধান্য ভাঙ্গ্যা করে বরাবর।
> রূপে গুণে যৌবনে জিন্যাছে চরাবর।।"[১]

এখানে শিবের আচরণে তাঁর নারীর প্রতি আসক্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

> "উঠিয়া বসিল বুড়া পাইয়া সন্ধান।
> কহ বাপু বাগদিনী কেমন বন্ধান।। (শিবায়ন, পৃঃ ৪৬৫)

বাগদিনীর রূপের বর্ণনা শুনে শিব সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি বাগদিনীর অন্যায় কর্মের কোনো প্রতিবাদ তো করেননি, বরং বাগদিনীর কটাক্ষ শরে তার প্রতি কামাসক্ত হয়ে পড়েন। এরপর শিবের সমস্ত আচরণ এক কামুক লম্পটের।

> 'হাস্যা হাস্যা ঘেস্যা ঘেস্যা ছুতে চায় অঙ্গ। (শিবায়ন, পৃঃ ৪৬৭)
> "তুমি যদি সয়া বল্যা দয়া কর মোকে।
> তোমা লৈয়া ঘর করি চাড়ি আমি তাকে।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৬৭)
> "ধর্মপত্নী ছাড়া রবে বীবরের ঠাঞি।
> দুষ্ট হবে দেবলোকে লজ্জা পাবে নাঞি।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৬৭)

প্রভৃতি শিবের সমস্ত আচরণ ও কথাবার্তা, বাগদিনীর প্রতিক্রিয়া সমস্তই শিবের চরিত্রশিথিলতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। শিব বাগদিনীকে বিয়ে করতে চাইলে বাগদিনী শিবকে বলল সে তাতে রাজি যদি শিব তার ভরণ-পোষণ করেন, তার জাতিবৃত্তি গ্রহণ করেন। শিব সহজেই রাজি হয়ে যান। নিজের ক্ষেত্রের ধান ভেঙে, জলসিঞ্চন করে তিনি বাগদিনীকে মাছ ধরতে সাহায্য করেন। মাছ ধরে কাদা ধুয়ে আসার ছলে বাগদিনী শিবের আঙটি নিয়ে শিবকে ছেড়ে চলে যায়। বাসর নির্মাণ করে বরসজ্জায় সজ্জিত শিব আর বাগদিনীর দেখা পান না। ভীমের সঙ্গে সমস্ত শস্যক্ষেত্রে তন্ন তন্ন করে তাকে খুঁজেন। তারপর অধোমুখ হয়ে শিব বৃষে আরোহণ করে কৈলাস গমন করেন।

আসলে বাগদিনী তো পার্বতীই ছিলেন। শিব কৈলাসে ফিরে এলে ক্ষুব্ধচিত্তে পার্বতী বাগদিনীর প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। শিব এখানে মিথ্যার আশ্রয় নেন। তিনি বাগদিনীর প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। যতই পরনারীর প্রতি আসক্তি থাকুক না কেন বাঙালি পুরুষ তে গৃহমুখী, নিজের গৃহিনীকেই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করে, সব চেয়ে বেশি ভালোবাসে, আবার ভয়ও পায়। শিবও তার ব্যতিক্রম নন। তাই পার্বতীর কাছে বাগদিনীর প্রসঙ্গ স্বীকার করার সাহস শিবের হয় না। পার্বতীর কাছে তাঁর আঙুটি দেখে শিব লজ্জা পান। তবে তাঁর মনে কিছুটা ক্ষোভ থেকে যায়। তাই পার্বতী যখন তাঁর কাছে দুবাই শঙ্খ চান শিব মনের ক্ষোভে তাঁকে বাপের বাড়িতে চলে যেতে বলেন। পার্বতী সত্যিই যাওয়ার তোড়জোড় করলে শিবের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। স্ত্রীকে আটকানোর তিনি প্রানপণ প্রয়াস করতে থাকেন। পার্বতী দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা দিলে শিব—

> "ধায়্যা গিয়া ধূর্জ্জটী ধরিলা দুটি হাথে।
> আড় হয়্যা পশুপতি পড়িলেন পথে।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৭৬)

তবুও পার্বতীর অভিমান শিব দূর করতে পারেন না। সমস্ত রাস্তা জুড়ে শিব পার্বতীকে ফিরিয়ে আনার নানা প্রয়াস চালান, কিন্তু তাঁর সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হয়। অতপর শিব শাঁখারীর ছদ্মবেশে শাঁখা নিয়ে হিমালয় গৃহে পার্বতীর সকাশে গিয়ে উপস্থিত হন। পার্বতিকে শাঁখা পরানোর সময় শাঁখারীরূপী শিবের সমস্ত আচরণ একজন কামাসক্ত পুরুষের। তবে নিজের স্ত্রীর প্রতি এই আচরণ দাম্পত্য প্রণয়েরই নামান্তর। অবশেষে স্বামী-স্ত্রীর মান-অভিমান ঘুচে যায়। পার্বতী অন্নপূর্ণা হয়ে স্বামী-পুত্রকে পেটপুরে খাওয়ান। শিবের ভোজনের মধ্যদিয়ে দরিদ্র গৃহের বহুদিনের অভুক্ত এক গৃহস্থের ছবি ফুটে উঠেছে।

> "তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
> দুটি সুতে সপ্ত মুখ পঞ্চমুখ পতি।।
>
> ....
>
> সুক্তা খ্যায়্যা ভোক্তা যদি হস্ত দিল শাকে।
> অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্তি ডাকে।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৯৭)

ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়ে শিব শার্দ্দূল আসনে বসেন। শিব কিন্তু পার্বতীর বাগদিনী রূপকে ভুলতে পারেন না। স্বামী-পুত্রকে খাইয়ে পার্বতী নিজে খেয়ে বাসর যাপনে জন্যে সজ্জিত হয়ে পার্বতী যখন শিব সকাশে আসেন তখন শিবের সেই অপূর্ণ ইচ্ছা প্রকাশ পায়—

> "হাসিয়া বলিল হর হল্য দোষ ক্ষেমা।
> বাগদিনী বেশে আগে তৃপ্ত কর আমা।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৫০১)

পার্বতী স্বামীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে সেই বাগদিনী বেশ ধারণ করেন। স্বামী-স্ত্রীর মিলন সম্পূর্ণ হলে শিব স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে কৈলাসে ফিরে আসেন। এখানে শিবের গৃহস্থরূপ পরিপূর্ণতা লাভ করে।

শিবায়ন কাব্যের শেষ অংশে শিব দেবাদিদেব। ভীম প্রভুকে প্রণাম করে শস্যক্ষেত্রে শস্য আহরণে যায়। সেখানে মাত্র আড়াই হালা ধান পেলে ভীম সে বিষয়ে শিবের কাছে নিবেদন করে। শিব শস্যক্ষেত্রে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। শিবের লীলা জেনে সমস্ত দেবতারা ভীমের পিছু পিছু শস্য ক্ষেত্রে যান। ধান্যক্ষেত্রে

আগুন দেখে ভীম শিব-পার্বতীর পদতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। কিন্তু শিব তো মহিমময়। তাঁর কীর্তিগাথা তো সকলের বিদিত—

"সদাশিব সদানন্দময়।
ইন্দ্রপদ যার বরে অষ্ট সিদ্ধি আছে করে
কটাক্ষে অশেষ সিদ্ধি হয়।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৫০৩)

বারো বছর পর শিব পৃথিবীতে ফিরে এসে ধান্যক্ষেত্র এখনও পুড়তে দেখেন। তাঁর কৃপাদৃষ্টিতে অগ্নিদেবতা সন্তুষ্ট হন এবং পৃথিবীকে শস্যশ্যামলা হয়ে উঠার আশীর্বাদ দান করেন। এই শেষ অংশে শিব ভক্তত্রাতা রূপে উপস্থিত।

৪.৪.২ পার্বতী চরিত্র

শিবের মতো পার্বতীও 'শিবায়ন' কাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। পার্বতী একদিকে সুগৃহিনী, স্বামী শিবের পরামর্শ দাত্রী, অন্যদিকে স্বামীর আচরণে অভিমানী, প্রতিবাদী। পিতা-মাতার আদরের দুলালীও তিনি। কৌলীন্য প্রথাশাসিত সমাজের বিধান অনুসারে রাজার মেয়ে পার্বতীর বিয়ে হয়েছে বৃদ্ধ কুলীন শিবের সঙ্গে। শিব দরিদ্র, ভিক্ষাবৃত্তি তাঁর জীবিকা। পার্বতী দরিদ্র স্বামীর ঘরে এসে কোনোরকমে সুগৃহিনীপনায় দুই সন্তান ও স্বামীকে নিয়ে সংসার নির্বাহ করে চলেছেন। ছয় মাসের সম্বল ঘরে আছে, তারপরে তিনি কী করবেন তা ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তিনি সুগৃহিনীপনায় এতদিন সংসার চালিয়েছেন, এরপর আর সেটা সম্ভব হবে না। তাই তিনি স্বামীকে কৃষিকাজ করার পরামর্শ দান করছেন। ভিক্ষাবৃত্তি অনিশ্চয়তায় ভরা। এর দ্বারা চারজনের সংসার নির্বাহ অসম্ভব। কিন্তু কৃষিকাজ জীবিকার একটি নিশ্চিত বৃত্তি। তাই স্বামীকে তিনি কৃষিকাজে প্ররোচিত করতে থাকেন। শিব প্রথমে রাজি না হলেও পরবর্তীতে পার্বতীর পরামর্শ মেনে নেন। পার্বতী শিবকে শূল ভেঙে লাঙ্গল, ইন্দ্রের কাছ থেকে ভূমি, কুবেরের কাছ থেকে বীজ, যমের কাছ থেকে মহিষ ধার করতে বলেন। শিব এখানে সহজেই পার্বতীর কথা মেনে নেন। তিনি প্রথমেই ইন্দ্রের কাছে যান ভূমির জন্যে। ইন্দ্রের পার্বতীর ওপর অপার ভক্তি। পার্বতীর কথা বলেই শিব ইন্দ্রের কাছে ভূমি চান—

"প্রভু কন পাঠ্যায়াছে পর্ব্বতনন্দিনী।
ইন্দ্র আনন্দিত হৈয়া বন্দিলা বন্দিনী।।

....

বল প্রভু পার্ব্বতীর প্রীত হয় যায়।
প্রাণ সনে মস্তক প্রস্তুত তুয়া পায়।।"

....

তুমি ভূমি দিলে আমি চষি গিয়া চাষ।
পূর্ণ হয় তবে পার্বতীর অভিলাষ।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৪৯)

পার্বতীর অভিলাষ পূরণের জন্যে ও শিবের প্রতি ভক্তিতে ইন্দ্র শিবকে ভূমি দান করেন। এখানে পার্বতীর প্রতি দেবরাজ ইন্দ্রের আনুগত্য সহজেই ধরা পড়েছে।

পার্বতীর পরামর্শমতো শিবের শূল ভেঙে বিশ্বকর্মা কৃষিকাজের সরঞ্জাম ফাল, কোদাল, জোয়াল ইত্যাদি তৈরি করলেন। তারপর পার্বতীর কথা মতো শিবের কুবেরের

কাছ থেকে বীজধান সংগ্রহ করে আনার পালা। ভিখারী শিব কিন্তু কুবেরের কাছে বীজধান সংগ্রহ করতে ভয় পাচ্ছেন। কারণ তিনি ভিখারী, কুবের তাঁকে বীজধান ঋণ দিতে নাও পারেন, আবার ভিখারী হওয়ার জন্যে কীভাবে ঋণ করতে হয় তাও তিনি জানেন না। তিনি পার্বতীকে কুবেরের কাছ থেকে বীজধান ঋণ করতে বলেন। কিন্তু পার্বতী বাস্তব জ্ঞানসম্পন্না। নারী হয়ে কীভাবে তিনি অন্যের ঋণ গ্রহণ করতে যাবে। যুক্তিসহ তিনি শিবকে বুঝাতে থাকেন। শিব স্ত্রীর যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে নিজেই কুবেরের কাছে বীজধান আনতে যান।

পার্বতী শিবকে কৃষিকাজে প্ররোচিত করলেও শিব যখন অনুচর ভীমকে নিয়ে কৃষিকাজের উদ্দেশে যাত্রা করতে উদ্যত তখন বাঙালি ঘরের এক গৃহবধূর মতো পার্বতীর চোখ জলে ভরে এল। বাঙালি নারী নিজের স্বামীকে নিজের কাছেই ধরে রাখতে চায়। অবুঝের মতো তিনি শিবকে বলেন অনুচর ভীম চাষবাস করুক, শিব ঘরে বসে থাকলেই হল। কিন্তু শিব বলেন 'গৃহস্থ থাকিলে ঘরে পরে চাষ বৃথা।।' (শিবায়ন, পৃঃ ৪৫৩) তাই বাধ্য হয়ে চোখের জলে ভেসে পার্বতী স্বামীকে বিদায় দেন। বিদায় কালে পার্বতী স্বামীকে বারবার স্ত্রী-পুত্রের খবর নিতে বলেন। শিব যখন বলেন যে একথাগুলো এখন রাখ, তখন পার্বতীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কারণ স্বামী ছাড়া বাঙালি নারীর জীবন বৃথা। এখানে পতি পরায়ণা স্বামী নির্ভর এক বাঙালি নারীর জীবন পার্বতী চরিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শিব মনের আনন্দে কৃষিকাজ নিয়ে ব্যস্ত। সুন্দর ধানগাছ দেখে শিব মুগ্ধ হয়ে আছেন। কিন্তু পার্বতীর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। স্বামী ফিরে আসছেন না কেন বা তার খবর নিচ্ছেন না কেন, তা চিন্তা করতে করতে তাঁর চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ছে। সখী পদ্মাবতী তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। এসময়ে নারদ এসে কৈলাসে উপস্থিত হন। নারদের স্বভাবধর্মই হচ্ছে কলহ তৈরি করা। তিনি পার্বতীকে বলেন নারদ কৃষিক্ষেত্রে পার্বতীকে ভুলে আরও বহু নারীর সঙ্গে রয়েছেন। পার্বতীর দুর্বল চিত্ত তা সহজেই বিশ্বাস করে। লোকজীবনের নানা লৌকিক বিশ্বাস, ঝাড়-ফুঁক প্রভৃতিতে পার্বতীর অগাধ বিশ্বাস। নারদের কাছে পার্বতী যখন স্বামীকে ফিরিয়ে আনার পরামর্শ চান তখন নারদ তাকে মন্ত্রপূত আলকুশী গুঁড়া দিয়ে স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে বলেন। পার্বতী অবলীলায় তা বিশ্বাস করেন। আলকুশী গুঁড়া মন্ত্রপূত করে মশা, মাছি ডাঁশ, উঙানিব রূপ ধরিয়ে পাঠিয়েও যখন শিবকে কৈলাসে ফিরিয়ে আনা গেল না তখন নারদের দ্বিতীয় পরামর্শ পার্বতী নিরূপায় হয়ে মেনে নেন. তখন বাগদিনীর ছদ্মবেশ ধারণ করে তাঁর শিবের শস্যক্ষেত্রে গমন। এখানে পার্বতীর ভূমিকা এক ছলনাময়ী নারীর। নারীচরিত্র সম্বন্ধে যে প্রচলিত প্রবাদ আছে, 'দেবা ন জানন্তি কৃত মনুষ্য' এখানে বাগদিনী বেশিনী পার্বতীর ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ মিলে যায়। শিব পার্বতীর আচরণের কোনো কুলকিনারা খুঁজে পাননি। পার্বতী ছদ্মবেশ ধারণে অতিশয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি গায়ের ফর্সা রঙ কালো করেছেন, হাঁটুর ওপরে কাপড় পরেছেন। বেশভূষার কারণে তাকে বেঁটে লাগছে, যে কারণে শিব তাঁকে চিনতে পারেননি। পুরুষকে মুগ্ধ করতে এই বাগদিনী অতিশয় দক্ষ। মুহূর্তে কটাক্ষ শরে সে ভূতনাথকে অস্থির করে তুলেছে আর শিব বোধ-বুদ্ধি সমস্তই হারিয়ে ফেলেছেন। শিব তাঁর কাছে পরিচয় জানতে চাইলে বাগদিনী বেশিনী পার্বতী দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় সত্য পরিচয় দিয়েছিলেন কিন্তু মোহগ্রস্ত শিব তাঁর প্রকৃত পরিচয় অনুধাবন করতে পারেননি।

শিব তার রূপে মুগ্ধ হয়ে পার্বতীকে ছেড়ে তাকে বিয়ে করতে চান। বাগদিনী বলে শিব যদি তার কথামতো চলেন তা হলে সে শিবকে বিয়ে করবে। বাগদিনীর জাতিবৃত্তি মাছধরা। শিবকে বিয়ে করলেও তার জাতিবৃত্তি মাছধরাকে সে কখনও ছাড়তে পারবে না। শিবকেও সেই বৃত্তিগ্রহণ করতে হবে। এখানে বাগদিনীবেশিনী পার্বতীর মধ্যে আমরা তীক্ষ্ণ চাতুর্যের পরিচয় পাই। ছলনা করে শিবকে দিয়ে তিনি শস্যক্ষেত্রের জল সিঞ্চন করিয়েছেন, মাছ ধরিয়েছেন, বাসর সাজিয়েছেন ও প্রতারণা করে চলে গেছেন। এখানে পার্বতী চরিত্রের মধ্যে পরিহাসপ্রিয়তা আমরা লক্ষ করি। শিব জলসিঞ্চন করতে গেলে বাগদিনী বাধ কেটে জল ছেড়ে দিলেন—

> "বাগদিনী গিয়া বাঁধ কাট্যা দিল সব।।
> আসিয়া শিবের কাছে হাসে খল খল।
> সিঁচে যত আস্যে তত টুটে নাঞি জল।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৬৯)

জলসিঞ্চন শেষ হয়ে গেলে শিব-বাগদিনী দুজনেই মাছ ধরতে যায়। বাগদিনী কৌতুক করে মাছের সঙ্গে শামুক, গুগলি হাঁড়িতে ভরতে থাকে।

> "ভগবতী ভোলানাথে ভুলাবার তরে।
> সাদ কর্যা শামুক গুগলি হাঁড়ি ভরে।।
> শিব বলে সই গো ওগুলা কেন নিব।
> বাগদিনী বলে সয়া তোমায় আমায় খাব।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৬৯-৪৭০)

বাগদিনীর ঈষৎ তরল আচরণের মধ্যে যে পরিহাস প্রিয়তা ছিল তার অন্তরালে ছিল দুঃখ, বেদনা, ক্ষোভ। শিবকে ছলনা করে পার্বতী কৈলাসে চলে গেলে শিব পার্বতীর ছলনা বুঝতে পেরে হেঁটমুখে কৈলাসে রওয়ানা দেন। শিবকে দেখে পার্বতী প্রচণ্ড রেগে ওঠেন। কার্তিক-গনেশ দৌড়ে বাবার কাছে আসতে চাইলে পার্বতী র প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠে এভাবে—

> "উগ্রকে দেখিতে ব্যগ্র গুহ গজানন।
> গালি দিয়া গৌরী তারে করিল বারণ।।
> ....
> তোর বাপ বাগ্‌দি হয়্যাছে ছাড়্যা মোকে।
> তার ঠাঞি যাস্ নাঞি ছুঁস নাঞি তাকে।।
> ....
> বাগতির লাজ নাঞি ঘর ঢুকে মোর।
> ছেল্যাপুল্যা ছুঁইলে ছুতুক হবেক ঘোর।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৭২)

তবে পার্বতীর এই ক্ষোভ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। অভিমান ভুলে স্বামীর কাছে তিনি দুইবাই শঙ্খ চান। শঙ্খ পরিধান করলে সহজে স্বামীর মন জয় করা যায়, এই ভাবনা থেকেই তাঁর এই শঙ্খের আকাঙ্ক্ষা। শিবের কিন্তু পার্বতীর প্রতি ক্ষোভ সামান্যও কমেনি। তিনি রাগ করে পার্বতীকে বলেন ভিখারী হয়ে তিনি পার্বতীর ভূষণের সাধ মেটাতে পারবেন না। তিনি পার্বতীকে বাপের বাড়িতে চলে যেতে বলেন—

> "বাপ বটে বড়লোক বল গিয়া তারে।
> জঞ্জাল ঘুচুক যাহ জনকের ঘরে।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৭৫)

স্বামীর এহেন কথা পার্বতীর কাছে বজ্রপাত তুল্য। তাই রাগে-অভিমানে তিনি দুই পুত্রকে নিয়ে বাপের বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা দেন। শিব তার অভিমান দূর করার চেষ্টা করলেও পার্বতী সে কথায় কান দেন না। পথে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ভয়ঙ্কর বাঘ তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ায়। কিন্তু পার্বতী সামান্যও সাহস হারাননি। তাঁর সাহস দেখে বাঘ পালিয়ে যায়। তারপর রাস্তার ঝড়বৃষ্টি আসে। এই প্রতিকূলতায়ও পার্বতী সামান্য ভয় পান না। একটি অনাথমণ্ডপে (পান্থশালা) তিনি আশ্রয় নেন। সেখানে এক বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বৃদ্ধের সঙ্গে আচরণে তাঁর সতীত্বের প্রমাণ আমরা পাই। তারপর রাস্তায় একটি বিশাল নদীর সম্মুখীন হন তিনি। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় সেই মায়ানদীও শুকিয়ে গেল। পার্বতীর অনুগত দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে রথসহ মাতলিকে পাঠান। সেই রথে চড়ে পার্বতী পিত্রালয়ে গিয়ে উপস্থিত হন।

পিত্রালয়ে পার্বতী আদরের দুলালী। মাতা-পিতা মেনকা-হিমালয় তাঁকে দেখে আনন্দ সাগরে ভাসেন। হিমালয় গৃহে শারদোৎসব শুরু হয়। পার্বতী কিন্তু শঙ্খের কথা ভুলতে পারেন না। কারণ শঙ্খ পরিধান করলে স্বামীর মন সহজেই জয় করা যায়। তাই মাধব শাঁখারী শঙ্খ নিয়ে তাঁদের অন্তপুরে উপস্থিত হলে পার্বতী যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে সেই শঙ্খ কিনতে চান। পার্বতীর সতীত্বে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সতীনারীর মাহাত্ম্য পার্বতী ভালো করেই জানেন। পার্বতীর মুখে সতী নারীর মাহাত্ম্য ব্যক্ত করেছেন কবি—

"শুষ্ক হল্য সাগর সতীর অভিশাপে।
সতী নষ্ট করিলে রাখিব কার বাপে।।
সতী শাপে আপনি ঈশ্বর হল্য অন্ধ।
সতীশাপে সুবর্ণের লঙ্কাপুরী ভস্ম।।

....

ব্রহ্মা বিষ্ণু বহেন সতীর পরাক্রম।।
বিষ খায়্যা বাঁচে পতি হেন সতী আমি।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৮৯)

তারপর মাধব শাঁখারী পার্বতীকে শঙ্খ পরিয়ে দেন। শঙ্খ পরে খুশি হয়ে পার্বতী শাঁখারীকে শঙ্খের মূল্য দিতে চান। কিন্তু শাঁখারী সোনা, রূপা, রত্ন সামগ্রী কিছুই চায় না সে পার্বতীকেই চায়, 'দিবে বল্যা যৌবন যতনে নিলে শঙ্খ।' (শিবায়ন, পৃঃ ৪৯৬) পার্বতী প্রচণ্ড ক্রোধে কালীমূর্তি ধারণ করেন। তাঁকে শান্ত করতে মাধবরূপী শিব কালীর পদতলে পতিত হন। এভাবে সমস্ত রাগ-অভিমান ভুলে পার্বতী আবার স্বামীর সঙ্গে মিলিত হন। পিত্রালয়ে স্বামী-পুত্রদের পার্বতী পেটপুরে খাওয়ান। সেখানে তার অন্নপূর্ণা মূর্তিই প্রধান হয়ে ওঠে। সাধারণ বঙ্গরমণীর মতো স্বামী-পুত্রকে খাইয়ে তিনি আহার করেন। আহারের পর বিশ্বকর্মা নির্মিত কাঁচুলি পরে শিবের ইচ্ছামতো বাগদিনীবেশ ধারণ করে তিনি বাসর ঘরে যান। সেখানে তিনি পতিগতপ্রাণা। তারপর স্বামীর সঙ্গে কৈলাসে ফিরে আসেন। পার্বতীর এই সমস্ত আচরণের মধ্য দিয়ে বাঙালি ঘরের এক গৃহবধূর ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৪.৪.৩ নারদ চরিত্র

নারদ 'শিবায়ন' কাব্যের কাহিনিতে এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা জুড়ে আছেন। কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পেছনে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। নারদের সাধারণ চরিত্রবৈশিষ্ট্য হল তিনি বীণা সহযোগে হরিগুণ গান করে ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করেন, দেবতাদের মধ্যে নানাবিধ সংবাদ আদান প্রদান করেন, তাঁদের পরামর্শ দান করেন। আবার যুদ্ধ বিগ্রহ ও বিবাহাদিও তিনি সংঘটন করে থাকেন। শিবায়ন কাব্যের লৌকিক খণ্ডে নারদের ভূমিকা মূলত কলহ সৃষ্টিতে। কলহ সৃষ্টি ও কলহ নিষ্পত্তিতে তার দক্ষতা অসাধারণ। মানুষের স্বভাবের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি এই কাজগুলো করে থাকেন। শিব যখন স্ত্রী-পুত্রকে ছেড়ে মনের আনন্দে কৃষিক্ষেত্রে ধান্য উৎপাদনে ব্যস্ত তখন শিব-পার্বতীর দুজনের যোগাযোগহীনতার সুযোগে তিনি তাঁর কাজে লেগে যান। তিনি তাঁর বাহন ঢেঁকিকে নানাবিধ সাজ সজ্জায় সজ্জিত করে ও নিজে সুসজ্জিত হয়ে কৈলাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁর বেশভূষার বিস্তারিত বর্ণনা কবি এই কাব্যে দিয়েছেন। মুখে বিভূতি মেখে, কৌপীন পরিধান করে, মস্তকের জটা রুদ্রাক্ষ দিয়ে বেঁধে, নাসাগ্রে ফোঁটা ও তিলক পরিধান করে, বাহু মূলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম এঁকে শরীরের সমস্ত জায়গায় হরিনাম লিখে গলায় তুলসীর মালা পরে তাঁর বেশভূষা পরিপূর্ণ করেন। তাঁর এই বেশভূষা এক ব্রহ্মচারীর। কিন্তু কোন্দল লাগাতে তিনি ওস্তাদ—

> "ঢক ঢক কর‍্যা ঢেঁকি উঠাইল বাগ।
> দুকাঠি বাজায়্যা চলে বলে লাগ লাগ।।
> পাড়াগাঞে পড়্যাগেল কন্দুলের গুড়া।
> নগরের ভিতরে আল্যাইয়া দিল পুড়া।।
>
> ....
>
> গুণবান পুরুষ প্রবেশে যেই পাড়া।
> বাপে পোয়ে গণ্ডগোল স্ত্রী পুরুষে ছাড়া।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৫৮)

কৈলাসে গিয়ে তিনি পার্বতীর কাছে শিবের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেন—

> "আগো মামী মামা ত মজিল আদিরসে।
> রাখিলে নারিলে তুমি আপনার রসে।।
> মামাকে কর‍্যাছে বশ গোটা দশ মায়্যা।
> রাত্রিদিন মামা তার পাছে বুলে ধায়্যা।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৫৮)

নারদের কথায়ই পার্বতীর মনে শিবের নারী আসক্তি সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। স্বাভাবিকভাবেই তিনি এ বিষয়ে নারদের কাছে পরামর্শ দান। মনে কলহের বীজ বপন করে পরামর্শদানে নারদ অতিশয় দক্ষ। নারদ পার্বতীকে শিবকে ফিরিয়ে আনার জন্যে ঝাড় ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্র পরামর্শ নিতে বলেন। আলকুশী গুঁড়াকে মন্ত্রপূত করে ডাঁশ, মশা, মাচি, উভারি, জোঁক করে শিবের ক্ষেত্রে পাঠালে প্রতিকূলতায় শিব ঘরে ফিরে আসবেন। এতে শিব ফিরে না এলে নারদ স্বয়ং পার্বতীকে সেখানে বাগদিনী বেশ ধারণ করে যেতে বলেন। ধান ভেঙে শিবকে দিয়ে জলসিঞ্চন করিয়ে মাছ ধরানোর পরামর্শ দেন নারদ। শুধু তাই নয়, মোহবাণ মেরে শিবকে মোহাসক্ত করে তাঁর মানিক্য অঙ্গুরীয় ছলনা করে নিয়ে বাসর সজ্জায় প্ররোচিত করে পার্বতীকে কৈলাসে চলে আসতে বলেন। নারদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। তাই তিনি পার্বতীকে বলেন, তাহলে শিব ব্যগ্র হয়ে পার্বতীর পিছু পিছু

কৈলাসে চলে আসবেন। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে পার্বতীকে কী করতে হবে তাও এসে তিনি তাঁকে শিখিয়ে দিয়ে যাওয়ার কথাও বলেন। শিবকে ফিরিয়ে আনার পার্বতীর পরবর্তী সব কাজই নারদের পরামর্শমতো হয়েছে। শিব কৈলাসে ফিরে এলে পার্বতী ও শিবের কলহ যখন শুরু হয় তখন নারদ এসে সেখানে উপস্থিত হন। শিব ও পার্বতীর কলহে ইন্ধন যোগান নারদ। আবার তিনি পার্বতীকে কলহ থেকে সরে এসে শিবকে ক্ষমা করতেও বলেন। অতঃপর তাঁর শিবকে পরামর্শ দান। নারদের এই পরামর্শ কাহিনিতে গতিবেগ সঞ্চার করেছে। তিনি শিবকে পার্বতীর কাজের প্রতিফল দিতে বলেন। পার্বতীর শিবের কাছে দুবাই শঙ্খ চাইবেন। শিবকে পার্বতীও কটূত্তর দেবেন, পার্বতী রাগ করে বাপের বাড়িতে চলে যাবেন, শাঁখারীর ছদ্মবেশে শিব সেখানে যাবেন, মূল্য না চেয়ে পরপুরুষ হয়ে পার্বতীর অঙ্গ স্পর্শ করে তাঁকে শাঁখা পরাবেন, তারপর পার্বতীর সঙ্গে কলহ করবেন। শিবকে এব্যাপার উত্তেজিত করতে নারদের ভূমিকা অসাধারণ—

"বাগদিনী হইয়া যত দুঃখ দিল উমা।
তার দাদ দিতে পার তবে মোর মামা।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৭৩)

শিবকে এরূপ মন্ত্রণা দিয়ে নারদ পার্বতীর কাছে আসেন। পার্বতীর কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন পার্বতীর প্রতি শিবের ক্ষোভ এখনও দূর হয়নি। নারদ পার্বতীকে বলেন স্ত্রী হয়ে স্বামীকে বিড়ম্বিত করেছেন বলেই শিবের ক্ষোভ এখনও দূর হচ্ছে না। পার্বতী অসহায় হয়ে নারদের কাছে আবার পরামর্শ চান। নারদ আবারও কলহ তৈরির সুযোগ পেয়ে যান। তিনি পার্বতীকে শঙ্খ পরিধান করে স্বামীর মন ভুলাতে বলেন।

"যদি শঙ্খ পর তুমি যে রূপ গুণ্যা মায়্যা।
তিন চক্ষে ত্রিলোচন থাকিবেন চায়্যা।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৭৫)

পার্বতী নারদের পরামর্শ মতোই শিবের কাছে দুবাই শঙ্খ চান। শিব নারদের কথামতো পার্বতীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। পার্বতী রাগ করে দুই সন্তানকে সঙ্গে করে বাপের বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা দেন। শিব চোখে অন্ধকার দেখেন। আবার নারদ পার্বতীকে ফিরিয়ে আনার জন্য শিবকে বুদ্ধি বাতলে দেন। প্রথমেই তিনি শিবকে বড় বনে বাঘ হয়ে বসে থাকতে বলেন। তাহলেই বাঘের ভয়ে পার্বতী ঘরে ফিরে আসবেন। এতে কাজ না হলে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি নিয়ে আসবেন ও শিব নিজে অনাথমণ্ডপে বসে থাকবেন। পার্বতী সন্তানদের যেখানে আশ্রয় নেবেন। তখন শিব পার্বতীকে প্রবোধ দিয়ে তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। শিবকে নারদের পরের পরামর্শ মায়ানদী তৈরি করার। সেই নদীতে নৌকার মাঝি হবেন শিব। তিনি পার্বতীকে নদী পার করিয়ে দেবেন না। তাহলেই পার্বতী বাধ্য হয়ে ঘরে ফিরে আসবেন। উপায় না দেখে শিব নারদের এই পরমার্শ মেনে নেন। 'শিবায়ন' কাব্যের পার্বতীকে ফিরিয়ে আনার শিবের সমস্ত কার্যকলাপ নারদের পরামর্শমতোই হয়েছে। পরবর্তীতে শিবের শাঁখারীবেশে হিমালয়ে গমন, মূল্য না চেয়ে পার্বতীকে শাঁখা পরিয়ে দেওয়া, শাঁখার মূল্য নিয়ে পার্বতীর সঙ্গে কলহ প্রভৃতি সবকিছুই শিব নারদের পরামর্শমতো করেছেন। নারদ চরিত্রে পরিহাসপ্রিয়তাও সহজেই লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে অনাসক্তি, বৈরাগ্যের সুর নিহিত আছে। আসলে নারদ অনাসক্ত, নির্লিপ্ত এবং একারণেই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি অনিত্য বলে মনে করেন। যা অসার, অকিঞ্চিকর, তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ পরিহাস সহজেই করা যায়। তাই নারদ কৌতুক সৃষ্টির দ্বারা দেব-মানবের সকল আচার-আচরণ নিয়ে হাস্যপরিহাস করে বিশ্বের অনিত্যতা ও অসারতাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন।

নারদ দেব-মানবের সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণকেও পরিহাসের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। নাটকের বিদূষক চরিত্রের সঙ্গে নারদ-চরিত্রের মিল আমরা দেখতে পাই।

'শিবায়ন' কাব্যে নারদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'বীণাধারী ব্রহ্মচারী ব্রহ্মার নন্দন'। (শিবায়ন, পৃঃ ৪৮৫)। এই কাব্যে নারদ শিবের ভাগ্নে। ফলে শিব মামা, পার্বতী মামী। নারদ তাঁর স্বভাব বৈশিষ্ট্যে শিবপার্বতীর মধ্যে সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন, আবার সম্পর্ককে যুক্তও করেছেন। কাহিনির বিস্তারে ও বিকাশে নারদ চরিত্র এভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৪.৪.৪ ভীম

'শিবায়ন' কাব্যে কৃষক শিবের যোগ্য অনুচর ভীম। শিব কৃষিকাজের জন্যে কৃষিক্ষেত্র দেবীচকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে ভীম তাঁর সঙ্গী হয়। শিব চাষ শুরু করেন, ভীমও প্রভুকে মনপ্রাণ দিয়ে সাহায্য করতে থাকে। সারাদিন পরিশ্রম করে ঘরে ফিরে এসে সে যখন প্রভু শিবের কাছে খেতে চায়, তখন শিব তাকে খেতে দিতে অস্বীকার করেন। ভীম কাজ করতে প্রভুকে ঠকায়নি, তবে শিব কেন তাঁকে খেতে দেবেন না। এই ব্যাপারে শিবের উদাসীনতা লক্ষ করে ভীম প্রচণ্ড ক্ষেপে ওঠে। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে শিবকে সে অভিসম্পাত করে—

"জঠর অনলে যেন জীউ জ্বলে মোর।
তেমন প্রস্তুত খন্দ পুড়িবেক তোর।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৫৪)

তখন শিব তাকে কৈলাসে পার্বতীর কাছে গিয়ে খেয়ে আসতে বলেন। কিন্তু দেবীচক থেকে কৈলাস অনেক দূরে। সারাদিন পরিশ্রম করে সন্ধ্যার সময় সেখানে গিয়ে খেয়ে আবার ভোরবেলা ফিরে এসে চাষ করা ভীমের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সে একথায় রাজি হয় না। তবে ভীম কৌশলে শিবকে তার স্বমতে আনে। এখানে ভীমের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। শিবের বহু নারীর প্রতি আসক্তির কথা ভীম জানে। আবার শিব যে স্ত্রী পার্বতীকে প্রচণ্ড ভয় পান তাও তার অজানা নয়। তাই শিবকে ভয় দেখিয়ে ভীম বলে—

"মামী জিজ্ঞাসিলে আমি কয়্যা দিব ভাল।
কোচনীকে লৈয়া মামা পলাইয়া গেল।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৫৪)

ভীমের কথায় শিব ভয় পান। ভীম যদি মিথ্যে কথাও বলে তবে তাঁর স্বভাবের সঙ্গে মিলিয়ে পার্বতী সেটা বিশ্বাস করবেন—

"বিশ্বনাথ বলে বাপু বস্যা থাক তুমি।
যত খাবে এই খানে খাওয়াইব আমি।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৫৪)

শিব জানেন ভীম চলে গেলে কৃষিকাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই ভীমকে খুশি রাখতেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

এরপর ভীম একান্ত বাধ্য অনুচরের মতো শিবের ক্ষেত্রে শিবের অনুচর রূপে কাজ করতে থাকে। এই কৃষিকাজ কিন্তু সহজ কাজ নয়। নানা প্রতিকূলতা সেখানে রয়েছে। উড়ানি, মশা, মাছি, ডাশ, জোঁক প্রতিমুহূর্তে কৃষককে নাজেহাল করে তুলে।

ভীমও এই প্রতিকূলতার শিকার হয়। উঙানি ভীমের সারা শরীরে কামড় দিয়ে 'সিকি, আনি, দুয়ানি দাগিল অঙ্গময়'। (শিবায়ন, পৃঃ ৪৬০)। তার চোখ নাক কানে উঙানি প্রবেশ করে। মাছির কামড়ে ভীম ধানবনে মাটিতে পড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, মশার কামড়ে তার চোখের ঘুম চলে যায়। জোঁকের কামড়ে সে নাজেহাল হয়ে পড়ে। এতকিছুর মধ্যেও কিছু ভীম কৃষিক্ষেত্র থেকে প্রভুকে ছেড়ে পালিয়ে যেতে চায়নি। এখানে তার শিবের প্রতি আনুগত্য অভূতপূর্ব। প্রতিটি ব্যাপারে শিবের কাছে সে আত্মরক্ষার জন্যে দৌঁড়ে এসেছে। শিব প্রতিকূলতাকে জয় করার চেষ্টা করেছেন, ভীমও শিবের সঙ্গে থেকে গেছে।

ভীম ধান্যক্ষেত্রের মালিক নয়, সে কাজের লোক। কিন্তু শিবের ধান্যক্ষেত্রকে সে নিজের ধান্যক্ষেত্র বলেই ভাবে। বাগদিনী যখন শিবের ধান ভেঙে মাছ ধরতে যায়, ভীম তখন প্রচণ্ড ক্ষেপে ওঠে। সেই ক্ষোভের মধ্যে দিয়ে তার কাজের প্রতি ভালোবাসা ও নিষ্ঠাকে আমরা দেখতে পাই—

"ধান্য ভাঙ্গে বাগদিনী কোপে ভীম দেখ্যা।
জ্বলন্ত আনলে যেন জ্বলে গেল শিখা।।
ক্ষুব্ধ হইয়া শব্দ কর‍্যা ডাকে উভরায়।
আরে মাগী কি করিলি কি করিলি হায়।।
কাদাপানি খায়্যা খাটা ক্ষেতি কৈল হর।
হেন ধান ভাঙ্গিস তোর বুকে নাঞি ডর।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৬৪)

অতঃপর ভীম বাগদিনীর সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয় এবং বাগদিনীর কথায় রেগে গিয়ে তাকে মারতে যায়। বাগদিনীও কম নয়। সেও পাল্টা ভীমকে মারতে এলে ভীম প্রচণ্ড ভয় পায়। সে ভয়ে দৌড়ে শিবের কাছে পালিয়ে আসে এবং তাকে বিস্তারিতভাবে বাগদিনীর কথা জানাতে চায়। একে বাগদিনী ধান নষ্ট করছে, তার ওপর আবার ভীমকে মারতেও এসেছে। তাই ভীম বাগদিনীর অন্যায় কাজের কথা শিবকে জানাতে যায়। আবার শিব যাতে দ্রুত সেখানে যান সেজন্যে বাগদিনীর রূপের বর্ণনাও করতে থাকে। এখানে ভীমের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আমরা পাই। শিবের নারীর প্রতি আসক্তিকে ভীম এখানে কাজে লাগাতে চেয়েছে—

"ধরে মৎস্য ধান্য ভাঙ্গ্যা করে বরাবর।
রূপে গুনে যৌবনে জিন্যাছে চরাচর।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৬৫)

বাগদিনীর রূপের বর্ণনা শুনে শিবের মনে হল ইনি পার্বতী। কিন্তু ভীম বলে সে পার্বতী নয়। পার্বতীতো কখনও ধানগাছ ভাঙবেন না। তার ওপর পার্বতী ফর্সা, বাগদিনী কালো, পার্বতী লম্বা, বাগদিনী বেঁটে। আসলে শিবকে বাগদিনীর সমীপে নিয়ে যাওয়াই ভীমের আসল উদ্দেশ্য। কেননা, ধান্যগাছ নষ্ট হওয়া ভীমের কাছে খুবই কষ্টদায়ক। কিন্তু ভীমের কোনো প্রয়াসই কাজে লাগল না। শিব বাগদিনীকে দেখে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি নিজে বাগদিনীর সঙ্গে ধান্যভেঙে জল সিঞ্চন করে মাছ ধরেন। তারপর বাগদিনী শিবকে ছলনা করে চলে গেলে শিব বাগদিনীকে খুঁজতে থাকেন। এখানে শিবকে অনুগত ভৃত্যের মতো বাগদিনীকে খুঁজতে সাহায্য করে ভীম। বাগদিনীকে না পেয়ে শিব বৃষে আরোহণ করে কৈলাসগামী হন। মহিষে চড়ে ভীমও শিবের অনুগামী হয়।

তারপর শিব-দুর্গার কলহে, পার্বতীর পিত্রালয়ে গমন ও শিবের শাঁখারী বেশে সেখানে যাত্রা, পার্বতীর সঙ্গে পুনর্মিলন প্রভৃতি অংশে ভীমের কোনো ভূমিকা নেই। শিব-স্ত্রী পুত্রসহ কৈলাসে ফিরে এলে ভীমের সঙ্গে আমাদের আবার সাক্ষাৎ ঘটে। পৌষমাসে শিবের অনুমতি নিয়ে ভীম ধান কাটতে ক্ষেত্রে নামে। কিন্তু ধান মোটেই আশানুরূপ হয়নি। মাত্র আড়াই হালা ধান হয়েছে। ভীম বাধ্য ভৃত্যের মতো প্রভুর কাছে সেই আড়াই হালা ধানের সংবাদ নিয়ে আসে। শিব এই সংবাদ শুনে ভীমকে ধান্যক্ষেত্রে আগুন লাগিয়ে দিতে বলেন। ভীম ক্ষেত্রে আগুন লাগিয়ে গিয়ে মনোদুঃখে হর পার্বতীর পদতলে পতিত হয়। পার্বতী তখন তাকে আশীর্বাদ দিয়ে বলেন আগুন তার ক্ষেত্রে আশীর্বাদ হয়ে উঠব। শুনে ভীম খুব খুশি হল। বারো বছর পরে হর পার্বতী পৃথিবীতে এলে ভীম বারো বৎসর ধরে ধান্য পোড়ার কথা হর পার্বতীর কাছে নিবেদন করল। শিবপার্বতীর দৃষ্টিপাতে অগ্নিদেব মূর্তিমান হয়ে আশীর্বাদ করলেন তাঁকে এক শস্য দেওয়ার বিনিময় তিনি পৃথিবীতে পঞ্চশস্য দান করবেন। বলাবাহুল্য এই আশীর্বাদ তিনি ভীমকেই করে গেছেন। কাব্যের শেষে ভীমই যেন কৃষকের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। তার কর্ম ও নিষ্ঠার দ্বারা ভৃত্য ভীম শস্যক্ষেত্রের অধিকার লাভ করেছে। চরিত্রটি আগাগোড়া টাইপ চরিত্র রূপে অঙ্কন করার চেষ্টা করা হলেও মাঝে মাঝে তার ব্যক্তিচরিত্র এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

৪.৫ শিবায়ন কাব্যের লৌকিক অংশের কাহিনি সূত্র

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিব সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন কাব্যের কাহিনি আমরা দুটো ধারা লক্ষ করি। এক, পৌরাণিক ধারা, দুই, লৌকিক ধারা। পৌরাণিক কাহিনির ধারা মূলত পুরাণকেন্দ্রিক। কোন্ কোন্ পুরাণ থেকে রামেশ্বর ভট্টাচার্য পৌরাণিক অংশের কাহিনি গ্রহণ করেছেন তা তিনি কাব্যে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন। কিন্তু লৌকিক অংশের কাহিনির কোনো প্রমাণিক তথ্যসূত্র আমরা পাই না। তবে লৌকিক অংশের কৃষক শিবের কৃষিকাজ সম্বন্ধীয় অল্পবিস্তর তথ্য পাওনা যায় নন্দিকেশ্বর পুরাণে। এছাড়া কিছু কিছু সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যায় সেখানে শিবের কৃষিকার্যের বর্ণনা রয়েছে। একটি শ্লোকে স্পষ্টই আছে গৌরী শিবকে বলছেন, রামের নিকট থেকে তুমি ভূমি মেগে নাও, কুবেরের কাছ থেকে বীজ, বলরামের নিকট থেকে লাঙ্গল, প্রেতরাজ যমের নিকট থেকে মহিষ ও শিবের নিজের রয়েছে বৃষ, শিবের ত্রিশূল তো ফাল, গৌরী বলছেন তিনি নিজে গিয়ে শিবকে মাঠে অন্ন দিয়ে আসবেন। ভিক্ষার দ্বারা তিনি খিন্ন, শিবকে বলছেন তুমি এবার কৃষিকাজ কর।

যে রকম কোনো প্রামানিক পুরাণগ্রন্থ না থাকলেও কিছু কিছু গ্রন্থে কৃষি দেবতা বা দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের অনেক দেব-দেবীই কৃষি দেবতার প্রতীক। তবে শিবকে সেখানে কখনও কৃষকরূপে দেখানো হয়নি। পরবর্তীকালে অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে শিবকে গার্হস্থ্য সমস্যায় বিব্রত দরিদ্র ব্রাহ্মণরূপে দেখানো হয়েছে। বিদ্যাপতির শিবগীতিকায় শিবায়নের অনুরূপ কৃষক শিবের চিত্র আমরা ফুটে উঠতে দেখি। শিবায়নের শিবের মতো বিদ্যাপতির শিবও দরিদ্র। সেখানে শিবায়নের শিবের মতো কৃষক শিবের ছবি আমরা পাই। ভক্ত শিবকে খট্বাঙ্গ কেটে লাঙ্গল, শূল ভেঙে ফাল নির্মাণ করে তাতে বৃষকে জুড়ে দিতে অনুরোধ করছেন। শিবগীতিকার সেই শ্লোকটি হল—

বেরি বেরি অরে সিব মোঁয় তোয় বোলে।
কিরিষ করিঅ মন লাই।

::::::

খটাঙ্গ কাটি হর হল জে বনারিয়
ত্রিশূল তোড়িয় করু ফার।
বসহা ধুরন্ধয় হর লয় জোতিঅ
পাটয় সুরসরি ধার।।" (সুধীরচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'বিদ্যাপতির শিবগীতি' গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় শিবগীতিকার এই শ্লোকটি অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পর্ব, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, তৃতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ২০০৬-০৭ গ্রন্থটি থেকে নেওয়া হয়েছে। পৃঃ ২২১-২২২)

বাংলায় এর অর্থ হল— হে শিব, আমি তোমাকে বার বার বলি, মন দিয়ে কৃষিকার্য কর। হে হর খট্টাঙ্গ কেটে হল বাঁধাও, ত্রিশূল ভেঙে তার ফাল তৈয়ার কর। হে হর, তোমার ধূরন্ধর বৃষকে নিয়ে জুড়ে দাও। গঙ্গার ধারায় ক্ষেতের পাট কর। এছাড়া অসমীয়া, ওড়িয়া, প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার লোকসাহিত্যে কৃষক শিবের বর্ণনা পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত শিবপুরাণেও শিবের চাষবাসের বর্ণনা আছে। অনুমান করা যেতে পারে পূর্বভারতের উর্বরা ভূমিতে অষ্ট্রিক যুগ থেকে ধান্যক্ষেত্রের দেবতারূপে ক্ষেত্রপাল ধরনের এক আর্যেতর দেবতা বিদ্যমান ছিলেন। এই ক্ষেত্রপাল দেবতাই পরবর্তীকালে কৃষক দেবতা শিবরূপে পরিচিত হয়েছেন। তাঁকে নিয়ে বিশেষ ধরনের লোককাহিনি গড়ে উঠেছে। হয়তো সেরকম কোনো কাহিনির ক্ষীণ সূত্র ধরে রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর শিবায়ন কাব্য রচনা করেছেন।

৪.৬ শিবায়ন কাব্যে সমাজচিত্র

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। বাস্তব সমাজের ছবি সাহিত্যে কম-বেশি প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে। মধ্যযুগের সমাজ চিত্র আমরা সেই সময়ের সাহিত্যে দেখতে পাই। শিবায়ন কাব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতকের শেষ ও অষ্টদশ শতকের প্রারম্ভের সমাজের ছবি শিবায়ন কাব্যে রয়েছে। সপ্তদশ শতকের শেষে বাঙালির জাতীয় জীবনের দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। মোগল শাসনের এই কালে কেন্দ্রিয় শক্তি শিথিল হয়ে পড়ায় বাংলাদেশের রাজকর্মচারীরা সাধারণ মানুষের ওপর যথেচ্ছাচার শুরু করেন। এ সঙ্গে যুক্ত হয় বিদেশী বণিকদলের লোলুপতা। মোগল আমলের শেষদিকে বাংলাদেশে ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন দেখা যায়। পুরনো জমিদারের পরিবর্তে নবনিযুক্ত ইজারাদারগণ ধনী শ্রেণিতে উন্নত হয়। তারা অর্থের জন্যে একমাত্র কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে রায়তের ওপর করের বোঝা তারা চপিয়ে দেয়। এই সঙ্গে এ ধরণের নব ভূস্বামীরা মোগল বিলাসকলাকে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অধঃপতনের স্রোতে ভেসে চলে। অন্তঃসংঘাতও এই সময় বাংলাদেশে চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছিল। সমাজের জাতি ভেদের প্রবল প্রতাপে নিম্নবর্গের মানুষের দুর্দশার সীমা ছিল না। সতীদাহ প্রথা, কৌলীন্য প্রথারও প্রবল দাপট সমাজে ছিল। রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যের আমাদের পঠিত চাষপালা অংশেও তৎকালীন বাস্তব সমাজের চিত্র আমরা ফুটে উঠতে দেখি।

'চাষপালা' অংশ শুরু হয়েছে শিব-পার্বতীর বিবাহের পর থেকে। ব্রাহ্মণেরা সেই সময় জ্ঞানের চর্চা করতেন। সেই জ্ঞান চর্চা একসময় শুষ্ক আচারে পরিণত হয়ে তাদের অকর্মণ্য করে তুলেছিল। শিবের ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণের মধ্যে তাই আমরা দেখি। আত্মসম্মান রক্ষার জন্যও এই সহজ জীবিকা অর্জনের পথ শিব সহজে ত্যাগ করতে পারেননি। পরে স্ত্রীর দ্বারা বার বার অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি কৃষিকাজে মনোনিবেশ করেন। শিবের এই কৃষিকাজ গ্রহণের মধ্যে এক ভিন্ন তাৎপর্যও আছে। বাংলাদেশে প্রতাপাদিত্যের সময় থেকে বাঙালিরা রাজার সেনাবাহিনির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করত। পরবর্তীকালে মোগল নবাবদের ক্ষমতা শিথিল হয়ে এলে যুদ্ধ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা আর রইল না। সৈনিক বৃত্তিধারী এই বাঙালিরা বাধ্য হয়ে কৃষিকাজকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করে। শিবের কৃষিকাজের ব্যাপারে শূল ভেঙে লাঙ্গল, জোয়াল, কোদাল প্রভৃতি তৈরি করার ক্ষেত্রে এর ইঙ্গিত আমরা খুঁজে পাই।

জমিদাররা গরীব চাষীদের সবসময়ে শোষণ করতেন। তাঁরা রায়তদের কাছ থেকে অতিরিক্ত হারে কর ও 'আবওয়া' আদায় করতেন; অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হলেও কর থেকে রেহাই মিলত না। রায়তদের ভূমিসত্ত্ব থাকত না। জমিদাররা ইচ্ছে করলেই রায়ত প্রজাদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে অন্যদের দিয়ে দিতেন। ফলে রায়তরা দুর্গতির চরম সীমায় পৌঁছত। অনেক কষ্টে যদি প্রজারা ফসল উৎপাদন করতে সমর্থ হত, তখনও নানা ছলে জমিদারের নায়েব গোমস্তা ফসল কেড়ে নিত। রামেশ্বর তাঁর শিবায়ন কাব্যে রায়ত প্রজাদের দুর্দশার এই বাস্তবচিত্র সুন্দরভাবে অঙ্কন করেছেন।

"অনেক আয়াসে চাষে শস্য উপস্থিত।
শুখা হাজা পড়িলে পশ্চাৎ বিপরীত।।
গরীবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা।
বাব কন্ন্যা সকল বেচিয়া লয় রাজা।।
ক্ষেত্যা দেখি খন্দ যদি খাত্যে নাহি পায়।
কুত্যা কাত্যা কায়েত কিফাতি করে তায়।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৪৭)

জোর করে প্রজাদের ফসল কেড়ে নেওয়ার এই প্রথা ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। জমির মালিকানা না থাকারই প্রজাদের এই দুর্গতি। শিব যখন ইন্দ্রের নিকট থেকে জমি আনতে যান তখন তিনি জমির মালিকানার জন্যে পাট্টা চান। কারণ জমির মালিকানা না থাকলে জমিদার জোর করে ফসল কেটে নেবেন। 'শিবায়নে'র চাষপালা অংশে রামেশ্বর শিবের সঙ্গে ইন্দ্রের জমি বিষয়ক কথা বার্তার মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট করে তুলেছেন—

"শিব চলে শক্র কিছু চক্র বক্র আছে।
খন্দ হলে ক্ষেতে তুমি দ্বন্দ্ব কর পাছে।।
বিষয়ীর বচনে বিশ্বাস বিধি নয়।
পাটা টুকি পাল্যে পরিনাম শুদ্ধ হয়।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৪৯)

শিব চাষের সরঞ্জাম তৈরি করে দেবীচকের উদ্দেশ্যে যাত্রার সময় পার্বতীর ক্রন্দনের মধ্য দিয়ে বাস্তব পারিবারিক জীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।

শিব অনুচর ভীমকে নিয়ে শস্যক্ষেত্রে উপস্থিত হন। শিব একজন দক্ষ কৃষকের মতোই চাষ শুরু করেন। এই অংশে বাস্তব কৃষক জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। মাঘমাসে

চাষ শুরু করা, 'আলি' বাঁধা, নালা তৈরি করা, হালের গরু ও মহিষকে যত্ন করা, চৌদ্দবার মাটি চাষ করা, চাষের মাটিতে মই দেওয়া, বীজ বুনা, ধান গাছে নিড়ান দেওয়া, ডাক সংক্রান্তিতে ক্ষেতে নল পুতে দেওয়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কৃষিকাজের বিস্তারিত তথ্য আমরা পাই। তবে চাষ করতে গিয়ে কৃষককে নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। মশা, মাছি, ডাঁশ, জোঁক চাষের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা তৈরি করে। কিন্তু কৃষক সেই প্রতিকূলতাকে জয় করতে জানত। শিবও তেল, ঘি মেখে মাছি, ধোঁয়া দিয়ে মশা, চুন-নুন দিয়ে জোঁকের উপদ্রব দূর করেন। যখন ধান্যে ফুল আসে তখন কৃষকের আনন্দের সীমা থাকে না। তবে ব্রাহ্মণদের দ্বারা যে চাষবাস হয় না তার ইঙ্গিত কাব্যের শেষে রয়েছে। শিব ব্রত পরিশ্রম করলেও মাত্র আড়াই হালা ধান উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন।

'শিবায়ন' কাব্যের 'চাষপালা' অংশে শুধু কৃষিকথাই নয়, বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের ছবিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কৌলীন্যপ্রথা, বহু বিবাহে আক্রান্ত ছিল সেই সময়ের সমজ। সেই সমাজ ছিল পুরুষতান্ত্রিক। কৌলীন্য প্রথার ফলে রাজনন্দিনী পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল বৃদ্ধ ভিখারী শিবের সঙ্গে। পার্বতী বহু কষ্টে ভিখারী স্বামীকে কৃষিকাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তবে সেখানে তাঁর দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। স্বামীকে চাষের জন্যে স্ত্রীপুত্রকে ছেড়ে বহু দূরে যেতে হবে। বহু বিবাহ প্রথা শাসিত সমাজে সেই সময়ে পুরুষ অতি সহজেই পরনারীর প্রতি আসক্ত হয়ে আবার বিয়ে করত, পূর্বের স্ত্রী সন্তানের আর খবরই রাখত না। শিবের শস্যক্ষেত্রে চলে যাওয়ার সময় পার্বতীর মনে এসব দুশ্চিন্তা কাজ করেছিল। রামেশ্বরের শিবায়নে আছে—

"ত্রিপুরা বলেন তাবে আস্য গিয়া প্রভু।
ছাওয়ালের তরে তত্ত্ব কর‍্য কভু কভু।।
শিব বলে সে কথা সম্প্রতি রাখ হাথে।
আকাশ ভাঙ্গিল শুন্যা শঙ্করীর মাথে।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৫৪)

শিব কৃষিক্ষেত্রে চাষে মগ্ন হয়ে স্ত্রীপুত্রকে ভুলে আছেন। তখন নারদ সহজেই পুরুষচরিত্রের এই দোষের জন্যেই শিব-পার্বতীর মধ্যে কলহ তৈরি করতে পেরেছিলেন। নারদের পরামর্শে পার্বতী যখন বাগদিনী বেশ ধারণ করে শস্যক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হন, তখন শিব বাগদিনীর রূপ দেখেই মুগ্ধ হয়ে যান। শিব তখন তাকে বিয়ে করতে তৎপর হয়ে ওঠেন। অবলীলায় বলেন বাগদিনী রাজী হলে তিনি তাঁর কলহপ্রিয় স্ত্রীকে ত্যাগ করবেন। এই নারীকে বিয়ে করতে নিম্নজাতির বৃত্তিকেও গ্রহণ করতে তিনি রাজি হয়েছেন। শিব যে রকম নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য নারীকে বিয়ে করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন, তেমনি বাগদিনীর স্বামীও যে স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে গেছে এই কথাটাও সমান বিশ্বাসযোগ্য।

বাংলাদেশের সমাজে সাধারণ মানুষের অবস্থা সুদীর্ঘকাল ধরে একই রকমের। রাজার পর রাজা এসেছেন, কিন্তু দারিদ্র লাঞ্ছিত মানুষের জীবনের কোনো পরিবর্তন আসেনি। অস্বচ্ছল পরিবারে আয়-ব্যয়ের দুই দিক সামলাতে গিয়ে কর্তা-গৃহিণীর প্রাণান্তকর অবস্থা হয়। এই রকম আর্থিক অনটনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই কলহ দেখা দেয়। শিব-পার্বতীর সংসারজীবনের প্রতীকে সেই দারিদ্র্য লাঞ্ছিত সমাজের ছবিস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একে অপরকে দোষারোপ করে তাঁরা মনের জ্বালার নিবৃত্তি ঘটান। শিব রেগে স্ত্রীকে বলেন—

"ভিখারীর ভার্য্যা হল্যে ভূপতির ঝি।
দুঃখীর দুহিতা নহ দোষ দিব কি।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৩৯৯)

দেবীও রাগে-অভিমানে বলেন—

"দেবী বলে দেবদেব দোষ কেন দেও।
দিয়াছিলে যত দ্রব্য লেখ্যা কর‍্যা লেও।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৩৯৯)

গৃহস্থ পরিশ্রম করে সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে আসেন। কিন্তু অল্পদিনেই সে গুলো ফুরিয়ে যায়। গৃহিণী-স্বামীকে অনুযোগ করলে কর্তা ক্ষেপে ওঠেন। কিন্তু গৃহিণীর তো করার কিছুই নেই। ছোট ছোট সন্তানেরা তো কিছুই বুঝে না। তারা মায়ের কাছে খাওনার জন্যে বায়না করে—

"এখন বাপের কাছে বস্যা আছে পো।
ক্ষুধা পাইলে ক্ষেমঙ্করী খাত্যে দেনা গো।।
বাপের বৈভব নাঞি কি করিব মায়।
স্বামীর সম্পদ বিনে শিশু পোষা যায়।।
বুভুক্ষিত বালক বচনে নাঞি রয়।
দুগ্ধ পুষ্য ক্ষুব্ধ নাকি চুম্ব দিলে রয়।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪০০)

গৃহিণী ঋণ করে সংসার চালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু এর যন্ত্রণাও মর্মান্তিক। ঋণ সহজেই করা যায়, কিন্তু শোধন কষ্ট। পুরুষ কষ্টে সৃষ্টে ঋণ করতে পারে, কিন্তু নারীর কাছে ঋণ করা মৃত্যুর অধিক লজ্জার।

'মেয়্যার করজ করা মরণ অধিক'। (শিবায়ন, পৃঃ ৪৫২)

তবুও ঋণদাতার কর্কশ বাক্য সহ্য করেও পুরুষেরা ঋণ সামলানোর চেষ্টা করেন। তবে গৃহিণীর গুণে সংসার সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয়।—

"গৃহস্থের গৃহ চলে গৃহিণীর গুনে।
পেল্যা দিয়া পুরুষ পাসরে সে কি জানে।।
পুন্যবান লোক পান লক্ষ্মীরূপা নারী।
উত্তম উদ্‌যোগ কর‍্যা উথলয়ে গারি।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৪৬)

আবার গৃহিণীপনার অভাবে সংসারের অতুল বৈভবও বিনষ্ট হয়ে যায়—

"অভাগার ঘরে আইস্যে অলক্ষ্মী মেয়্যা।
শয়েকের গারি দেয় পঞ্চাশে উড়ায়্যা।।
লক্ষার বানিজ্য যদি আন্যা দেই ঘরে।
মেয়া হল্যে উল্যই উড়াল আঁখিঠারে।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৪৬)

এরকম দরিদ্রের ঘরে পেট ভরে ভাত খাওয়া দুঃস্বপ্ন। যদিবা কোনো দিন সেই সুযোগ আসে তখন গৃহস্থের আনন্দের সীমা থাকে না। গৃহিণী ভালো মন্দ রান্না করে পতি-পুত্রকে খাওয়ান। পেটপুরে খেয়ে পতি-পুত্রের আনন্দের সীমা আর থাকে না। 'শিবায়ন'

কাব্যে দারিদ্রের পাশাপাশি অন্নভোজনের পরিতৃপ্তির ছবিও ফুটে উঠেছে। তবে সেই অন্নগ্রহণের দৃশ্যে বুভুক্ষুর ক্ষুধার্ত সত্তাই প্রধান হয়ে উঠেছে—

"তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্ত মুখ পঞ্চমুখ পতি।।
তিনজনে একুনে বদন হৈল্য বার।
গুটি গুটি দুটী হাতে যত দিতে পার।।
তিনজনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাঞি হাঁড়ি পানে চায়।।
....
সুক্তা খায়্যা ভোক্তা যদি হস্ত দিল শাকে।
অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে।।
কার্ত্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হইয়া খা।।
মূষিক মায়ের বোলে মৌন হয়্যা রয়।
শঙ্কর শিখায়্যা দেন শিখিধ্বজ কর।।
রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে।
যত পাব তত খাব ধৈর্য হব বটে।।
....
উদর হইল পূর্ণ উঠিল উদ্গার।
অবশেষে গণ্ডূষ করিতে নারে আর।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৯২)

রামেশ্বরের কাব্যে এই অন্নগ্রহণ দৃশ্য বাংলাদেশের কার্তিকের নবান্ন উৎসবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু এই গৃহিণী যদি স্বামীকে দুবাই শঙ্খ কিনে দেওয়ার কথা বলেন তখন দরিদ্র স্বামী রাগ সামলাতে পারেন না। প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি গৃহিণীকে বলেন—

"ভাত নাহি ভবনে ভর্ত্তার ভাগ্য বাঁকা।
জন খাট্যা মুনসা সরে মাগী মাগে শাঁখা।।
....
ভিখারীর ভার্য্যা হইয়া ভূষনের সাধ।
কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ।।
বাপ বটে বড়লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাকু জনকের ঘরে।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৭৫)

স্ত্রী রাগ করে দুই পুত্রকে নিয়ে বাপের বাড়িতে চললেন। কিন্তু গৃহিণী-হীন গৃহ তো অরণ্যের তুল্য। স্বামী তাই স্ত্রীকে ঘরে রাখতে প্রানপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু গৃহিণীকে তিনি আটকাতে পারেন না। তারপর রামেশ্বর পার্বতীর যাত্রাপথের সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন। সেই পথ সুগম নয়। হিংস্র বন্য পশুর উপদ্রবের সঙ্গে ঝড়-বৃষ্টিও গমনে প্রতিকুলতা তৈরি করে। তবে দুর্গম রাস্তায় পথিকদের সুবিধের জন্য মাঝে মাঝে পান্থশালার ব্যবস্থা ছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের এরকম পাশালা বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে ছিল। পার্বতী এরকম এক পান্থশালায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। নদী নালায় পূর্ণ বাংলাদেশে যাত্রাপথের বাধা

হয়ে দাঁড়ায় বর্ষার খরস্রোতা নদী। পার্বতীর যাত্রাপথে এরকম একটি খরস্রোতা নদী ছিল। এই সব বাধা অতিক্রম করে পার্বতী পিত্রালয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

সামান্য শাঁখা চাওয়ার অপরাধে শিব পার্বতীকে রেগে বাপের বাড়িতে চলে যেতে বলেন। তবে নিম্নশ্রেণীর নারীদের মধ্যে আমরা স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তাও লক্ষ করি। শিব বাগদিনীকে তার জাতিবৃত্তি মাছধরাকে ত্যাগ করতে বললে সে কিন্তু রাজী হয় না। সে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয় 'রহিতে নারিব আমি জাতিবৃত্তি ছাড়া'। বাগদিনী শিবকে বলেছে ভাত কাপড় দিয়ে শিবকে তার ভরন-পোষণ করতে হবে - 'ভাত কাপড়ে ভরন পোষণ কর্ত্তে হবে মোকে'। অভিজাত পরিবারের মেয়েরা স্বামীকে কঠিন কর্ম থেকে বিরত করলেও নিম্নবিত্ত সমাজের বাগদিনী শিবকে কর্ম করতে উৎসাহিত করে। সে শিবকে বলে জলসিঞ্চন করে মাছ ধরে মাছ বিক্রি করার জাতিবৃত্তি শিবকে গ্রহণ করতেই হবে। শিব বাধ্য হয়ে সেই হীনবৃত্তির কাজ করেছেন।

নারীর সতীত্ব সেকালের সমাজে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। স্বামীহীন জীবন নারী কল্পনাও করতে পারত না। শঙ্খ পরিধান করলে স্বামীর মঙ্গল হয়। সেকারণে পার্বতী স্বামীর কাছে দুবাই শঙ্খ চেয়েছিলেন। কিন্তু দরিদ্র স্বামী তাকে শঙ্খ দিতে পারেননি। রাগে-অভিমানে পার্বতী বাপের বাড়িতে চলে গেলে শিব মাধব শাঁখারীর ছদ্মবেশে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। শাঁখা দেখে পার্বতীর আনন্দের সীমা নেই। তিনি শাঁখারীর কাছ থেকে শাঁখা কিনতে চান। শাঁখা কেনার ব্যাপারে শাঁখারীর সঙ্গে পার্বতীর কথোপকথন অংশে দেবী পার্বতী ও মাধববেশী শিবের মুখে সতীধর্ম কথিত হয়েছে। স্বামীর প্রতি যে নারী নিষ্ঠাবতী সে সতী নারী। এই সতী নারীর প্রতি যদি কোনো পুরুষ দুর্ব্যবহার করে থাকে তবে তার দুর্দশার সীমা থাকে না। সতী মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে পার্বতী বলেছেন—

"শুষ্ক হল্য সাগর সতীর অভিশাপে।
সতী নষ্ট করিলে রাখিব কার বাপে।।
সতী শাপে আপনি ঈশ্বর হল্য অন্ধ।
সতী শাপে সুবর্ণের লঙ্কাপুরী ভস্ম।।

....
সংসারে সতীর পর নাহিক উত্তম।
ব্রহ্মা বিষ্ণু বহেন সতীর পরাক্রম।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৯২)

শিবের মুখে সতী নারীর গুণপনা বর্ণিত হয়েছে শিবায়ন কাব্যে। মনুসংহিতার বিধান এখানে সতী নারী সম্পর্কে উক্ত হয়েছে। সতী নারী সবসময়ই সামাজিক রীতি মেনে চলে। সে স্বাধীন কিছু ভাবে না। নারী বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন, বার্ধক্যে পুত্রের অধীন থাকবে। সেই নারীকে সতী বলা যাবে যার নির্দিষ্ট কিছু গুণ আছে। সেই সব গুণই নারীর স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত—

"বৃদ্ধ মূর্খ জড়　　রোগী দুড়ঃখী বড়
　　দুর্জ্জন দুর্ভাগা পতি।
দেব-বুদ্ধে যেবা　　করে তার সেবা
　　সে নারী বলায় সতী।।

কার্যে দাসী সমা পৃথ্বীসম ক্ষমা
যুক্তে মন্ত্রী কথা সাধ্বী।
শয়নে স্বৈরিণী ভোজনে জননী
সে ধনী বলায় সাধ্বী।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৯০)

এই সতীধর্ম ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ। এই স্বামীর দীর্ঘ জীবন লাভ হয় স্ত্রী শাঁখা পরিধান করলে। তাই পার্বতীর শাঁখা পরিধানের দুরন্ত প্রয়াস আমরা এখানে লক্ষ করি।

শাঁখা পারার নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম আছে। সেই নিয়মের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রামেশ্বর শঙ্খ পরিধান অংশে দিয়েছেন। যথাসাধ্য সুন্দর বস্ত্র ও নানা বিধ অলঙ্কার পরিধান করে সুসজ্জিত হয়ে শঙ্খ পরিধান করতে হয়। পার্বতীও সেই বিধি অনুযায়ী শঙ্খ পরিধান করেছেন। শঙ্খ পরিধান করা যেন বাঙালি রমণীর কাছে উৎসব। আত্মীয় পরিমণ্ডলের সব নারীরাই সেখানে উপস্থিত থাকেন। সুসজ্জিতা সালঙ্কারা সেই নারীকে শাঁখা পরিধানের সময় পূর্ব দিকে মুখ করে বসতে হয়। যিনি শাঁখা পরাবেন তিনি পশ্চিমদিকে মুখ দিয়ে অর্থাৎ সেই নারীর দিকে মুখ করে বসেন। গঙ্গাজলে ধৌত করে সেই শাঁখাগুচ্ছ থালায় রাখতে হয়। তারপর অত্যন্ত যত্ন সহকারে ধীরে ধীরে শাঁখা পরানো হয়।

গ্রাম ও নগর সেকালেও ছিল। এই উভয় স্থানের নারীদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য স্থান-কাল-পরিবেশ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। গ্রামের নারীরা রক্ষণশীল, নগরের নারী তুলনায় লজ্জাহীনা ও বাকপটু। নগরের নারীর বৈশিষ্ট্য হিমালয়ের অন্তঃপুরিকাদের মধ্য দিয়ে রামেশ্বর ফুটিয়ে তুলেছেন। সেখানে নগরের নারীর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে এভাবে—

"নগরের নিতম্বিনী নিলাজিনী বড়।
পর-পুরুষের সনে পরিহাসে দড়।।" (শিবায়ন পৃঃ ৪৮৬)

তৎকালীন সমাজের নারীর অলঙ্কারের বর্ণনাও রামেশ্বর তাঁর কাব্যে দিয়েছেন। ধনী গৃহস্থের নারীদের প্রসাধন ও বস্ত্র অলঙ্কারের বর্ণনা সেখানে প্রধান। চিরুণি দিয়ে সুন্দর করে চুল বাঁধা, চুলে চুয়া চন্দনের গন্ধ, বিদ্যুতের মতো ঝলমলে বসন, বক্ষে কাঁচুলি, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, মাথায় চূড়া, কানে কুণ্ডল, নাসামূলে নথ, কণ্ঠে মণিমালা, হাতে সোনার কঙ্কন, চুড়ি, বালা, বাজুতে বাজুবন্দ, আঙ্গুলে রত্ন অঙ্গুরীয়, পায়ে রত্নের নূপুর, পদাঙ্গুলিতে পাশুলী, কর্পূর, তাম্বুল, এলাচি, লবঙ্গ খেয়ে অধর রাঙা করা—এসব ধনী গৃহস্থের রমণীরা করতেন। আবার দরিদ্র রমণী অলঙ্কার বিহীনা। বাগদিনীর রূপের বর্ণনায় কবি তার সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সেই সৌন্দর্য অলঙ্কার বিহীন। এইভাবে রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যের 'চাষপালা' অংশে ধনী-দরিদ্রের জীবনচিত্র বাস্তব সমাজের প্রেক্ষাপটে যথাযথভাবে ফুটিয়ে উঠেছে।

৪.৭ শিবায়ন কাব্যের ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, প্রবচন

রামেশ্বর ভট্টাচার্য শিক্ষিত, সুপণ্ডিত, শিল্পীস্বভাব-সম্পন্ন ছিলেন। তাই তাঁর কাব্যে স্বভাবোচিত গুণ আমরা ফুটে উঠতে দেখি। সযত্ন প্রয়াসে তিনি তাঁর এই কাব্যখানি রচনা করছেন। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, প্রবচনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। নিম্নে তাঁর কাব্যে ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ও প্রবচনের প্রয়োগ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

ভাষা— রামেশ্বর তাঁর কাব্য সম্পর্কে শিবায়ন গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন— 'রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু' : রামেশ্বরের কাব্যের ভাষা বিচারে তাঁর এই উক্তি সম্বন্ধে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। ভাষার এই মাধুর্য মধ্যযুগের খুব কম কবির কাব্যেই আমরা লক্ষ করে থাকি। তাঁর কাব্যের প্রতিটি পংক্তি সুমধুর ও সুললিত। এই গুণেই তাঁর কাব্যে 'ভদ্র কাব্য' হয়ে উঠেছে। এই চাষীর কাব্যের মেঠো-সুরকে তিনি মিঠে তানে পরিবেশন করেছেন। তাঁর কাব্যে বিষয়বস্তুর দুটো দিক আমরা পাই। একদিকে পুরাণ, অন্যদিকে লৌকিক জীবন। বিষয়বস্তুর এই দুই দিককে কেন্দ্র করে কবি এই কাব্যে দুধরনের ভাষা প্রয়োগ করেছেন। একদিকে সংস্কৃত শব্দ বহুল মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যযুগের সমৃদ্ধভাষা, অন্যদিকে পল্লীগ্রামে প্রচলিত প্রাদেশিক কথ্যভাষা। কবি যখন পৌরাণিক কাহিনি বর্ননা করেছেন তখন সংস্কৃত শব্দের ঘনঘটা লক্ষ করা যায়। আবার যখন গ্রাম্য জীবনের কথা বলেছেন তখন সহজ ভাষায় বাংলার গ্রামজীবনের চিরন্তন রাগিনীকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শিবায়নের লৌকিক অংশ মূলত চাষপালা থেকে শুরু। এই অংশে লোকজীবন সম্পৃক্ত কৃষিজীবনের চিত্রই প্রধান। তাই এই অংশের কাহিনি বর্ণনায় কবি সংস্কৃত শব্দবহুল ভাষা ব্যবহার খুব একটা করেননি, বরং লোকজীবন সংলগ্ন ভাষা ব্যবহার করেছেন বেশি। তবে পুরাণ অভিজ্ঞ কবি প্রয়োজন অনুসারে কিছু কিছু জায়গায় সংস্কৃত শব্দবহুল ভাষা ব্যবহার করেছেন। বাগদিনীর রূপ বর্ননায় এর উদাহরণ আমরা পাই—

"নিন্দিয়া কুন্দের কলি সকল দশনগুলি
চামর নিন্দিয়া কেশ চারু।
নবঘন জিনি বর্ণ গৃধিনী জিনিয়া কর্ণ
কামের কামান জিনি ভুরু।।" (শিবায়ন পৃঃ ৪৬৫)

লৌকিক অংশের বিভিন্ন অংশে এধরনের আরো অল্পবিস্তর উদাহরণ আমরা পেয়ে থাকি। এছাড়া সংস্কৃত ঘেঁষা কিছু শব্দ এই অংশে লক্ষ করা যায়। যেমন - 'ধান্য', 'ভূমি', 'কর্ম্ম', 'চক্ষু', 'চতুর্দ্দশ', 'অন্ন' প্রভৃতি। পল্লীগ্রামে প্রচলিত প্রদেশিক কথ্যভাষার উদাহরণ শিবায়ন কাব্যের লৌকিক অংশ থেকে নিম্নে তুলে ধরা হল—

"তোর বাপ বাগ্‌দি হয়্যাছে ছায়্যা মোকে।
তার ঠাঞিঃ যাস্ নাহি ছুঁস নাঞি তাকে।।" (শিবায়ন পৃঃ ৪৭২)

এই লৌকিক ভাষার প্রচুর উদাহরণ আমরা 'শিবায়ন' কাব্যে পেয়ে থাকি।

ছন্দ— রামেশ্বরের কাব্যে ছন্দবৈচিত্র্য সহজেই লক্ষণীয়। সেই সময়ে প্রচলিত ছন্দকে তিনি তাঁর কাব্যে অবলীলায় ব্যবহার করেছেন। এই ছন্দগুলোর মধ্যে পয়ার, ত্রিপদী, মালঝাঁপ, ললিতছন্দ প্রভৃতি প্রধান। নিম্নে এই ছন্দগুলোর উদাহরণ দেওয়া হল।

পয়ার—

"গদ গদ হয়্যা গৌরী গঙ্গাধরে বলে।
বসন ভিজিয়া গেল লোচনের জলে।।
কত কার্য্য কটাক্ষে করয়াছ বস্যা ঘরে।
আপনি অবনী যাবে কোন কার্য্য তরে।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৫৩)

ত্রিপদী—

"লক্ষ্মী সরস্বতী কিম্বা উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা
অথবা মোহিনী অবতার।
দেখি তার দেহ আভা ত্রিভুবনে যত শোভা
সকলি পাইল তিরস্কার।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৬৫)

মালঝাঁপ—

"ঈশানে উরিয়া সকল পুরিয়া
জলধর ধাইল বেগে।
কুলকুল করিয়া অম্বর ঢাকিয়া
আন্ধার করিল মেঘে।।" (শিবায়ন পৃঃ ৪৭৭)

ললিত ছন্দ—

"সন্ধ্যা দেখিয়া কুন কুন ডাকিয়া
বন হইতে বারাল্য মশা।
যত ছিল ছোট বড় ধাইল দড়বড়
বেড়িল শিবের বাসা।।" (শিবায়ন পৃঃ ৪৬১)

অলংকার— বাংলাকাব্যে অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান জায়গা জুড়ে আছে অনুপ্রাস। সব কবিই তাঁদের কাব্যে প্রচুর পরিমাণে অনুপ্রাস অলংকার ব্যবহার করেছেন। কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর কাব্যে এমন অল্প পংক্তি আছে যেখানে অনুপ্রাস অলংকার নেই। আদ্যানুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস প্রভৃতি অনুপ্রাসের বহুল ব্যবহার আমরা তাঁর 'শিবায়ন' কাব্যের লৌকিক অংশে সহজেই লক্ষ করি। নিম্নে এই অনুপ্রাসের বিভিন্ন শ্রেণির উদাহরণ দেওয়া হল।

আদ্যানুপ্রাস—

"গুটি গুটি দুটী হাতে যত দিতে পার।।' (শিবায়ন পৃঃ ৪৯২)
"সুক্তা খায়্যা ভোক্তা যদি হস্ত দিল শাকে।
অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্তি ডাকে।।" (শিবায়ন পৃঃ ৪৯৭)

অন্ত্যানুপ্রাস—

"আচমন মুখশুদ্ধি সার‍্যা সুত সনে।
সন্তোষে বসিলা শিব শার্দ্দূল আসনে।।" (শিবায়ন পৃঃ ৪৯৮)

ছেকানুপ্রাস—

'অনঙ্গ তরঙ্গ অঙ্গ অঙ্গনার ঘটা।' (শিবায়ন পৃঃ ৪৯৯)

তাঁর অনুপ্রাস ব্যবহারে আমরা সহজ সাবলীলতা লক্ষ করে থাকি। অনুপ্রাস অলংকারে তাঁর কাব্য ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি, বরং শোভন ও সংযত ব্যবহারে কাব্যের উৎকর্ষ সাধন করেছে।

প্রবচন— প্রবচন ব্যবহারে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে দুধরনের প্রবচন লক্ষ করা যায়। এক, গতানুগতিক প্রবচন, দুই, কবির নিজের তৈরি প্রবচন। মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যে যে প্রবচনগুলো ব্যবহৃত হয়েছে কাব্যে প্রয়োজনানুসারে

রামেশ্বর সেই প্রবচনগুলো ব্যবহার করেছেন। লৌকিক অংশে ব্যবহৃত রামেশ্বরের নিজস্ব প্রবাদ প্রবচনের উদাহরণ নীচে দেওয়া হল—

১। "চাষী বিনা চাষের মহিমা কেবা জানে।
লঙ্কার বাণিজ্য বস্যা বাকুড়ির কোনে।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৪৬)

২। "গৃহস্থ থাকিলে ঘরে পরে চাষ বৃথা।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৫৩)

৩। "জলহীন যেন মীন শিব বিনে শিবা।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৫৪)

৪। "হাপুতির পুত্র যেন নির্ধন্যার ধন।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৫৪)

৫। "বেগাগাছে ঝুঁটী বান্ধ্যা করায় কন্দুল।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৫৪)

৬। "গৃহস্থ গরীব তার শতগেঁঠ্যা টেনা।
সোহাগী মাগীর কানে কাঁটা কড়ি সোনা।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৭৫)

৭। "ভাত নাঞি ভবনে ভর্ত্তার ভাগ্য বাঁকা।
জন খাট্যা মুনসা মরে মাগী মাগে শাঁখা।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৭৫)

৮। "ভিখারীর ভার্য্যা হৈয়া ভূষণের সাধ।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৭৫)

সাহিত্যে যেখানে গভীরভাবের প্রকাশ ঘটে সেখানে প্রবাদ-প্রবচনের কোনো প্রয়োজনই থাকে না। আবার যেখানে লৌকিক জীবন কথা প্রধান হয়ে ওঠে, সেখানে প্রবাদ-প্রবচন মুখ্য ভূমিকায় থাকে। কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্যের লৌকিক অংশেও প্রচুর পরিমাণে প্রবাদ-প্রবচন লক্ষ করা যায় যা তাঁর কাব্যকে একটি বিশেষ মর্যাদা দান করেছে।

৪.৮ 'শিবায়ন' কাব্যে রামেশ্বরের ভণিতা প্রয়োগের বিশেষত্ব

মধ্যযুগের প্রায় সব কবিরাই তাঁদের কাব্যে ভণিতা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে নিজের নাম উল্লেখ করে গেছেন। রামেশ্বর ভট্টাচার্যও এর ব্যতিক্রম নন। তবে রামেশ্বরের ভণিতা প্রয়োগের মধ্যে বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে আমরা দেখি। তিনি মূলত এই রীতি গ্রহণ করেছেন বৈষ্ণব পদাবলীর ভণিতা প্রয়োগের মধ্য থেকে। বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রথম ভণিতা প্রয়োগের অভিনবত্ব আমরা লক্ষ করি। এই ধরনের ভণিতা প্রয়োগে বৈষ্ণব পদকর্তারা শুধুমাত্র নিজের নাম উচ্চারণ করেই ক্ষান্ত থাকেননি। এই ভণিতা প্রয়োগের দ্বারা নিজেরা পদাবলীর বিষয়বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছেন। এই ভণিতাগুলোতে পদকর্তারা কখনও নিজে চরিত্র হয়ে ওঠেন, কখনও উপদেশ দেন, তিরস্কার করেন, কখনও শ্লেষে, ব্যঙ্গে মুখর হয়ে ওঠেন। তাঁরা কখনও কৃষ্ণসখা, কখনও রাধার সখীরূপে ভণিতায় উক্তি-প্রত্যুক্তি করেছেন, আবার কখনও মানবের চিরন্তন আকুতি প্রকাশ করেছেন। কবি রামেশ্বর তাঁর কাব্যে ভণিতা প্রয়োগে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসারী। তিনি শিবভক্ত, দীক্ষাগুরু চন্দ্রচূড়ের শিষ্য, রাজা রামসিংহের পুরাণ পাঠক, রাজা যশোমন্ত সিংহের বাল্য সুহৃদ, এ সকল পরিচয়ও সেই ভণিতাগুলোতে রেখে গেছেন। দীক্ষাগুরু চন্দ্রচূড় ও আরাধ্য দেবতা শিবের প্রতি তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধা তিনি ভণিতায় একই সঙ্গে দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় প্রকাশ করেছেন—

"চন্দ্রচূড় চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবকাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৭৯)

তিনি পৃষ্ঠপোষক রাজা রামসিংহের কথাও ভণিতায় উল্লেখ করে গেছেন—

"চন্দ্রচূড়চরণে মজুক নিজ চিত।
রচে রাম রামসিংহ রাজপ্রতিষ্ঠিত।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৭১)

যশোমন্ত সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য রচনা করেছেন তারও উল্লেখ তিনি এই কাব্যের ভণিতায় করে গেছেন—

"রাজারাম সিংহ সুত জশমন্ত নরনাথ
তস্য পোষ্য দ্বিজ রামেশ্বর।
অযোধ্যা নগরবাসী সঙ্গীতের অভিলাষী
কৃপা যারে কৈল গৌরীহর।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৭১)

এছাড়া ভণিতায় তিনি তাঁর আরাধ্য দেবতার কছে বারবার যশোমন্ত সিংহের মঙ্গল কামনা করেছেন—

"জশমন্ত সিংহে দয়া কর হরবধূ।
রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৭০)

কাব্যের একেবারে শেষে ধান্যের নাম ও গীত সমাপ্তি অংশে কবি শিবের কাছে তাঁর আপনজন ও পরিচিতজন সকলের মঙ্গল কামনা করেছেন। কবি ভনিতায় বেশ কয়েকবার কখনও ভব, কখনও বা ভবানীর অন্তরঙ্গরূপে দেখা দিয়েছেন, আবার কখনও আন্তরিকতার সঙ্গে শিব-পার্বতীকে উপদেশ দিয়েছেন, কখনও বিবাদ বাঁধিয়ে আনন্দ উপভোগ করেছেন, আবার কখনও বা দ্ব্যর্থবোধক শব্দে কাব্যের সেই বিশেষ অংশটিকে ভাবব্যঞ্জনায় শিল্পসমৃদ্ধ করে তুলেছেন। লৌকিক অংশের 'ষষ্ঠ দিবসীয় নিশাপালা আরম্ভ' অংশে পার্বতী শিবকে কৃষিকাজ করতে পরামর্শ দিচ্ছেন। শিব কিন্তু চাষ করতে রাজী নন, কেননা চাষের উপকরণ তাঁর কিছুই নেই। রামেশ্বর এখানে ভণিতায় অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে শিবকে বলছেন, দেবী তাঁকে সবই দেবেন—

"কোথা হাল্যা কোথা হেল্যা কোথা বা লাঙ্গল।
রামেশ্বর বলে দেবী দিবেন সকল।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৪৭)

শিব স্ত্রী-পুত্রকে ছেড়ে কৈলাস থেকে পৃথিবীতে এসেছেন। স্বামী ঘরে ফিরে আসছেন না দেখে পার্বতী স্বামীকে ঘরে ফিরিয়ে আনার জন্যে নারদের পরামর্শমতো মশা, মাছি, উস্তানি, ডাঁশ শিবের ক্ষেত্রে পাঠালেন। কিন্তু শিব সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে নিলেন। অতঃপর পার্বতী জলৌকা পাঠালেন। ভীম নিড়ান দিতে যাবেন। তখন রামেশ্বর ভণিতায় তাকে সাবধান হতে উপদেশ দিচ্ছেন—

"এড়াইতে নারে ভীম নিড়াইতে যান।
রামেশ্বর বলে জলে হয়্য সাবধান।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৬২)

বাগদিনী বেশ ধারণ করে স্বয়ং পার্বতী শিবকে ছলনা করতে শস্যক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তিনি শিবের সঙ্গে পরিচয় দেওয়ার ছলে রসিকতা শুরু করে দেন। রামেশ্বর তখন শিবের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পার্বতীকে অনুরোধ করে বলেন—

"পরিচয় ছলে তথা কহেন রসের কথা
বাগ্‌দিনী শুনিয়া না শুনে।
দ্বিজ রামেশ্বর কহে এমত উচিত নহে
পরিচয় দেহ ত্রিলোচনে।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৬৬)

শিবের কৃষি অংশে ভীম ভাত খাওয়ার বায়না ধরলে শিব ভীমকে বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসতে বলেন। ভীম বাড়ি যেতে রাজি নয়। সে বলে যদি সে বাড়ি যায় তা হলে মামীকে বলবে কোচনীকে নিয়ে মামা শিব পালিয়ে গেছেন। শিব ভয় পেয়ে গেলেন— বলেন, ভীম যত খাবে তাকে তিনি এখানেই খাওয়াবেন—

"চাকরের চারা নাঞি চিন্তিলেন নাথ।
রামেশ্বর বলে হর খাওয়াইবেন ভাত।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৫৫)

বাগদিনী বৃদ্ধকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে চায় না। শিব যদি তার কথায় চলেন তা হলে এবিষয়ে সে চিন্তা করতে পারে। রামেশ্বর তখন শিবের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বলেন—

"তবে যদি তুমি হে আমার বোলে চল।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে কি করিতে বল।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৬৮)

শিব শস্যক্ষেত্রে জলসিঞ্চন করে জল শুকিয়ে ফেললেন। এখন মাছ ধরার পালা। বিব্রত শিবকে দেখে পার্বতী কৌতুক বোধ করছেন। কবি রামেশ্বরও সেই কৌতুকে যোগ দিয়েছেন। ভণিতায় তাই কবি বলেন—

"হর হেরি গৌরী হাসে ভাবে রামেশ্বর।
আনন্দ করিয়া মৎস্য ধর অতঃপর।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৬৯)

পার্বতী শিবের ওপর অভিমান করে বাপের বাড়িতে চলে যাচ্ছেন তখন শিব তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে আনার জন্যে ঝড় বৃষ্টি দ্বারা রাস্তায় বিঘ্ন ঘটাতে চাইলেন। তাই প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে পার্বতী দুই শিশু সন্তানসহ চরম বিপদে পড়েন। রামেশ্বর পার্বতীর জন্যে খুবই দুঃখ বোধ করেন। এই দুঃখবোধের প্রকাশ তাঁর ভণিতায় ধরা পড়ে—

"কহে রামেশ্বর ছাড়িয়া হরসর
কি কাজ করিলে হায়।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৭৮)

স্বামীর কাছে শঙ্খ না পেয়ে পার্বতী অভিমানবশে বাপের বাড়ি চলে গেছেন। শিব পার্বতীকে তুষ্ট করার জন্যে স্বহস্তে কারুকার্যমণ্ডিত দুবাই শঙ্খ নির্মাণ করেন। শিব এই শঙ্খের দ্বারা পার্বতীর মনের অভিমান দূর করতে চাইছেন। রামেশ্বর তাতে সমর্থন করে ভণিতায় বলছেন—

"ভুবনের ভ্রমকর্ত্রী ভুলিবেন যাতে।
দ্বিজ রামেশ্বর বলে দেও তার হাতে।।" (শিবায়ন, পৃঃ ৪৮৫)

এভাবে রামেশ্বরের কাব্যে আমরা দেখি ভণিতায় ভাব ও ব্যঞ্জনার সমাবেশ ঘটিয়ে তিনি কাব্যটিকে অভিনব করে তুলেছেন।

৪.৯ প্রাসঙ্গিক টীকা

১। **লক্ষ্মী**— লক্ষ্মী সম্পদের দেবী বলে কথিত। লক্ষ্মীর অপর নাম শ্রী। শেষ বৈদিক যুগ থেকে লক্ষ্মীর সন্ধান পাওয়া গেলেও মূলত লৌকিক ভাবনা থেকেই লক্ষ্মীর উদ্ভব। বিভিন্ন পুরাণগ্রন্থে আমরা লক্ষ্মীর উল্লেখ পাই ও তাঁর নানা পরিচয় রয়েছে। নারদীয়, ধর্ম ও কূর্ম-পুরাণে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গনেশ এরা শিব-দুর্গার সন্তান। মার্কণ্ডেয় পুরাণে লক্ষ্মী দত্তাত্রেয় ঋষির পত্নী। সব দেশেই লক্ষ্মী সৃজনী শক্তির প্রতীক। লৌকিক জীবনে লক্ষ্মীকে ধান্যের দেবী বলেও কল্পনা করা হয়। 'শিবায়ন' কাব্যে শিবের কৃষিকাজ প্রসঙ্গে এই লক্ষ্মীর উল্লেখ আমরা পাই।

২। **বিশ্বকর্মা**— বিশ্বকর্মা শিল্পী ও ভাস্কর এবং যন্ত্রের দেবতা। তাঁর মাতা বৃহস্পতির বোন বরস্ত্রী ও পিতা প্রভাস। মহাভারতে এই বিশ্বকর্মা সমস্ত শিল্প, ভূষণ ও দিব্যবিমান নির্মাণ করেছিলেন। এঁর কৃপায় মানুষ শিল্পকলা ও যন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে। শিবায়ন কাব্যে এই বিশ্বকর্মা শিবের শূল ভেঙে হালের সরঞ্জাম তৈরি করেছিলেন। পার্বতীর কাঁচুলিও তৈরি করেছিলেন তিনি।

৩। **কুবের**— কুবের যক্ষ ও কিন্নরদের রাজা। তিনি 'ধনপতি' নামেও অভিহিত। শিবের বরে কুবের সমস্ত ধনরত্ন, যক্ষ কিন্নর ও গুহ্যকদের অধিপতি হন। সকলের ধর্মদাতা, সমস্ত ধনের মালিক ও প্রদাতা। খৃঃপূঃ যুগে কুবের যক্ষপতি হিসেবে পূজিত হতেন। শিবায়ন কাব্যে কুবের সমস্ত ধনের মালিক। সেই হিসেবে ধান্যও তাঁর কাছে রক্ষিত থাকে। 'শিবায়ন' কাব্যে স্ত্রীর পরামর্শে শিব ভীমকে নিয়ে কুবেরের কাছে গিয়েছিলেন ধানের বীজ সংগ্রহ করতে। বলাবাহুল্য কুবের তাঁকে ফিরিয়ে দেননি। সেই ধান্যবীজ নিয়ে শিব কৃষিকাজ করেন।

৪। **ইন্দ্র**— ঋক্‌বেদে আর্যদের প্রধান দেবতা ইন্দ্র। ইন্দ্র দেবতাদের রাজা। বায়ু, বৃষ্টি, ঝড় ও বজ্রের দেবতা এই ইন্দ্র। তিনি বিদ্যুৎ ও বজ্রের সাহায্যে বৃষ্টি ঘটান। আবার অনাবৃষ্টিও তাঁর দ্বারা সাধিত হয়। আসলে ইন্দ্র শব্দটি উপাধি বিশেষ। স্বর্গ রাজ্যের যিনি রাজা হন তিনিই ইন্দ্র উপাধি পান। শস্য ও অন্নের প্রাচুর্যের কামনায় রাজা ও ঋষিরা ইন্দ্রের পূজা করতেন। অথর্ববেদে ইন্দ্র ত্রিলোকের রাজা। লৌকিক মতে সমস্ত ভূমির মালিক ইন্দ্র। 'শিবায়ন' কাব্যে শিব পার্বতীর পরামর্শে ভূমির জন্যে ইন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেন। ইন্দ্র তাঁকে নিরাশ করেননি। রীতিমতো পাট্টা লিখে তিনি শিবকে ভূমিস্বত্ব দান করেছিলেন।

৫। **মাতলি**— মাতলি ইন্দ্রের রথের সারথি ও ইন্দ্রের সখা। তাঁর স্ত্রী নাম সুধর্মা, কন্যার নাম গুণকেশী, ছেলের নাম সুবর্চা। ইন্দ্র তাঁর নাম রেখেছিলেন মাতলি। রামায়ণে রাবনবধের সময় ইন্দ্রের নির্দেশে মাতলি রথ নিয়ে রামকে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন। 'শিবায়ন' কাব্যে পুত্রসহ পার্বতীকে রাস্তা থেকে রথে করে পিত্রালয়ে পৌঁছে দেন মাতলি।

৬। **হিমালয়**— পর্বতদের শ্রেষ্ঠ যিনি তিনিই হচ্ছেন হিমালয়। পার্বতীর পিতা এই হিমালয়। পর্বতরাজ হিমালয় আমাদের পুরাণকেন্দ্রিক কাব্যে জড় না থেকে এক প্রাণবান সত্তায় পরিণত। কন্যার উমার প্রতি তাঁর অপরসীম স্নেহ। তাঁর স্ত্রীর নাম মেনকা। সমস্ত মঙ্গলকাব্যে পার্বতীর পিতারূপে হিমালয়ের উপস্থিতি আমরা লক্ষ করি। শিবায়ন কাব্যে পার্বতী অভিমান করে স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে পিত্রালয়ে উপস্থিত হলে পিতা হিমালয় অত্যন্ত খুশি হন, কন্যাকে নিয়ে হিমালয়ে শারদোৎসব করেন।

৭। **মেনকা**— মেনকা হিমালয়ের স্ত্রী। তাঁর পিতার নাম মহামেরু বা মেরু। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণমতে সতী দ্বিধা হয়ে মেনার দুই মেয়ে গৌরী ও গঙ্গা হন। স্কন্দপুরাণে গঙ্গা, গৌরী ও উমা এক। এক মতে মেনা ও মহাদেবের স্ত্রী সতী দুজনে সখী ছিলেন। সতী দেহত্যাগ করলে মেনকা কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন ও ভগবতীর কাছে একশ পুত্র ও একটি মেয়ে চান। ভাগবতী আবির্ভূত হয়ে এই বর দান করেন ও নিজে তাঁর কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন বলে যান। ফলে পার্বতীর জন্ম হয়। শিবায়ন কাব্যে মেনকা বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণা জননী। পার্বতী পিত্রালয়ে এলে এতদিন পরে কন্যাকে পেয়ে তাঁর চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আবার এই মেনকা কৌতুকপ্রিয়ও। মাধব শাঁখারী তাঁদের অন্তঃপুরে শাঁখা নিয়ে উপস্থিত হলে তাঁর কৌতুকপ্রিয়তার পরিচয় আমরা পাই।

৮। **নারদ**— তৃতীয় অধ্যায়ের নারদ চরিত্র দ্রষ্টব্য।

৯। **ভীম**— তৃতীয় অধ্যায়ের ভীম চরিত্র দ্রষ্টব্য।

১০। **মাধব শাঁখারী**— রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্যে শিব মাধব শাঁখারীর ছদ্মবেশে শঙ্খ নিয়ে হিমালয় গৃহে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পার্বতীকে শাঁখা পরিয়ে তাঁর অভিমান দুর করা। প্রথমে মাধব শাঁখারী গোলাহাটের বকুলতলায় খড় বিছিয়ে শাঁখার দোকান দেন। পার্বতীর দাসী বিমলা শাঁখা নিয়ে তাঁকে সেখানে বসতে দেখে তাঁকে হিমালয়ের অন্তঃপুরে নিয়ে যায়। সেখানে শাঁখারীর সুন্দর শঙ্খ দেখে অন্তঃপুরের নারীরা বিশেষ করে বয়স্ক মহিলারা তাঁর সঙ্গে শাঁখার দাম-দর নিয়ে হাস্য পরিহাস শুরু করে দেন। মেনকাও মাথার ঘোমটা ফেলে দেওয়া অবস্থায়ই জামাতার সঙ্গে কৌতুক জুড়ে দেন। অবশেষে পার্বতীর শঙ্খ কেনা ঠিক হয়। মাধব শাঁখারী নিয়মমতো পার্বতীকে শঙ্খ পরিয়ে দেন।

১১। **রামেশ্বরের আত্মপরিচয়**— (প্রথম অধ্যায়ের রামেশ্বরের আত্মপরিচয় অংশ দ্রষ্টব্য)

১২। **রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যের রচনাকাল**— (প্রথম অধ্যায়ের রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যের রচনাকাল অংশ দ্রষ্টব্য)

১৩। **হেমৎ সিং**— মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া বরদা পরগণার জমিদার শোভা সিংহের ছোট ভাই ছিলেন হেমৎ সিং বা হেমৎ সিংহ। শোভা সিংহের ও হেমৎ সিংহের পূর্ব পুরুষেরা মোগলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। উত্তর পুরুষেরাও এই ধারা বহন করে তৎকালীন শাসক মোগলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এদের মধ্যে হেমৎ সিংহ অন্যতম। হেমৎ সিংহ হীমংত, হেমন্ত, হিম্মৎ বা হেমৎ এবং হেমায়েৎ সিংহ নামেও পরিচিত ছিলেন। শোভাসিংহের সমস্ত কার্যের ঘনিষ্ঠ সহকারী ছিলেন এই হেমৎ সিংহ। চেতুয়া বরদা অঞ্চলে তিনি ধর্মপ্রাণ ও শক্তিমান ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। শিবায়নে তিনি হেমৎ সিংহ নামে পরিচিত। কবি রামেশ্বরের শিবায়ন যশোমন্ত সিংহের সভায় প্রকাশ কালে (১৭১১/১২ খ্রিস্টাব্দ) হেমৎ সিংহ চেতুয়া বরদার জমিদার ছিলেন। 'শিবায়ন' কাব্যে হেমৎ সিং অত্যাচারী জমিদার হিসেবে পরিচিত। ব্যক্তিগত রোষ থেকে তিনি কবি

রামেশ্বরের বাড়ি ঘর ভেঙে তাঁকে তাঁর জমিদারী থেকে বিতাড়িত করেন। কর্ণগড়ে বসে নিজের কাব্য রচনাকালে কবি রামেশ্বর সেই পূর্বস্মৃতি স্মরণ করে লিখেছেন—

"পূর্ব্ববাস যদুপুরে হেমৎ সিংহ ভাঙ্গে যারে"

এই উক্তির মধ্য দিয়ে হেমৎসিংহের অত্যাচারী স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৪.১০ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ (Summing Up)

কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন' কাব্যের লৌকিক অংশের বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে শেষ হয়েছে। এখন এই বিস্তৃত আলোচনার সার সংক্ষেপ তুলে ধরা হল।

'শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন' কাব্যের দুটো অংশ আমরা দেখি। পৌরানিক অংশ ও লৌকিক অংশ। পৌরানিক অংশে দেব দেবীর বন্দনা থেকে শুরু করে সৃষ্টি রহস্য ও দেবদেবীকে নিয়ে নানা কাহিনি ও ঘটনা পুরাণ অবলম্বনে বর্ননা করা হয়েছে। লৌকিক অংশে শিবের কৃষিকাজ ও স্ত্রী পার্বতীর সঙ্গে তাঁর সংসার জীবনের বর্ণনা লোক জীবন উত্থিত কাহিনি অবলম্বনে তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের পাঠ্য অংশ যেহেতু লৌকিক অংশে, যাকে আমরা চাষপালা বলতে পারি সেখানে তিনটি পালা রয়েছে — চাষপালা, মৎস্যধরা পালা ও জাগরণ পালা অথবা শঙ্খপরিধান পালা বা গোঁসা পালা। চাষপালা অংশে শিবের কৃষিকাজের বর্ণনা, মৎস্যধরা পালায় কৃষিকাজের বর্ণনার সঙ্গে শিবের মশা, মাছি, ডাঁশ, উঙানি, জোঁক প্রভৃতি প্রতিকূলতাকে জয় করা, বাগদিনীর ধান ভেঙে মাছ ধরা, বাগদিনীর প্রতি মোহাসক্ত হয়ে তার কথায় শিবের জলসিঞ্চন ও বাগদিনীর মাছ ধরা, বাগদিনীর শিবকে ছলনা করে তাঁর আঙটি নিয়ে চলে যাওয়া, শিবের হেঁটমুখে কৈলাস যাত্রা, পার্বতীর সঙ্গে বাগদিনীর প্রসঙ্গ নিয়ে অবশেষে নারদের মধ্যস্থতায় কলহের নিষ্পত্তি বর্ণিত হয়েছে। তারপর জাগরণ পালা, যাকে শঙ্খপরা বা গোঁসাপালা নামে অভিহিত করা হয় সেখানে শিবের কাছে পার্বতীর শঙ্খ চাওয়া, শিবের কটুত্তর, পার্বতীর রাগ করে বাপের বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত, শিবের পার্বতীকে ফিরিয়ে আনার নানা চেষ্টা ও ব্যর্থতা, অবশেষে শিবের শাঁখারীবেশে হিমালয়ে যাত্রা ও পার্বতীকে শাঁখা পরিয়ে সন্তুষ্ট করে স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে কৈলাসে ফিরে আসার বর্ননা করা হয়েছে। আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় এই পালাগুলোর বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা বিস্তৃতভাবে করা হয়েছে। লৌকিক অংশে কবির কাব্য প্রতিভার সম্যক পরিচয় আমরা পেয়েছি। কাহিনি বর্ননা, চরিত্র চিত্রণ, সমাজচিত্র, লৌকিক কাহিনির উৎস, ভাষা, ছন্দ, অলংকার ভণিতা প্রয়োগে কবির বিশেষত্ব প্রভৃতি প্রতিটি ব্যাপারে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কবি মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক শিবকাহিনি থেকে শিবায়নের শিব চরিত্রে অভিনব বৈচিত্র এনে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন ধারার পরিপূর্ণতা দান করেছেন।

(বি.দ্র. : আলোচনায় ব্যবহৃত শিবায়ন কাব্যের উদ্ধৃতিগুলো পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন' গ্রন্থ থেকে নেওয় হয়েছে। গ্রন্থটির প্রকাশক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, সংস্করণ ও প্রকাশকাল : প্রথম সংস্করণ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ)

৪.১১ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

ক) বড় প্রশ্ন ঃ

১) 'শিবায়ন' কাব্যধারায় রামেশ্বর ভট্টাচার্যের স্থান নিরূপণ করুন।

২) রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিব সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন' কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যা জানেন, লিখুন।

৩) রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিব সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন' কাব্যের 'চাষপালা' সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪) রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিব সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন' কাব্যের লৌকিক অংশের 'মৎস্যধরা পালা'র বিস্তারিত পরিচয় দিন।

৫) রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিব সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন' কাব্যের 'শঙ্খপরা বা গোসাপালা' সম্পর্কে যা জানেন, সংক্ষেপে লিখুন।

৬) রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিব সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন' কাব্যের শিব চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭) রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিব সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন' কাব্যের পার্বতী চরিত্র আলোচনা করুন।

৮) রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিব সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন' কাব্যের লৌকিক অংশের উৎসসূত্র নির্ণয় করুন।

৯) সমাজচিত্র অঙ্কনে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের দক্ষতা তাঁর 'শিব সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন' কাব্যে অবলম্বনে আলোচনা করুন।

১০) ভাষা, ছন্দ, অলংকার ও প্রবচন প্রয়োগে রামেশ্বরের দক্ষতা তাঁর 'শিব সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন' কাব্য অবলম্বনে আলোচনা করুন।

খ) ছোট প্রশ্ন ঃ

১) 'শিবায়ন' কাব্যের স্বরূপ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২) মঙ্গলকাব্য থেকে 'শিবায়ন' কাব্যের পার্থক্য নির্ণয় করুন।

৩) রামেশ্বর ভট্টাচার্যের আত্মপরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪) রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিব সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন' কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে লিখুন।

৫) রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিব সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন' কাব্যের নারদ চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬) রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিব সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন' কাব্যের ভীম চরিত্র সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৭) 'শিব সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন' কাব্যে রামেশ্বর ভনিতা প্রয়োগে যে বিশেষত্বের পরিচয় দিয়েছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪.১২ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

১) শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত 'রামেশ্বর রচনাবলী'র ভূমিকা অংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৭১।

২) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মার্জিত সংস্করণ, ২০০১।

৩) অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পৌরাণিকা', প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ফার্মা কে.এল.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, ২০০১।

* * *